গোপাল হালদার রচনাসমগ্র/২

গোপাল হালদার রচনাসমগ্র/২

গোপাল হালদার



এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম এ মুখার্জী সংস্করণ
বইমেলা, ১৩৬৩

প্রকাশক
রাজীব নিয়োগী
এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দিল্লী অফিস
কমিউনিকেশন সেন্টার
এম-৭০ গ্রেটার কৈলাশ ২
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
নিউ দিল্লী ১১০ ০৪৮

সম্পাদনা
অমিয় ধর
প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিঃ
৫২/৩ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

প্রথম খণ্ড

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

সূচী

———

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

(খ্রীষ্টাব্দ ৯০০—খ্রীষ্টাব্দ ১২০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্‌লা ভাষা ও বাঙালীর সাহিত্য

প্রাচীনতম নিদর্শন : 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্‌লা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'—এই নামে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', সেই সঙ্গে সরোজ বজ্রের (সরহপাদের) 'দোহাকোষ' ও কাহ্নপাদের 'ডাকার্ণব' এই তিনখানা পুঁথি একত্র সম্পাদিত করে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' পক্ষ থেকে বাঙ্‌লা ১৩২৩ সালে (ইংরাজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে) একখানা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এর মধ্যেকার 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'ই একমাত্র খাঁটি বাঙ্‌লায় লেখা 'পদ' বা গান বলে গ্রাহ্য হয়েছে। সাধারণত 'চর্যাপদ' বলেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে এর পরিচয়,—যদিও আসল নাম কারও কারও মতে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়', ইত্যাদি। অর্থাৎ নামের সম্বন্ধে বিনিশ্চিত হবার উপায় এখন আর নেই; তবে 'চর্যাপদ' নামটিই আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রচলিত। এখনও পর্যন্ত এই চর্যাপদই বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ, আর তার অন্তর্ভুক্ত পদগুলিই প্রাচীনতম বাঙ্‌লা সাহিত্যের নিদর্শন। এই পদগুলোর বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর বা তার কাছাকাছি।

অবশ্য চর্যাপদের এই পদগুলি ছাড়াও প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষার আরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু তা ভাষারই নমুনা, সাহিত্য নামের যোগ্য নয়। এ সবের মধ্যে গণনা করা হয়—পুরালিপি বা পুঁথিপত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙ্‌লার পল্লী ও স্থানের কিছু কিছু নাম; অমরকোষের ভাষ্য সর্বানন্দের 'টীকা-সর্বস্ব'তে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে এ টীকা সংকলিত হয়) উল্লিখিত প্রায় ৩০০ বাঙ্‌লা শব্দ; 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র (১৪শ শতাব্দীর শেষদিককার প্রাকৃত-পদসংগ্রহ) এখানে-ওখানে প্রাপ্ত কয়েকটি বাঙ্‌লা পদ ও শ্লোক এবং দু'একটি বাঙ্‌লা বাক্যাংশ;—মহারাষ্ট্রের এক চালুক্য রাজার নির্দেশে (খ্রীঃ ১১২৯-৩০) সংকলিত 'অভিলাষ চিন্তামণি' নামে 'বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থের দশাবতার স্তোত্রের অন্তর্ভুক্ত দু'টি বাঙ্‌লা শ্লোকের টুকরো। বাংলা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এসব হয়তো মূল্যবান, কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে এদের কোনো মূল্য নেই।

বাঙালী জীবন ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে এ সবের চেয়ে বরং মূল্যবান—বাঙ্‌লার খনার বচন, ডাকের বচন, রূপকথা, উপাখ্যান, ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি। এসবের মূল বিষয়বস্তু হয়তো খুবই প্রাচীন। কিন্তু এসব বাঙ্‌লার লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো জিনিস সাহিত্য-গুণযুক্ত; কোনো কোনো জিনিস তা নয়। এসব জিনিস আগে কোনদিন লিখিত রূপ পায় নি। তাই লোকের মুখে মুখে ভাষায়, এবং কতকটা ভাবেও, তার এত অদল-বদল হয়েছে যে, তার বর্তমানকালীন রূপকে আর প্রাচীন সাহিত্যের নমুনা বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

পিশেল সাহেবের মতো কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রথমত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অপভ্রংশে বা বাঙ্‌লায় রচিত হয়ে থাক্‌বে; পরে কবি তা সংস্কৃতে ঢালাই করেছেন। কিন্তু একথা অধিকাংশ পণ্ডিতই গ্রহণ করেন নি। বরং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন যে, মুখের ভাষা দেশে দেশে কালে কালে যতই পরিবর্তিত হোক্, খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম দিক থেকেই সংস্কৃত প্রায় বরাবরই ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা। 'পালি' বৌদ্ধদের কাছে ও 'অর্ধমাগধী' জৈনদের কাছে কিছুকাল তাদের নিজ নিজ ধর্মগত আলোচনা ও সংস্কৃতির বাহন ছিল। পরে, খ্রীষ্টীয় প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ শতকের মধ্যে 'শৌরসেনী' প্রাকৃতের সন্তান শৌরসেনী অপভ্রংশ বা 'অবহট্‌ঠ'ও রাজপুত রাজাদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীন বাঙ্‌লার যুগে বাঙালী পণ্ডিতেরাও তাই বাঙ্‌লায় কবিতা লিখুন আর না লিখুন, পারলে কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃতে। 'অবহট্‌ঠে' কবিতা রচনায়ও তাঁদের উৎসাহ ছিল, তা দেখ্‌তে পাই। কারণ, বাঙ্‌লার উচ্চবর্গের সুধী-সজ্জনের চক্ষে তখন পর্যন্ত বাঙ্‌লা ভাষা ছিল শৌরসেনী-অপভ্রংশেরও তুলনায় শাদা-মেটে গ্রাম্য জিনিস।

যাই হোক্, মোটামুটি ধরা যায় যে প্রায় হাজার খানেক বৎসর আগেই বাঙ্‌লা ভাষা জন্মগ্রহণ করে। ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষাগুলিও খ্রীষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যেই উদ্ভূত হয়। অবশ্য সে-সব কোনো কোনো ভাষার নিদর্শন মেলে একটু আগে, কোনো ভাষার বা একটু পরে! তা ছাড়া সব ভাষাতেই যে তখন-তখনি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও নয়। তবে ভারতের 'হিন্দ-আর্য ভাষা' (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতের

যে-ভাষার নামকরণ করেছেন 'ইন্দো-এরিয়ান্' বলে, আমরা তাকে এ নামে অভিহিত করতে চাই), তখন 'প্রাচীন স্তর' ও 'মধ্য স্তর' উত্তীর্ণ হয়ে উত্তর ভারতে 'আধুনিক স্তরে' এসে পৌছয়। এই হিন্দ্-আর্য ভাষারই প্রাচ্য শাখার এক প্রধান প্রতিনিধি বাঙ্‌লা (বা 'বঙ্গ ভাষা')। ভাষা হিসাবে বাঙ্‌লা ভাষা কিন্তু কুলীন নয়। 'হিন্দ্-আর্য ভাষা'র প্রাচ্য শাখা আদৌ কুলীন বলে গণ্য হত না ; তার কারণ, বাঙালী জাতটাও আসলে বড় বেশী কুলীন জাত নয়।

বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালী জাতি

কারা বাঙ্‌লা দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী, আর বাঙালীর রক্তে কোন্ রক্ত কতটা আছে, এ-বিচার নৃ-বিজ্ঞানের। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে— যাঁরা বাঙ্‌লা দেশের আদিবাসী তাঁরা এই বাঙ্‌লা ভাষা বলতেন না, মূলত তাঁরা 'হিন্দ্-আর্য'-ভাষী ছিলেন না। নৃ-বিজ্ঞানের মতে বাঙ্‌লার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিলেন অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক্ জাতির মানুষ ; তাঁরা ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের মোন্ এবং কম্বোজের (উত্তর ইন্দো-চীনেব) খ্মের শাখার মানুষদের আত্মীয়। এ জাতীয় মানুষকেই বোধহয় বলা হত 'নিষাদ', কিম্বা 'নাগ' ; আর পরবর্তী কালে 'কোল্ল', 'ভিল্ল', ইত্যাদি। তা হলে অনুমান করা যেতে পারে, তাঁদের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন্-খ্মের-শাখার ভাষার মতোই। অনেকটা এরূপ ভাষাই এখনো বলেন বাঙ্‌লা দেশের পশ্চিমে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা, আর পূর্ব বাঙ্‌লার (এখন আসাম রাজ্যের) খাশিয়া পাহাড়ের খাশিয়ারা। অস্ট্রিক গোষ্ঠী ছাড়াও বাঙ্‌লা দেশে বাস করতেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার লোকেরা। তাঁরা ছিলেন সুসভ্য জাতের মানুষ। তাঁদের প্রধান বাসভূমি এখন দাক্ষিণাত্য ; তাঁদের প্রধান ভাষা এখন তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কন্নড়ী। কিন্তু এক সময়ে তাঁরা সম্ভবত পশ্চিম বাঙ্‌লায় ও মধ্য বাঙ্‌লায়ও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এখনো ছোটনাগপুরের (বিহার রাজ্যে) ওরাওঁ প্রভৃতি জাতেরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই একটা ভাঙা ভাষা বলেন। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষীরা ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর বাঙ্‌লায় বহু পূর্বকাল থেকে নানা সময়ে এসেছিলেন মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা জাতি-উপজাতি—যেমন গারো, বড়ো, কোচ, মেছ, কাছারি, টিপ্‌রাই, চাক্‌মা প্রভৃতি। সম্ভবত এঁদেরই বলা হত 'কিরাত' জাতি। এঁরা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা ভাষা-উপভাষা বলতেন।

অতএব, শুধু নানা ভাষাই যে এই বাঙ্‌লা দেশে প্রাচীনতম কালে চলত তা নয়, দেশটাও ছিল নানা জাতি-উপজাতির বাসভূমি ;—'বাঙালী' বলে একটা গোটা জাতও তাই তখনও পর্যন্ত জন্মায় নি। 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'পুণ্ড্র', 'বঙ্গ' প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি প্রথম দিকে বোঝাত বিশেষ বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে ; তারপরে তাদের বাসস্থল হিসাবে এক একটা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে। যেমন, 'রাঢ়' বলতে এখনো বোঝায় মধ্য-পশ্চিম বঙ্গ, 'সুহ্ম' বোঝাত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ; 'পুণ্ড্র বর্ধনভুক্তি' বোঝাত মোটের উপর উত্তর-বঙ্গকে। অবশ্য, এছাড়াও এক একটা অঞ্চলের অন্য নাম ছিল। যেমন, উত্তর-বঙ্গকে পূর্বেও বলত, এখনো বলে, 'বরেন্দ্র', 'বরেন্দ্রী' ; 'বঙ্গ' বলতে বিশেষ করে বোঝায় পূর্ব-বঙ্গ (বাংলাদেশ)। আবার 'সমতট', 'হরিকেল' প্রভৃতি ছিল সেই পূর্ব-বঙ্গেরই দক্ষিণাঞ্চলের এক একটা ভাগের নাম। এসব নামের মধ্যে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এই শব্দ দু'টি সুপ্রাচীন, পাণিনিতেও তার উল্লেখ আছে। 'বঙ্গ মগধের' উল্লেখ আছে ঐতরেয় আরণ্যকেও। কিন্তু সমস্ত বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ নাম 'বাঙ্‌লা' মুসলমান তুর্ক বিজেতারাই দেন। তার পূর্বে 'গৌড়' বলতে প্রধানত বোঝাত বরেন্দ্রভূমি ; তারপর বাঙ্‌লার অনেকটা অংশ। পরে পাল রাজাদের গৌড় সাম্রাজ্য যতই বিস্তার লাভ করতে থাকে ততই 'পঞ্চগৌড়', 'সপ্তগৌড়' বলে উত্তর ভারতের অনেক দূর পর্যন্ত গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হয়।

কিন্তু এসব অঞ্চলের মানুষের সাধারণ ভাষা বাঙ্‌লা নয় ; তাই এসব অঞ্চলকে বাঙ্‌লা বলা কখনো সম্ভব নয়। অর্থাৎ বাঙ্‌লা যাঁর আশৈশব নিজস্ব ভাষা তিনিই বাঙালী ; আর যেখানকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষক-শ্রেণী, সাধারণ ভাবে বাঙ্‌লা কথা বলেন সে-দেশই বাঙ্‌লা দেশ,—রাষ্ট্র হিসাবে সে-স্থান ভারত বা পাকিস্তান, কিংবা বিহার 'রাজ্য', আসাম 'রাজ্য' বা অন্য যে-কোনো 'রাজ্যে'র অন্তর্ভুক্তই হোক, তাতে যায় আসে না। তাই জাতি ও দেশের প্রধান এক পরিচয়—ভাষা ; কারণ ভাষা একটা মৌলিক সামাজিক বন্ধন, সংস্কৃতির এক প্রধানতম বাহন, জাতির মানসিক রূপেরও পরিচায়ক।

বাঙ্‌লা ভাষা

বাঙ্‌লা ভাষা কিন্তু অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাও নয়, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাও নয় ; আর ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষার চিহ্ন তো এ ভাষায় প্রায় নেই- ই বলা

চলে। বাঙ্‌লা ভাষা ভারতীয় 'হিন্দ্‌-আর্য' গোষ্ঠীর ভাষারই বংশধর। তার কারণ, বাঙ্‌লার প্রাচীনতম অধিবাসী অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটচীনা প্রভৃতি জাতি-উপজাতিদেরহটিয়েদিয়েবাঙ্‌লার মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করে ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে উত্তর ভারতের আর্য-ভাষী হিন্দ্‌-আর্য সভ্যতার ধারক নানা জাতের লোকেরা। তারা সকলে রক্ত হিসাবে বা জাতি হিসাবে 'আর্য' ছিল না। 'আর্য' কথাটাই সম্ভবত মূলত একটা সাংস্কৃতিক নাম। যারা পশ্চিম থেকে বাঙ্‌লা দেশেআসত তারা এই ভাষায় ও সংস্কৃতিতেই ছিল এক গোষ্ঠীর। খ্রীষ্টপূর্ব ১,০০০ থেকে খ্রীঃ ৫০০ অব্দের মধ্যেই তারা সম্ভবত প্রথমে এসেছিল বিদেহে, মগধে; পরে আসে অঙ্গে, আর তারও পরে বঙ্গে, কলিঙ্গে। যারা এসব দেশে প্রথম আসত, বসবাস করত এখানকার স্থানীয় 'অন্‌-আর্য' অধিবাসীদের সঙ্গে, স্বভাবতই তারা আর্য-সংস্কৃতির আচার-বিচার বিশুদ্ধ রাখতে পারত না। তাই উত্তর-ভারতে বা আর্যাবর্তে ফিরে গেলে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হত। এ থেকে বুঝতে পারি, কেন বৈদিক যুগে 'প্রাচ্য'দেরও অসম্মানের চোখেই দেখা হত, আর বঙ্গ জাতিকে বলা হয়েছে 'বয়াংসি', কি না পক্ষিজাতীয়।

খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ অব্দের পূর্বেই কিন্তু আর্য-ভাষীদের মধ্যে মগধ রাজ্য প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে। তারপরে মৌর্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হল মগধ। এই মৌর্য যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৩।২ শতক) থেকেই বাঙ্‌লা দেশে আর্য-ভাষীদের উপনিবেশ স্থাপিত হতে থাকে। অবশ্য বাঙ্‌লা দেশে অশোকের কোনো অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বগুড়ার মহাস্থান-গড়ের 'সংবঙ্গীয়'দের প্রতি নির্দেশটি রচিত হয়েছে আর্যভাষার 'পূর্বী প্রাকৃতে' এবং উৎকীর্ণ হয়েছে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপিতে। তা থেকে বোঝা যায়, আর্য-ভাষীরা মৌর্যযুগে উত্তর-বঙ্গে এসেছে। নিম্নবঙ্গেও তমলুক, বেড়াচাঁপা প্রভৃতি স্থানে শুঙ্গ, কুশান প্রভৃতি যুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্তযুগে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক থেকে ৭ম শতকে) দেখি এই আর্য-ভাষীদের বসতি পশ্চিম বাঙ্‌লার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। বাঁকুড়ার পোখরণায় (পুষ্করণ) চন্দ্রবর্মার পুরালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; তার অক্ষর গুপ্তযুগের প্রথম দিক্‌কার ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন। সংস্কৃত তখন দেশের রাজভাষা; কিন্তু রাজপুরুষেরা মুখে পূর্বী প্রাকৃতেরই কোনো রূপ বলতেন। বাঙ্‌লার ভূমিজ অন্ত্যজেরাও খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের কাছাকাছি এই হিন্দ্‌-আর্য গোষ্ঠির কথিত ভাষা হিসাবে এই প্রাচ্য প্রাকৃতকে গ্রহণ

করতে আরম্ভ করেছিল, তা অনুমান করা যায়। তারপর গৌড় সাম্রাজ্যের পত্তন হল পাল রাজত্বে (খ্রীঃ ৭৪০ থেকে খ্রীঃ ১,১০০) ; আর গৌড়ভূমি (উত্তর-বঙ্গ) তখন আর্য-সংস্কৃতির এক প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কি 'গৌড়ী রীতি'তে সংস্কৃত রচনায়, কি ভাস্কর্যকলায়, কি বিদ্যাচর্চায়—গৌড় তখন উত্তর ভারতে অগ্রগণ্য। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' আগেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এই যুগে হিন্দ্-আর্য ভাষার প্রাচ্য প্রাকৃতের শাখাগুলির মধ্যেও নূতন বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। যেমন, 'মাগধী প্রাকৃতে'র মধ্যে পশ্চিম মাগধী ('ভোজপুরিয়া' যার বংশধর), মধ্য মাগধী (মগহী, মৈথিলী প্রভৃতিতে যার পরিণতি) ও পূর্ব মাগধী (বাঙ্লা, ওড়িয়া, অসমিয়া যার সন্তান), এরূপ প্রকার-ভেদ তখন লক্ষ্য করা যেত। এর কিছু পরেই দেখা গেল পূর্ব মাগধীর বংশধর বাঙ্লা ভাষা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিন্তু তখনো বাঙ্লা দেশের উচ্চবর্গের মানুষেরা কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃতে, না হয় অবহট্‌ঠতে (শৌরসেনী অপভ্রংশের চলিত নাম)। তার কারণ বোঝাও প্রয়োজন।

সংস্কৃত কোনো কালে কথ্যভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সংস্কৃত মধ্য-যুগেও অনেক দিন পর্যন্ত ছিল ভারতের উচ্চ-কোটির সংস্কৃতির বাহন। এখনো সে-সম্মান সে সম্পূর্ণ হারায় নি। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের পরে লোকে মুখে যে হিন্দ্-আর্য ভাষা বলত তার নাম ছিল 'প্রাকৃত', অর্থাৎ প্রাকৃত জনের ভাষা। কিন্তু কথিত ভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হয়,—কালভেদেও হয়, দেশভেদেও হয়। বিশেষত, আর্য-ভাষীরা যতই অন্যভাষীদের দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে, ততই সেই সব দেশের লোকের ভাষার প্রভাবও আর্য-ভাষীদের নিজেদের কথাবার্তায় আর্য-ভাষার উপর অল্পাধিক পড়তে থাকে। প্রাকৃতেরও তাই প্রথম যুগেই (খ্রীঃ পূঃ ১,০০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৫০০র মধ্যে) দুই রূপ দেখা দেয় :—'প্রাচ্য' ও 'উদীচ্য'। এর পরে সেই 'প্রাচ্য' প্রাকৃতেরও দুটি শাখা জন্মায়—একটি 'মাগধী', বিশেষ করে মগধ তার জন্মক্ষেত্র ; আর একটি 'অর্ধ-মাগধী'—কোশল ছিল তার কেন্দ্র। অন্যদিকে পশ্চিমের 'মধ্যদেশে' (গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীতে ও শূরসেনদের রাজ্যে উদ্ভূত হয় 'শৌরসেনী প্রাকৃত'। মৌর্য যুগে, মগধের মতোই মাগধী প্রাকৃতেরও মর্যাদা ছিল। কিন্তু তারপর থেকে উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সেই অন্তর্বেদী শৌরসেনী অঞ্চল। তখন থেকে শৌরসেনী প্রাকৃতই উত্তর ভারতে প্রাধান্য অর্জন করে,

মাগধী প্রাকৃত তুচ্ছ বলে গণ্য হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে বররুচি তাঁর 'প্রাকৃত-প্রকাশ' ব্যাকরণে কাব্য-সাহিত্যে প্রাকৃতের প্রয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারও আগে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপের প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, আমরা দেখি—সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ভাষা বলে বীর নায়কেরা; 'শৌরসেনী প্রাকৃতে' কথা বলে রানী, রাজসখী প্রভৃতি অভিজাত মহিলারা; তারা গান গায় আবার 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে' (তা সুললিত ছিল বলে কি ?); আর শকুন্তলার ধীবরদের মতো (সাধারণ শ্রমজীবী) মানুষেরা কথা বলে 'মাগধী প্রাকৃতে'; দস্যু ও ঘাতকেরা বলত 'পৈশাচী প্রাকৃত'––সম্ভবত তা ছিল কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাচীন কথ্য ভাষা। এই সাহিত্যিক ব্যবস্থাটা হয়তো তখনকার বাস্তব অবস্থা দেখেই স্থির হয়েছিল—অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত প্রাকৃত-জনের ভাষা, শৌরসেনী প্রাকৃতের মর্যাদা অতুলনীয়। কিন্তু এ রকমের পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যায়—সাহিত্যে এই সব রীতি ও ব্যবস্থা যখন নেওয়া হচ্ছিল, বিবিধ অঞ্চলে লোকের মুখে ভাষা তখন আরও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যের প্রাকৃতগুলি তাই লোক-মুখের প্রাকৃতের ঘষামাজা রূপ; আর তাও আবার অনেকটা ধরাবাঁধা কৃত্রিম রূপ। এদিকে খ্রীঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে লোকের মুখের ভাষা এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে প্রাকৃতের যে-রূপ দাঁড়ায় তাকে আর তখনকার মানুষেরা প্রাকৃত বলত না; বলত 'অপভ্রংশ', চলতি কথায় 'অবহট্‌ঠ' ('অপভ্রষ্ট')। এই অপভ্রংশ রূপই আবার ভেঙে-চুরে খ্রীঃ ১,০০০-এর দিকে নানা অঞ্চলে ভারতীয় নানা আধুনিক ভাষা রূপে জন্ম নিতে থাকে—যেমন, বাঙ্‌লা, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, অবধী (অযোধ্যার), ব্রজভাষা ইত্যাদি। কিন্তু একটা কথা জানা দরকার :—আমরা 'শৌরসেনী অপভ্রংশে'রই লিখিত নিদর্শন পাই; অন্যান্য প্রাকৃতের 'অপভ্রংশ দশা'র প্রমাণ পাই না। এইজন্যই 'অবহট্‌ঠ' বলতেই বোঝায় 'শৌরসেনী অপভ্রংশ', অন্য অপভ্রংশগুলি ছিল অবজ্ঞেয়। আর পূর্বেই বলেছি রাজপুত রাজাদের প্রভাবে শৌরসেনী অবহট্‌ঠ খ্রীঃ ৮ম শতকের পর থেকে উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠে। এই শৌরসেনী অবহট্‌ঠেরই বংশধর ব্রজভাষা, খাড়িবোলী; আর এ ভাষাই মুসলমানী প্রভাবে পরিণত হয় হিন্দোস্তানীতে। আধুনিক 'হিন্দী' এই হিন্দোস্তানীরই উপর গঠিত

সংস্কৃতশব্দবহুল লিখিত ভাষা। উর্দু সেই হিন্দোস্তানীরই উপর গঠিত পারসীশব্দবহুল লিখিত ভাষা; তাই হিন্দী ও উর্দু কুলীন ভাষা। কিন্তু কথা এই—৮ম থেকে ১০ম শতকে উচ্চবর্গের মানুষ সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হলে তা রচনা করত 'অবহট্‌ঠ'তে। বাঙালী কবিও তাই তখন সংস্কৃতে আর অবহট্‌ঠতে কাব্য রচনা করতেন স্বচ্ছন্দে;—কারণ, বাঙ্‌লার বিদ্বজ্জনেরা এ-সব রচনারই সমাদর করতেন, বাঙ্‌লা রচনার নয়।

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের পরিবেশ

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার: বাঙালী যখন বাঙ্‌লা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করে তখন সে হাজার দেড়েক বৎসরের (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১,০০০ অব্দের মধ্যে) ভারতের হিন্দ্‌-আর্য সংস্কৃতির ও হিন্দ্‌-আর্য ভাষার উত্তরাধিকারী। অবশ্য ততদিনে ভারতের আর্য-সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি কতকটা কালক্রমে সামাজিক নিয়মে, আর অনেকটা এই দেশের প্রাচীনতর নানা অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে, এক নিজস্ব ভারতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণভাবে ভারতের এই সংস্কৃতিকে বলা চলে 'প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি'—যদিও তারও অনেক স্তর আছে; দেশভেদে, সম্প্রদায়ভেদে তার অনেক প্রকার-ভেদও ছিল। তথাপি তার তিনটি প্রধান লক্ষণ সমস্ত ভারতে এই সেদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—যথা, এই হিন্দু-সংস্কৃতির বাস্তব জীবনযাত্রা ছিল পল্লী-সভ্যতার উপযোগী বাহুল্যহীন; সমাজ ছিল জাতি-ভেদে বিভক্ত, এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় শুধু পরজন্মে নয়, 'প্রাক্তন' বা কর্মফলেও বিশ্বাস ছিল সুগভীর। এগুলোকে তাই বল্‌তে পারি 'সর্ব-ভারতীয়' জিনিস। অবশ্য প্রাচ্য ভারতের এই পূর্ব-প্রান্তে সেই প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতিও এখানকার নৈসর্গিক পরিবেশে ও এই বহুমিশ্রিত বাঙালী জাতির সামাজিক পরিবেশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্যলাভ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু স্মরণীয় এই যে, এই বৈশিষ্ট্যও ছিল গৌণ। যাঁরা সংস্কৃতিমান্‌ ও উচ্চকোটির চিন্তার পক্ষপাতী, বাঙ্‌লা দেশেও তাঁদের চেষ্টা ছিল এই হিন্দ্‌-আর্য সংস্কৃতিকে বা ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতির মূল ধারাকে যথাসম্ভব মান্য করা। তাই এই সংস্কৃতি ছিল বাঙালী সাহিত্যিকের একটি উত্তরাধিকার। রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে তা বাঙ্‌লাকে একদিকে যুগিয়েছে বিষয়বস্তু (যাকে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন Matter of Sanskrit) এবং অন্যদিকে অনেকাংশে দান করেছে বাঙালীর কাব্যাদর্শ। প্রাচীন বাঙালী সাহিত্যিকের সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ছিল সর্বভারতীয় কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ও ধর্মের।

কিন্তু যারা বাঙ্‌লার প্রাকৃত জন তারা জাতি হিসাবে মূলত সেই হিন্দ্‌-আর্য গোষ্ঠীর নয়। অবশ্য হিন্দ্‌-আর্য ভাষা তারা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সংস্কৃতির উচ্চকোটির চিন্তায় বা আচার-নিয়মে তাদের অধিকারও ছিল না। বাহ্যত অবশ্য সেই হিন্দ্‌-আর্য সংস্কৃতিকে তারাও গ্রহণ করেছিল; কিন্তু বাঙ্‌লার এই জন-শ্রেণী জীবন-যাত্রায়, আচারে-নিয়মে, ভাবনায়-কল্পনায় নিজেদের প্রাচীনতর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যথেষ্টই বহন করে চলেছিল। এমন কি, পরবর্তী কালের লোক-সংস্কৃতির মধ্যেও সে-সব জীবিত ছিল—যেমন, রূপকথায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, প্রবাদ-বচনে। এই লৌকিক ধারা, এটি বাঙালীর দ্বিতীয় উত্তরাধিকার। বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষেও কালক্রমে এই লৌকিক উত্তরাধিকার—কাহিনী ও চিন্তাধারা—লাভ করবার কথা। তা তাঁরা করেও ছিলেন,—এইটিই অন্‌-আর্য-বাঙালীর নিজস্ব বস্তু, বাঙ্‌লার খাঁটি জিনিস (যাকে বলা হয় Matter of Bengal)। মঙ্গল-কাব্যগুলির উপাখ্যানে, রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর নানা অংশে তা স্পষ্ট। কিন্তু সেই প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগে এই লৌকিক উত্তরাধিকার সাহিত্যে সমুন্নীত হয় নি—লোক-গীতি, লোক-কাহিনী হিসাবে তা ছিল বাঙালী জনগণের মুখেই নিবদ্ধ। উচ্চকোটির শিক্ষিতরা তা লিপিবদ্ধ করেন নি।

সামাজিক বনিয়াদ

এই সব ছিল প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাববস্তু বা বিষয়বস্তু। বাঙ্‌লার যে সামাজিক অবস্থায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য উদ্ভূত হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অবস্থার প্রামাণিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, যা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রধান সত্য তা বাঙ্‌লার ক্ষেত্রেও ছিল সত্য—এ সমাজ ছিল মোটের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মনির্ভর পল্লীসমাজে (Village Communities) বিভক্ত। গ্রামের উৎপাদনেই মোটের উপর

গ্রামবাসীর জীবন-যাত্রা নির্বাহ হত; বাইরের সামান্য জিনিসই আনা-নেওয়া চলত। পল্লীর উৎপাদন পল্লীর নিজ প্রয়োজন মতো হলেই হল, উৎপাদন-বৃদ্ধির তাগিদ ছিল সামান্যই। দ্বিতীয়ত, ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙ্‌লা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ; আর কৃষির যন্ত্র-পাতি ও কৃষি-পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক; এখনো প্রায় তা-ই আছে। তাই পল্লীর প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ে বড় রকমের সমস্যা বেশি হত না। অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যত্রের মতো বাঙ্‌লায়ও এই উৎপাদনের প্রধান অংশ যেত গ্রামের উচ্চবর্গের সেবায় (যেমন, রাজপুরুষ, রাজসেবক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন গুরু, করণ প্রভৃতি), সামন্ত গোষ্ঠীর নানা স্তরের ভূস্বামীর হাতে। সাধারণ ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষক অবশ্যই দেশে সংখ্যায় বেশি ছিল। কিন্তু শূদ্র পর্যায়ের ভূমিহীন সেবক-জাতীয় কৃষিজীবী ও কারু-জীবীরা (হালিক, জালিক, ডোম, বাগ্‌দী, শবর প্রভৃতি; তারা কেউ কেউ ভূমিজ অন্ত্যজ,—প্রাচীনতম উপজাতির বংশধর) ছিল অনাচরণীয়, গ্রামান্তেবাসী (এখনকার মতোই), এবং নিতান্ত হীনাবস্থ;—অবশ্য তারাই ছিল উৎপাদনের প্রধান বাহন। বলাই বাহুল্য, মাঝে-মাঝে এই বৈষম্য নানা ধরণের বিরোধেও রূপ লাভ করত। কিন্তু আরও একটা কথা আছে—প্রাচীন বাঙালী সমাজের তা একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বাঙ্‌লার মঙ্গল-কাব্য ও ব্রতকথাগুলিতে দেখি, বেনেরা (মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় তাদের নাম হল 'সওদাগর') ছিল সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। ইতিহাসের সাক্ষ্য বলে, তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন ভারতে প্রধানতম এক বন্দর—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিকেরা (হয়তো গুপ্ত যুগ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত) গিয়েছে; আর যবদ্বীপ, সিংহল, সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্কেও সে সময়ে তারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তা হলে শুধু কৃষক নয়, এই শেষের দিকে (খ্রীঃ ৪০০—খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে?) বাঙ্‌লায় বণিক শ্রেণীও উদ্ভূত হচ্ছিল, ছোট ছোট নগর-বন্দরও ছিল। অর্থাৎ কৃষি ও পণ্য উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন নয় যে, কৃষি নেই, বণিকই বাংলা দেশে প্রথম পত্তন স্থাপন করেছে। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজে বণিক-শক্তির বিকাশের সুযোগ আসলে বেশি ছিল না। তদুপরি, জাতিভেদের বাধায় সমুদ্রযাত্রাও ক্রমে নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমে ৮ম থেকে ১২শ শতকে বহিঃসমুদ্রে মুসলমান আরবরা রাজ্যে ও বাণিজ্যে অধিকার স্থাপন করে, ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা বিপজ্জনক

হয়ে পড়ে। এবং সর্বশেষে হয়তো রাজশক্তি বণিকশক্তিকে খর্ব করে;—হিন্দু সেন-রাজারা বেনেদের (বৌদ্ধ বলে?) সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেয়—'বল্লালচরিত'-এর এ-কথা সেই সত্যেরই প্রমাণ। সম্ভবত এসব কারণে এই বাঙালী বণিকশ্রেণী উৎপাদকশক্তিরূপে আর বেশি বিকাশ লাভ করে নি। পালদেব (?) পরে তারা বহির্বাণিজ্য খুইয়ে অন্তর্বাণিজ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই বেনেদের প্রভাব-বৈভবের কথা তারপরে বেঁচে থাকে বাঙালীর ব্রতকথায় উপাখ্যানে, আর সেই সূত্রে বাঙালীর সাহিত্যে।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

মোটের উপর বিচ্ছিন্ন গণ্ডিবদ্ধ পল্লীসমাজের পরিবেশেই বাঙলা সাহিত্যের জন্ম; এই সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের বড় অবলম্বন ছিল তাব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার—বিশেষ করে হিন্দু-আর্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। দু'রকমের রচনায় আমরা তার পরিচয় পাই—যথা, এক, বাঙালী-রচিত সংস্কৃত সাহিত্য; আর-এক, বাঙালী-রচিত অবহট্‌ঠ খণ্ড-কবিতা। এই দুই সাহিত্যের ভাব, রীতি, অলংকার প্রভৃতি থেকে বুঝতে পারি প্রাচীন বাঙালীর মানস-লোক কিরূপ ছিল এবং তাদের সাহিত্যাদর্শ ছিল কি ধরনের। বুঝি যে বাঙালী কবি যখন এর পর সত্যসত্যই বাঙলায় সাহিত্য রচনায় যত্নপর হবেন, তখন স্বভাবতই এই ঐতিহ্য, এই মনোজগৎ ও এই সাহিত্যাদর্শের ছাপ এসে যাবে বাঙলা লেখায়ও। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে তাই বাঙালী লেখকের এই সংস্কৃতে রচিত ও অবহট্‌ঠে রচিত সাহিত্যের মূল রূপটিও লক্ষণীয়।

বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য ঃ বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায় বাঙলাদেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত তাম্রশাসনে। সেগুলি সংস্কৃত কাব্য ও অলংকার শাস্ত্রের বিচারে তুচ্ছ নয়। যেমন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার নিধনপুরের অনুশাসন। অনুশাসনটি সমাস-সমৃদ্ধ, অলংকার-ঐশ্বর্যে চমকপ্রদ। সংস্কৃত-সাহিত্যে যাকে 'গৌড়ী রীতি' বলে তা গৌড় দেশের কবিদেরই দান; ভাস্করবর্মার অনুশাসনটিও তারই একটি প্রথম দিককার নমুনা। পাল যুগেই (খ্রীঃ ৭০০—১,১০০ অব্দ) এই 'গৌড়ী রীতি' বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্যিকদের নিকট খ্যাতিলাভ করে। পাল সম্রাটরা ছিলেন বৌদ্ধ; তাই তাঁদের প্রশস্তিতে লোকনাথ, তারা প্রভৃতি বৌদ্ধ

দেব-দেবী ও বৌদ্ধ ধর্ম-সংঘের বন্দনা রয়েছে। তারপরে আসে সেন-যুগ (খ্রীঃ ১,১০০-১,২০০)। সেনেরা ছিলেন হিন্দু, মূলত 'কর্ণাট ক্ষত্রিয়'। তাঁদের সময়ে নারায়ণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ, শিব, উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর বন্দনাই বেশি। বাঙালী হিন্দু সমাজের নূতন পত্তন হয় সেনরাজদের নির্দেশ-মতো (বৌদ্ধ বাঙালীর অবনয়নও সম্ভবত তাঁরাই সাধিত করেন)। তখন তাই সংস্কৃত কাব্য-রচনার ও কাব্য-চর্চার আরও বেশি সমাদর বাড়ে। উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব মিশ্র, শরণ ও ধোয়ী (বা ধোয়িক) প্রভৃতি বাঙালী কবিদের নাম সুপ্রসিদ্ধ। 'কলিকালবাল্মীকি' সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পর্যন্ত বাঙালী পণ্ডিত কবিদের সংস্কৃত রচনা সাহিত্যের মানদণ্ডে সমুত্তীর্ণ। এই সব কবি-কীর্তি ছাড়াও তখনকার দিনে অসংখ্য খণ্ড শ্লোক রচিত হয়। শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' (১১২৭ শকাব্দে—খ্রীঃ ১২০৬তে রচিত) এরূপ ৪৮৫জন কবির লেখা প্রায় ২,৩৭০টি থেকে সংকলিত হয়েছে। নেপালে পাওয়া 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়'ও এই ধরনের আর-একখানি সংকলন-গ্রন্থ—তাতে ১১৩-জন কবির ৫২৫টি শ্লোক পাওয়া যায়। তার লিপি-কালও ১,২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। বৌদ্ধদের লেখা কবিতা তাতে প্রচুর; এই সব প্রকীর্ণ কবিতার কবিরাও যে অনেকেই বাঙালী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই (দ্রঃ—Dr. S. K. De—Sanskrit Literature; History of Bengal, Vol I, Dac. Univ.; এবং ডাঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস' ও 'প্রাচীন বাঙ্‌লা ও বাঙালী')। এর অনেক কবিতাই কাব্যগুণে ও বর্ণনাগুণে চমৎকার। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'বঙ্গাল' নামের কবির শ্লোকটিই এখানে প্রথমে নেওয়া যাক। কারণ, কবি তাতে বঙ্গবাণীর জয়ঘোষণা করেছেন:

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুণীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।

গঙ্গায় এবং ঘনরসময়ী, গভীর, বক্রোক্তির জন্য সুন্দর, কবিদের দ্বারা আস্বাদিত বঙ্গাল-বাণীতে নিমজ্জন লোককে পবিত্র করে।

'গঙ্গা' ও 'বঙ্গালবাণী'র জন্য গর্ব-বোধ যখন কবির মনে জন্মেছে, এবং কবিরা বাঙ্‌লায় কবিতা না লিখলেও বঙ্গ-বাণীর রসাস্বাদন করেছেন, তখন বাঙালীর মনে বাঙ্‌লায় কাব্য-রচনার সাধও জেগেছে নিশ্চয়ই। সত্যই যে

তা জেগেছিল, তার প্রমাণও পাই। তথাপি জ্ঞানী, গুণী ও মানীদের সমাজে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের আদর বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। খ্রীঃ ১৬শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত রূপ ও সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা বাঙালীর সংস্কৃত কাব্য-রচনায় নুতন করে প্রাণসঞ্চার করেন। অবশ্য, বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই সংস্কৃত কবিদের যথার্থ পক্ষে কোন স্থান নেই—এমন কি জয়দেবেরও নেই। কিন্তু এই বাঙালী কবিদের দান ও এঁদের ঐতিহ্য রয়েছে বাঙ্‌লা-সাহিত্যের সৃষ্টিতে। এই সব সংস্কৃত-লেখক কবিদের গদ্য-রচনায় আমরা প্রধানত দেখি বাণভট্টের প্রভাব, আর পদ্যে কালিদাসের। সংস্কৃত সাহিত্যের সেই ভাবলোক ও সাহিত্যাদর্শ এই সব সংস্কৃত রচনার মধ্য দিয়ে বাঙ্‌লা দেশে সুপ্রসারিত হয়েছে। আবার এঁদের প্রকৃতি-বর্ণনা ও বিষয়-বস্তু থেকে বাঙালী কবিদের নিজস্বতাও কতকটা বুঝতে পারা যায়। কবিত্ব করে অনেকে বাঙ্‌লা দেশের পল্লীশ্রীর কথা বর্ণনা করেছেন, পল্লী-বিলাসিনী বঙ্গবধূ, এমন কি বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের নিয়েও কাব্য করেছেন কোনো কোনো কবি। কেউ-কেউ কৃষি-নির্ভর পল্লীর সমৃদ্ধির কথাও বলেছেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর জীবন-মান তখনও নিশ্চয়ই ছিল প্রায় এখনকার মতই নিরাভরণ, অসচ্ছল—তাতে সন্দেহ নেই।

যেমন, সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি সংস্কৃত শ্লোকে একজন কবি বলেছেন :— "কাঠের খুঁটি নড়বড় করছে, মাটির দেয়াল ধ্বসে পড়ছে, চালের খড় উজাড়, আমার জীর্ণ গৃহে কেঁচোর সন্ধানে এখন ব্যাঙ ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (দ্রঃ—সেন, বাঃ সাঃ ইঃ, ১।২।৬)

পরবর্তী বাঙ্‌লা সাহিত্যেও দেখি দারিদ্র্যবর্ণনার অভাব ঘটে নি।

দু-একটি শ্লোকে এরূপ দু-একজন কবি সাধারণ মানুষের আরও কঠিন জীবন-যাত্রার ছবিও রেখে গিয়েছেন (দ্রঃ—সেন, প্রাঃ বাঃ ও বাঃ)।

যেমন, দরিদ্র মায়ের ছবি :—নিজে দারিদ্র্যে শীর্ণ; ক্ষুধায় ছেলেমেয়েদের পেট আর চোখ বসে গিয়েছে, চোখের জলে গাল ভাসিয়ে মা প্রার্থনা করছে এক মুঠো চালে যেন তাদের এক মাস চলে।

কিংবা কবির এই আক্ষেপ : শিশুরা ক্ষুধায় শীর্ণ, বন্ধুরা বিমুখ, ঘড়ার জলও নেই; তাতেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু দুঃখ রাখি কোথায় যখন দেখি—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করবার জন্যে ছুঁচ চাইতে গিয়ে গৃহিণী পেলেন প্রতিবেশীদের কাছে গঞ্জনা।

অথবা, প্রাচীন বাঙলার শ্রমজীবিনী মেয়েদের কথা নিয়ে লেখা করি শরণের এই শ্লোকটি—'পসারিণীদের' নিয়ে বৈষ্ণব কবিতায় যে রস-মাধুর্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার নামগন্ধও নেই কিন্তু এই শ্লোকে :—

এতস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ।
স্কন্ধ-প্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরা॥
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোতপ্লুতাবর্ত্মচ্ছিদো।
হট্টক্রেয্য পদার্থ-মূল্য-কলন-ব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ॥

অর্থাৎ দিনশেষের সন্ধ্যাসূর্যের মতো রাঙা চোখে ধেয়ে চলেছে মেয়েরা, দ্রুতগমনে খসে পড়ছে তাদের মাথার আঁচল, অবশ্য বারে বারে তা মাথায় তুলে দেবার প্রয়াসের তাদের অন্ত নেই।—চাষী সকালবেলা বেরিয়ে গিয়েছে মাঠে; তাদের আসবার সময় হয়েছে, এই ভেবে এই কৃষক মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে—যেন পথ তাতে সংক্ষেপ হবে! সঙ্গে সঙ্গে হাটের কেনা-বেচার হিসেব করতেও ব্যস্ত রয়েছে তাদের হাতের আঙুল!

এই হল প্রাচীন বাঙ্‌লার জন-জীবনের চিত্র—সার্থক চিত্র; আর বস্তুবাদী সাহিত্যেরও একটি প্রাথমিক প্রয়াস। সে ঐতিহ্যও বাঙ্‌লা সাহিত্য পেয়েছিল।

বাঙালীর অবহট্‌ঠ-রচনা : কিন্তু সংস্কৃত কবিরা মোটের উপর ছিলেন উচ্চবর্গের লোক, বিদগ্ধ, সুরসিক; অনেকেই হয়তো ছিলেন রাজা-রাজড়ার পারিষদ বা বৃত্তিভোগী। তাঁদের কবিতায় তাই ইন্দ্র-চন্দ্রের ঘটা ও বিলাস-বর্ণনায় মণিমাণিক্যের ছটাই বেশি। সংস্কৃত ছাড়া অবহট্‌ঠতে যাঁরা শ্লোক রচনা করছিলেন তাঁরাও প্রধানত ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী, আর রচনাও করতেন গুণী ও মানীদেরই উপভোগের জন্য। শৌরসেনী অপভ্রংশ অবশ্য প্রাচীন হিন্দীতে রূপান্তরিত হতে থাকে ১০ম শতাব্দীর কাছাকাছি থেকে। কিন্তু ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত এই অবহট্‌ঠে কাব্য-রচনা ছিল পণ্ডিত-সমাজে প্রশস্ত। মিথিলাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিদ্যাপতি সংস্কৃতে দেবদেবীর স্তবগান লেখেন; মৈথিলিতে তিনি লেখেন তখন ব্রজলীলার গীত, আর অবহট্‌ঠতেও লেখেন কাব্য ('কীর্তিলতা')। বাঙ্‌লা দেশে তখন বিদ্যাপতির মতো প্রসিদ্ধ কবির নাম পাই না। কিন্তু 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' বাঙালী অবহট্‌ঠ কবির কবিতা পাওয়া যায়। স্বভাবতই এ কবিতায় বাঙ্‌লা ভাষার ও বাঙ্‌লা রীতিনীতির ছোঁয়াচ লেগেছে, গবেষকেরা তা দেখ্‌তে পান। দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে নিচ্ছি (দ্রঃ—সেন, বাঃ সাঃ ইঃ);

কারণ, ভাষা হিসাবে এ সব বাঙ্‌লা কবিতা নয়, হিন্দীর মাতৃস্থানীয়া সেই অবহট্‌ঠ ভাষারই নমুনা।

সো মহ কন্তা [=সেই মোর কান্তা]
দূর দিগন্তা। [=দূর দিগন্তে (এখন)।]
পাউস আএ [=প্রাবৃট্ আসে]
চেউ চলা এ॥ [=চিত্ত বিচলিত॥]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চীনা কবিতার মতোই এ কবিতা সুন্দর ও ব্যঞ্জনাময়।

তরুণ তরণি তবই ধরণি পবণ বহ খরা
লগ ণহি জল বড় মরুথল জন-জীবন হরা।
দিসই বলই হিঅঅ ডুলই হমি একলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ সুণ হি পহিঅ মণ ইছই কহূ।

অনুবাদ: তরুণ সূর্য তাপিত করে ধরণীকে, পবন বহিতেছে খরবেগে; নিকটে জল নাই, বড় মরুস্থল জন-জীবন-হর। দিশ্বলয়ে হৃদয় দুলিতেছে (ছুটিয়াছে?), আমি একাকিনী বধূ; প্রিয় ঘরে নাই, হে পথিক! শোন, মনের ইচ্ছা কহি।

এইরূপ বহু কবিতা আছে। বীররসের কবিতাও প্রচুর। মোটের উপর সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের ভাবলোকই এই অবহট্‌ঠ কাব্যেরও ভাবলোক। তথাপি এর সুরে একটি আকৃতি আছে; আর ছন্দে ও মিলে এ যে প্রাচীন বৌদ্ধ 'গাথা'-কাব্যের ধারা অনুসরণ করে হিন্দী ও বাঙ্‌লা কবিতার দিকে এগিয়ে এসেছে, তাতে ভুল নেই। অবহট্‌ঠ কবিতাও এই জন্যই মূল্যবান;—তার ভাবগত ও রূপগত দুই ঐতিহ্যই প্রাচীন বাঙ্‌লা কবিতা লাভ করেছে। এমন কি,—বৈষ্ণবদের 'ব্রজবুলী' পদের প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ,—কিন্তু সেই 'ব্রজবুলী'র ভাষার বনিয়াদ সম্ভবত অবহট্‌ঠ (ডঃ সুকুমার সেনের এ অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয়), পুরনো মৈথিলী নয়।

অবহট্‌ঠ কবিতাতেও কদাচিৎ বাঙালীর বাস্তব জীবনযাত্রার এক-আধটুকু সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন,

ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি (?) মচ্ছা, নালিচা গচ্ছা,
দিজ্জই কন্তা খা (ই) পুণবন্তা॥

অনুবাদ : ওগরা ভাত, কলার পাতা, গাওয়া ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মৌলি (মদন ?) মাছ, নালতা শাক ;—কান্তা দিচ্ছে, পুণ্যবান খাচ্ছে ॥

এ খাঁটি বাঙালী 'পুণ্যবানে'র চিত্র। আহার্যের কথা বলবার সুযোগ পেলে বাঙালী আর ছাড়ে না। বাঙ্‌লা মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যে কবিকঙ্কণের মতো কবিরাও সে সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত ভারতবর্ষে এখনো বাঙালী জাতিই প্রধান রসনা-রসিক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সরস রঙ্গ-কবিতায় তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন :

গদ্য জাতীয় ভোজ্য কিছুটা দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়,
তাহোক, তবুও তারা লেখকের প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়। (বীথিকা)

সিদ্ধাচার্যগণের ভাব-ঐতিহ্য : কিন্তু অবহট্‌ঠে এক নূতন ঐতিহ্যও সৃষ্টি করেছিলেন একটি বিশিষ্টমণ্ডলীর বাঙালী রচয়িতারা। তাঁরা হচ্ছেন বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজপন্থী এবং শৈবযোগী নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য। আর্য-সংস্কৃতির ভাবলোক থেকে তাঁদের ভাবলোক অনেক পৃথক ; আর সংস্কৃত সাহিত্যের রূপকলা, ঠাট, রীতিনীতিও তাঁদের রচিত অবহট্‌ঠ পদে নেই। তাঁরা কঠিন কথাও বলেছেন সরল ছাঁদে। কারণ, তাঁরা রাজা-রাজড়া বা পণ্ডিত-সমাজের জন্য লেখেন নি ; বরং ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্য, দু-এরই প্রতি ছিল তাঁদের অবিশ্বাস। 'দোহাকোষে'র একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করছি (দ্রঃ সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৩৪) :—

কিং তো দীবেঁ কিং তো নিবিজ্জে
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বে
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী হ্নাই ॥

অনুবাদ : কি হবে তোর দীপে ? কি হবে তোর নৈবেদ্যে ? কি হবে তোর মন্ত্র ও সেবায় ? তীর্থে-তপোবনে যেয়েই বা তোর হবে কি ? মোক্ষ কি লাভ হয় জলে স্নান করে ?

এই ভাব, এই সুর ভারতের বহু সাধক-মণ্ডলীর সুর। অবশ্য ভারত-সংস্কৃতির ঐতিহাসিকরা এই ধারাতেই আর্য-পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির আভাসও লক্ষ্য করতে পাবেন। মোহেন-জো-দড়োয় যে যোগ-সাধনার চিত্রাদি দেখা

যায় আর্য-সংস্কৃতির বিজয় ও বিস্তৃতি সত্বেও সেইসব ধারণা ও প্রাচীনতম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-সমূহ দেশের জনসাধারণের জীবন থেকে কোনোকালে ধুয়ে মুছে যায় নি। উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা অবজ্ঞাভরে পাশে ঠেলে রাখলেও পরবর্তী হিন্দু-সংস্কৃতি সেই সব ভাবনা ও সাধনার পদ্ধতি কখনো শোধন করে, কখনো না-জেনে, ক্রমাগত আপনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। তবু এই সব ভাবনার ও সাধনার অনেকটাই থেকে গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষিতের নিকট অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত। কারণ, তা ছিল মণ্ডলীগত সম্পদ, প্রচ্ছন্ন ও গুহ্য সাধনার ব্যাপার। সিদ্ধাচার্যদের এই ধারা কিন্তু পূর্বাপর অব্যাহত রয়েছে বাঙ্‌লা দেশে। এই ঐতিহ্যই নানাভাবে এসে পৌঁচেছে একালের সহজিয়া সাধনায়, বাউল গানে পর্যন্ত। এ সাধনা অবশ্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপরে সম্পূর্ণ গঠিত নয়; গুহ্য মণ্ডলীগত তন্ত্র। কিন্তু তবু এসব সাধক ছিলেন সাধারণ মানুষের নিকটতর, আর এঁদের পদগুলি আসলে সেই সাধনারই প্রচ্ছন্ন নির্দেশ। এই সিদ্ধ ও নাথ গুরুরা তাই অবহট্‌ঠে নিজেদের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় নি। দেশের সাধারণ মানুষের ভাষাতেও তাঁরা পদ-রচনা করে গেছেন। সেই রকম পদই পাওয়া গিয়েছে 'চর্যাপদে'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চর্যাপদ

চর্যাপদ ও দোহাকোষ : চর্যাপদের ভাব ও ভাষা দুইই বাঙালীর। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'কেও 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা' বলে মনে করেছিলেন। পরবর্তী কালে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা দেখলেন— দোহাকোষের ভাষা আসলে অবহট্‌ঠ; দোহাগুলির উপরে তাই হিন্দীরই বরং দাবী বেশী খাটে। কিন্তু চর্যাপদের প্রায় সমস্ত পদই প্রাচীন বাঙ্‌লা, এমন কি পশ্চিম বাঙ্‌লারই প্রাচীনতম কথ্য ভাষার নমুনা;—এ বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার, ডঃ শহীদুল্লাহ্‌, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, ডঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকেরা সকলেই একমত। অবশ্য স্বভাবতই সে ভাষায় অবহট্‌ঠেরও এক-আধটুকু ছোঁয়াচ লেগেছে। আর, সে সময় পর্যন্ত বাঙ্‌লা, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া, এসব ভাষা পরস্পরের খুবই সন্নিকট ছিল।

ওড়িয়া ভাষা তখনো বাঙ্‌লা থেকে স্বতন্ত্র হতে আরম্ভ করে নি ; প্রাচীন অসমিয়া ও উত্তর বঙ্গের বাঙ্‌লা ভাষা তো মাত্র খ্রী: ১৩০০র পরে বাঙ্‌লা থেকে পৃথক হতে থাকে। অতএব, চর্যাপদের ভাষায় এসব ভাষারও কোনো কোনো লক্ষণ দেখলে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বরং, চর্যাপদের পুঁথি নেপালে সংরক্ষিত ছিল, সেখানেই অনুলিখিত হয়েছিল, তাই চর্যাগুলিতে মৈথিলী ও নেওয়াড়ীর চিহ্ন আরও বেশি থাকাও সম্ভব ছিল। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে চর্যার ভাষা বাঙ্‌লা ভাষা, এমন কি পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্‌লা ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে।*

'চর্যাপদ' ও 'দোহাকোষ' দু'খানি পাওয়া গিয়েছিল নেপালের রাজ-দরবারের গ্রন্থশালায়। প্রাচীন অনেক বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত পুঁথি এই ভাণ্ডার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উদ্ধার করেন। তার কারণ, খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দের পরে যখন একে-একে মগধ ও নদীয়া (পশ্চিম বাঙ্‌লা) তুর্ক আক্রমণে পরাজিত ও অধিকৃত হয় তখন থেকে বাঙ্‌লা, মিথিলা প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ তাঁদের পুঁথিপত্র, পট, দেবমূর্তি প্রভৃতি নিয়ে দেশত্যাগ করেন। তাঁরা কেউ কেউ পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন,—পূর্ববঙ্গ অনেকদিন স্বাধীন ছিল। কিন্তু অনেকেই শরণার্থী হন এই হিমালয়ের পাদস্থিত হিন্দুরাজ্য নেপালে। তখনো অবশ্য নেপাল ছিল বৌদ্ধ নেওয়াড়ীদের দেশ ; হিন্দু গোর্খা রাজপুতরা তা অধিকার করে রাজ্যস্থাপন করে মাত্র ১৮শ শতকে। কিন্তু নেপালে মুসলমান বিজেতারা প্রবেশ লাভ করতে পারে নি, তাই এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন উপাদান সুরক্ষিত হয়। নেপালে বাঙ্‌লা ও মিথিলার শিল্পকলা ও শাস্ত্রচর্চা নূতন রূপ গ্রহণ করে ; সেখান থেকে তা তিব্বতে, চীনেও যায়। বিশেষ করে নেপালে ও তিব্বতেই তাই এখনো অনুসন্ধান করতে হয় তুর্ক-বিজয়ের পূর্বমুহূর্তের মগধ, মিথিলা ও গৌড়ের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক ধর্মের চিহ্ন। অনেকদিন পর্যন্ত সেই ধর্ম ও সেই সংস্কৃতির নিরাপদ চর্চা নেপালে চলে।

* সম্প্রতি অসমিয়া ভাষায় ও ওড়িয়া ভাষায় লেখকেরা 'চর্যাপদ'কে নিজেদের বলে পৃথক পৃথক দাবী করেছেন। হিন্দীবাদী লেখকেরা অবশ্য আরও বেপরোয়া, তাঁরা ভোজপুরিয়াকেই এখন হিন্দীর উপভাষা বলেন, 'চর্যাপদ'কে-ও নিজেদের বলেন, 'দোহাকোষ'কেও নিজেদের বলেন—সবই যেন এক ভাষা! ভাষাতাত্ত্বিকেরা এসব দাবী মানতে পারেন না। 'চর্যাপদে'র ভাষা সম্বন্ধে প্রামাণিক বিচার করেছেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (দ্রষ্টব্য—ইংরেজিতে লেখা 'বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভব ও অভ্যুদয়', ODBL, 59 ff)। ভাষার কথা এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নয়।

'চর্যাপদ' (ও 'দোহাকোষ') সে সময়ে ওদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধার বস্তু ছিল, তা বুঝতে পারা যায়। কারণ, মূল চর্যাগুলি পরবর্তী সময়ে অনুলিখিত হয়েছিল ; সংস্কৃত ভাষায় পর্যন্ত তাদের টীকা রচিত হয়েছিল, এবং তিব্বতী ভাষায়ও তাদের অনুবাদ হয়েছিল। অবশ্য মূল শ্লোকগুলি যে গূঢ় সাধন-রহস্যের কথা, তা না জানলে এই টীকা পড়েও লাভ হয় না। তবু এইসব অবলম্বন করেই শাস্ত্রী মহাশয় এবং পরবর্তী কালে ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী চর্যাপদের ভাব ও ভাষার অনুশীলন করেছেন। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তও তার সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু (১৯৫৬) ও ডঃ সুকুমার সেন চর্যাগুলি ব্যাখ্যা করে সম্পাদিত করেছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অবশ্য সর্বাগ্রে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পরে ডাক্তার মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ চর্যাপদকে বিচার করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ বিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

চর্যাপদের কাল : 'চর্যাপদে'র মূল পুঁথিখানি ১৪ শতকের। পুঁথিখানি তত পুরাতন না হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে চর্যাগুলি বেশ প্রাচীন জিনিস। সঠিক কাল অবশ্য প্রায় কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাঙ্‌লা কাব্যেরই বলা যায় না ; চর্যার রচনা-কালও সেরূপ সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার শহীদুল্লাহ্‌ মনে করেন তা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের লেখা। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন—চর্যাগুলি অত প্রাচীন নয়, রচনা-কাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৯৫০ হতে ১,২০০ অব্দের মধ্যে (দ্রঃ—সুনীতিকুমার চট্টোঃ ইংরেজি History of Bengal, Vol. I, Chap. XII)।

চর্যাপদের পদগুলি রচনা করেন সিদ্ধাচার্যগণ। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্যদের কাল নিয়েও তর্ক অনেক। তিব্বতী ও ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা সংখ্যায় ৮৪ জন ; সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তার ঠিক নেই। অনেকের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ তিব্বতী নানা পুঁথিপত্র ও ঐতিহ্য থেকেও জানা যায়। মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ৯ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যেই সিদ্ধাচার্যরা আবির্ভূত হয়েছিলেন—পণ্ডিতেরা এরূপই অনুমান করেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখার অন্তর্গত সহজ-পন্থার সাধক তাঁরা। আবার, শৈব নাথপন্থী বা যোগীরাও সিদ্ধাদিগকে আপনাদের গুরু বলে দাবী করেন। সহজ-যানের সাধন-তত্ত্বের কথা নাথ-গুরুরা সাধারণের জন্য চর্যাগীতিতে বলেছেন। কিন্তু গুরুর নিকট থেকে না জানলে যে কেউ এসব পদের অর্থ বুঝবে না, তাও তাঁদের কথায় স্পষ্ট।

চর্যার ভাষা হচ্ছে সঙ্কেতের ভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—এ জন্যই তার নাম 'সন্ধ্যা ভাষা', সন্ধ্যার মত আব্‌ছায়া তার কথা, রহস্যময়। কিন্তু কথাটা আসলে সন্ধ্যা নয়, 'সন্ধা',—তা অভিসন্ধি, অভিপ্রায় বোঝাত ; অনেক পণ্ডিতই (এজার্‌টন ও সুশীলকুমার দে—History of Bengal Vol. I, Chapter XI, pp. 329-30) এইরকম মনে করেন। পদগুলির বাইরের অর্থ যদি বা বোঝা যায়, আসল নিগূঢ় অভিপ্রায় তথাপি বোঝা যাবে না। এমন কি, বাইরের নানা যৌন-কথাও হয়তো অধ্যাত্ম তত্ত্বেরই রূপকমাত্র। তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির সে সব সাংকেতিক উপদেশ গুরুই শিষ্যকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। সহজ-পন্থা গুরুর মুখেই শুনতে হয়।

চর্যাপদে ৪৭টি চর্যা পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি অবশ্য খণ্ডিত। তিব্বতী অনুবাদ দেখে মনে হয় এ ছাড়াও আরও চর্যা ছিল ; কিন্তু তা হারিয়ে গিয়েছে।

পদকর্তা-পরিচয় : প্রত্যেকটি চর্যার শেষ শ্লোকে ভণিতা আছে, তাতে পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। ৪৬।৪৭টি চর্যা থেকে আমরা ২৪জন পদকর্তার নাম পাই—হয়তো কোনো কোনো নাম ছদ্মনাম, শুধু পরিচয়-সূচক, কোনো নাম হয়তো বা আসলে রচয়িতার নিজের নয়, তাঁর গুরুর। কাহ্ন বা কাহ্নপাদের লেখাই পাওয়া যায় বেশি, মোট ১২টি। ভুসুকুর আছে ৬টি চর্যা ; সরহের (তাঁর দোহাকোষও পাওয়া গিয়েছে) গীত আছে ৪টি। কুক্কুরীপাদের আছে ৩টি ; আর লুইপাদ, শান্তি, শবর, এঁদের প্রত্যেকের ২টি করে চর্যা আছে। ১টি করে চর্যা পাওয়া গিয়েছে বিরুঅ, গুণ্ডরী, চাটিল, কামলী, ডোম্বী, মহিণ্ডা, বীণা, আজদেব, ঢেণ্ডণ, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী ও ধামের। এ সব পদকর্তাদের অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন, অন্য গ্রন্থাদিও তাঁরা লিখেছেন। এঁদের কারও কারও পরিচয় ভারতের ও তিব্বতের নানা গ্রন্থ থেকে সহজেই লাভ করা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'মুখবন্ধে' সে সব পরিচয় উল্লেখ করেছেন, পরবর্তী পণ্ডিতেরাও তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য তবু তর্ক থেকে যায়। যেমন, লুইপাদই আদিসিদ্ধা মীননাথ (বা মৎস্যেন্দ্রনাথ) বলে সুপরিচিত, মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙলা গোপীচন্দ্র প্রভৃতির গানে উল্লেখিত হয়েছেন। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে লুইপাদের 'আদিসিদ্ধা' বলে প্রসিদ্ধি। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদের কাছে মনে হয় লুইপাদ ও মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বতন্ত্র লোক ; চর্যাপদের টীকাকারও মীননাথের দোহা

যে ভাবে উদ্ধৃত করেছেন তাতে এরূপই মনে হয়। কাহ্নপাদ ও কৃষ্ণাচার্য এক হলেও, কৃষ্ণাচার্য যে ক'জন ছিলেন বলা শক্ত। বহু গুরুকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নেওয়াও ছিল নিয়ম। তাই এ তর্কে না গিয়ে আমরা বরং তাঁদের চর্যাগুলিরই পরিচয় গ্রহণ করি, সেই সূত্রেই যতটুকু সম্ভব গ্রহণ করব পদকর্তাদেরও পরিচয়।

সাধারণ ভাব ও রূপ: সাধারণ ভাবে চর্যাগুলির ভাব ও বিষয় যে এক, তা আমরা জানি। কারণ, সবগুলিই সহজিয়া মতবাদ ও সাধন-পদ্ধতির কথা। সে মতবাদের বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। বৌদ্ধ ও শৈব তন্ত্রের থেকে আরম্ভ করে এই সাধনাই বৈষ্ণব সহজিয়া 'রাগাত্মিকাপদে'র মধ্য দিয়ে একালের আউল-বাউলদের দেহতত্ত্বের গানে এসে পৌঁচেছে। উত্তর ভারতের 'গোরখপন্থী', 'কবীরপন্থী' প্রভৃতি নানা মরমিয়া সাধক-মণ্ডলীকেও যে তা প্রভাবিত করেছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমরা দু-একটি চর্যা হাতে নিলেই দেখতে পাব—এঁদের সাধনতত্ত্ব যত দুর্বোধ্যই হোক এঁরা মানতেন না সনাতন ধর্ম, তার ষড়্-দর্শন (ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত, সাংখ্য), কিংবা জাতিভেদ; গুরু-পরম্পরায় এঁদের যোগ-পদ্ধতি উপদিষ্ট হত, তাই গুরুর উপর এঁদের পরম ভক্তি।

চর্যার সাধারণ রূপ

এক-আধটি চর্যা একবার দেখলেই বোঝা যায় তাদের রূপ: মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদগুলি লেখা; পয়ারের মত অন্ত্য অনুপ্রাস বা মিল আছে। দুই দুই চরণের এক একটি শ্লোক, আর চরণের মধ্যে আছে যতি। প্রত্যেকটি চর্যার উপরে 'রাগে'র উল্লেখ আছে, যেমন, 'রাগ পটমঞ্জরী', 'রাগ গবড়া', 'রাগ অরু', 'রাগ গুঞ্জরী', 'রাগ ভৈরবী' ইত্যাদি। এসব 'রাগ' যে সেকালে সত্যই কি রকম ছিল তা জানবার উপায় নেই, কিন্তু চর্যাগুলি যে তাল-মান-যুক্ত গীতি তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। পরবর্তী কালের বাঙালী রচয়িতারা এরূপ গীতি-কবিতাকেই বলতেন 'পদ'। বাঙালী প্রাণের সহজ প্রকাশ হয় পদে অর্থাৎ গীতি-কবিতায়, চর্যাপদ প্রথম থেকেই যেন তার সংকেত দিচ্ছে।

চর্যার একটি বৈশিষ্ট্য: খণ্ড-কবিতা অবশ্য সংস্কৃত ও অপভ্রংশেও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালের 'লিরিক' বা খণ্ড-কবিতার সঙ্গে তার মিল হচ্ছে রূপের মিল, ভাবের দিক থেকে এ মিল তত বড় নয়। কারণ, আধুনিক যুগের খণ্ড-কবিতা বিশেষ করে ব্যক্তিগত বেদনা অনুভূতিরই প্রকাশক।

কথাটা এই—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ যে সমাজে যখন দেখা দেয়, সেখানে ব্যক্তি যতই আপনার সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, সাহিত্যেও ততই ব্যক্তি-মানুষের ভাবনা-অনুভূতির কথা,- তাদের জীবন-যাত্রার ও চরিত্রের কথা একটু একটু করে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। তখন ক্রমে পদ্যে প্রাধান্য লাভ করে 'লিরিক' বা খণ্ড-কবিতা, গদ্যে প্রাধান্য লাভ করে চরিত্র-চিত্র অর্থাৎ উপন্যাস বা কথাসাহিত্য। 'চর্যাপদ' যখন রচিত হচ্ছিল তখন ভারতীয় সমাজে বা বাঙালী সমাজে সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগের ভাবই প্রবল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লা দেশে ও ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ আসতে থাকে ১৯শ শতকে। তাই ১৯শ শতকেই এ দেশের সাহিত্যে সত্যকারের আধুনিক 'লিরিক' ও আধুনিক কথা-সাহিত্যের জন্মলাভ সম্ভব হয়। কাজেই চর্যার মত প্রাচীন খণ্ড-কবিতায় আমরা দেখি বাঙালীর গীতি-প্রবণতা। প্রধানত দেখি—চর্যাগুলি একটা মণ্ডলীগত সাধনার ও ভাবধারার কথা, ব্যক্তির কথা নয়। চর্যা যারই রচনা হোক তার বিষয়বস্তু একই ধরণের। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সে রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ রচয়িতার এক-আধটুকু ছাপও প্রতিফলিত হয়েছে—ডঃ সুকুমার সেনের এ বিশ্লেষণ একেবারে মিথ্যা নয়। এরকমটা হয়েছে মোটের উপর খণ্ড-কবিতার স্বভাব-গুণে। তা ছাড়া ব্যক্তি-মানুষ কোনো যুগেই যে না ছিল তাও নয়, সে ছিল শুধু চাপা পড়ে। একটু করে ফাঁকে ফাঁকে তথাপি সেই ব্যক্তি-সত্তার খোঁজও পাওয়া যেত সেই প্রাচীন ও মধ্য যুগেরও শিল্পে কাব্যে। চর্যাতেও আমরা তা পাই কিছু কিছু। দু-একটি চর্যা উদ্ধৃত করলেই চর্যার সাধারণ ভাব ও রূপ স্পষ্ট হবে। আর তাদের বিশিষ্টতা কি ধরণের, কি ধরণের ব্যক্তিগত গুণাগুণের ছাপ গৌণ ভাবে হলেও কার রচনায় পড়েছে, তা সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে।

চর্যার জগৎ : লূইপাদের দুটি চর্যার মধ্যে একটির রূপ (চর্যা নং ২৯) :

রাগ—পটমঞ্জরী

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লূই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥ ধ্রু ॥ [উহ সন্তানা ?]
জাহের বাণচিহ্ন রূব ণ জানী
সো কইসে আগম বেএ' বখাণী ॥ ধ্রু ॥

কাহেরে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই ভাবই কীষ্
জা লই অচ্ছমতা হের উহ ণ দিস্ ॥ ধ্রু ॥

ডঃ সুকুমার সেনের অনুবাদ : ভাব হয় না, অভাব যায় না ;—এরূপ সংবোধ কে প্রত্যয় করে ? লুই বলে, বেটা, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য : ত্রিধাতুতে বিলাস করে, আকার ঠাহর হয় না। যাহার বর্ণ চিহ্ন জানা নাই তাহাকে কেমন করিয়া আগম বেদে ব্যাখ্যা করা যায় ? কাহাকে কি বলিয়া আমি পাতি দিব ? জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মত সে সত্য নয়, মিথ্যাও নয়। লুই বলে, আমি ভাবি কিসে ? যাহা লইয়া আছি তাহার আভাসও দেখি না যে।

যা নিগূঢ় সাধন-তত্ত্বের বিষয় তা দুর্বোধ্য। কিন্তু ভারতবাসীর নিকট তবু এইসব কথা একেবারে অদ্ভুত কিছু শুনায় না। অনেক শব্দ, অনেক উৎপ্রেক্ষা আমাদের সুপরিচিত হয়ে গিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি এ হচ্ছে যোগ-সাধনার কথা, পরতত্ত্বের ব্যাখ্যা। আর, সিদ্ধাচার্য লুইপাদ তা বলছেন সরল ভাষায়, আন্তরিকতার সঙ্গে ; ভাষার অস্পষ্টতা নেই, ভাবেও কোনো স্থূলতা নেই। একটি চরণে কাব্যরসও জমাট বাঁধা : 'জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মত সে (পরতত্ত্ব) সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়'—'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা'।

কুক্কুরীপাদের নামে যে দুটি পদ পাওয়া যায় তার সঙ্গে লুইপাদের পদের তুলনা করলে দেখা যায় কুক্কুরীপাদের ভাষা গ্রাম্য, ভাব ইতর, মনে হয় নারীর রচনা (সু. কু. সে.—'ইতিহাস'), সম্ভবত কুক্কুরীপাদের কোনো শিষ্যার। গুহ্য অর্থ যাই থাক, জীবন-চিত্র হিসাবে তবু এ কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করছি : (২নং)

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ ধ্রু ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ : অঙ্গন ঘরের কোণেই, হে বিত্তাবতী, শোন, অর্ধরাত্রে কানেট চোরে নিলে। শ্বশুর নিদ্রাগত, বউ জেগেই আছে; চোরে কানেট নিলে, কোথায় গিয়ে সে তা মাগবে? দিনের বেলায় বউ কাকের ডরেই চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু রাত্রি হলে চলে কামরূপে বিহারে।

শবরাচার্যের একটি (২৮ নং) চর্যাগীতি শবর-জীবনযাত্রার বর্ণনায় ও কাব্য-গুণের জন্য প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। নিশ্চয়ই চর্যাটির অন্য গূঢ় অর্থও ছিল, কিন্তু সেই ভাব-জগতের অপেক্ষা এই সাধারণবোধ্য বাস্তব রূপটিই কি কম আদরণীয়?

রাগ—বলাড্ডি

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলো মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম ণিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর সহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ : উচু উচু পর্বত, তথায় বাস করে শবরী-বালিকা; ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিতা সেই শবরী, গলায় তার গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিওনা—তোমার গোহারি, তোমার নিজ গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনে লাগিল তাহার ডাল, কর্ণ-কুণ্ডল-ধারিণী শবরী একা এই বনে ঢুঁড়িতেছে। ত্রৈধাতুক খাট পাতিল শবর, মহাসুখে শয্যা বিছাইল; ভুজঙ্গ (প্রেমিক ?) শবর, প্রেয়সী নৈরামণি, প্রেমে রাত

পোহাইল। হিয়াতাম্বুলে কপূর দিয়া মহাসুখে খাইল; শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহাইল। গুরুবাক্য-ছিলায় নিজ মন-বাণ দিয়া বিদ্ধ কর। এক শর-সন্ধানে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর পরম নির্বাণকে। গুরুরোষে শবর উন্মত্ত গিরিবর-শিখরের সন্ধিতে পশিলে শবর ফিরিবে কিসে?

এ অবশ্য সাধারণ বাঙালীর জীবন-চিত্র নয়, পাহাড়ীয়া শবর জাতিদের (সাঁওতাল? না, গাড়ো-খাসিয়ার?—শবরীপাদ পূর্ব বাঙ্‌লার লোক বলে অনুমিত হয়েছেন) জীবন-চিত্রের আধারে বজ্রযানের সাধন-মার্গের কথা।

উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে দু-একটি বৈশিষ্ট্যসূচক কথা উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ। বীণপাদের নামে যে চর্যাটি (১৭নং) আছে তাতে পাই সেকালের নাট্য ও নৃত্য গীতের উল্লেখ, যদিও সেখানে তা গৃহীত হয়েছে রূপক হিসাবে। কারণ, এ হচ্ছে "হেরুকবীণা", আর:

সুজ লাউ সসি লাগলী তান্তী
অনহা দাণ্ডি চাকি কি অত অবধুতী।

সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহতদাণ্ডি অবধুতী হইল চাকি।

আর, এ নৃত্য হচ্ছে 'বুদ্ধ নাটকের নৃত্য'। অন্তত জানতে পারছি—সেকালে বীণা কিরূপ হত, আর কি নাটক ছিল।

সরহপাদ প্রসিদ্ধ আচার্য। তাঁর চর্যাও তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক সুরের, অথচ সরল। একটি (চর্যা নং ৩৯) চরণে শুনি:—

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা।

বঙ্গে জায়া নিলি, পরে তোর বিজ্ঞান ভেঙ্গে গেল।

পূর্ববঙ্গে বিবাহ বোধহয় তখনো খুব প্রশস্ত ছিল না। ভুসুকুকেও বলা হয়েছে (চর্যা নং ৪৯), তিনি 'বাঙাল' হলেন,—সে কি চণ্ডালী বিয়ে করে? না, বাঙাল মেয়ে বিয়ে করে?

আরেকটি চর্যায় শবর-জীবনযাত্রার চিত্র আরও সুস্পষ্ট। উদ্ধৃতি ছেড়ে শুধু তার অনুবাদ দিচ্ছি: পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের গায়ে শবরদের বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে কার্পাস গাছের ফুল ফুটেছে। চীনা ধান পেকেছে. শবর শবরী উৎসবে মেতেছে। দিনের পর দিন শবরের আর কোনোও খেয়াল নেই, মহাসুখে ভুলে থাকে। ক্ষেতের চারপাশ বাঁশের চাঁচারি দিয়ে সে ঘিরেছে, তাতেই শকুন শেয়াল কাঁদছে।

বলা বাহুল্য, এসব সাধন-মার্গের কথা। তবে এসব কথার আড়ালে আমরা শবর-জীবনযাত্রার সংবাদও পাই। বুঝি, এ সাধনা তাদের মধ্যেও চলে।

কিন্তু ভুসুকুর সেই চর্যাটি (নং ৪৯) উল্লেখযোগ্য, পদ্মাতীরে নৌসৈন্য বা জলদস্যুর উল্লেখের জন্য : "রাজ-নৌকা পাড়ি দিয়ে রইল পদ্মার খালে। নির্দয়-ভাবে বাঙাল দেশ লুঠ করল।" যদিও এ নৌকা বজ্রনৌকা ; অনেক সময়েই কায়ানৌকা, মন তার দাঁড় (সরহের ভাষায়)। অবশ্য নদনদী আর তার জীবনযাত্রার কথা চর্যাপদে প্রায়ই পাওয়া যায়। বোঝা যাচ্ছে, এসব চর্যার রচনাকারীরা বাঙলাদেশের সঙ্গে, হয়ত বা পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গের সঙ্গে সুপরিচিত। ভুসুকুর অন্য দুটি চর্যায় মৃগয়ার রূপকে বলা হয়েছে সাধন-মার্গের কথা। অবশ্য, হরিণ-হরিণীর কথা চর্যার সমকালীন সাহিত্যে আরও পাওয়া যায়। তবু ভুসুকুর একটি চর্যা (চর্যা ৬) অনুবাদযোগ্য : কি নিয়ে আর কি ছেড়ে, আমি কি আছি ? চারিদিকে শিকারীর ডাক পড়েছে। হরিণ আপনার মাংসের জন্যই আপনার শত্রু, (শিকারী) ভুসুক তাকে এক মুহূর্তও ছাড়ে না। হরিণ (ভয়ে) তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না ; অথবা হরিণ-হরিণীর ঠিকানা জানা নেই। হরিণী বলে—হরিণ, তুমি কি শুনছ ? এ বন ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাও। তীরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

তা না করুক, কিন্তু এ যে শিকারী মানুষদের কথা, সেদিনের হরিণ-মাংস-প্রিয় বাঙালীদের কথা,—তা এখনো তারা বুঝতে পারে। তেমনি বুঝতে পারে কাহ্নপাদের চর্যা থেকে বাঙালীর জাল ফেলে মাছ ধরবার কথা, বাঙালীর মৎস্যপ্রিয়তাও করতে পারে অনুমান।

কিন্তু কাহ্নাচার্যের পদগুলি অন্য কারণেও উল্লেখযোগ্য। কাহ্নপাদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দোহাকারও। পঞ্চাশখানার উপর সংস্কৃতে লেখা বজ্রযানের উপর গ্রন্থ আছে কাহ্নপাদের নামে। চর্যাপদেও তাঁরই পদ পাওয়া যায় বেশি—মোট ১২টি। হয়তো শেষদিককার চর্যাকার তিনি, তাই। প্রায় কবিতাতেই অধ্যাত্ম-সত্য সুস্পষ্ট ও গভীর। তবু একটি চর্যা (চর্যা নং ১৮) প্রেমলীলার আধারের উপর রচিত। অবশ্য, সহজিয়া প্রেমলীলায় যে শাস্ত্রাভিমান ও শাস্ত্র-নির্দেশের কোনো পরোয়া নেই, তা বলাই বাহুল্য। সে প্রেমলীলায় ডোমনী চণ্ডালিনীরা শুধু গ্রাহ্য নয়, মনে হয় তন্ত্রের নিম্নজাতীয়া শক্তিদের মতো তারাই প্রশস্ত।

রাগ—গউড়া

তিনি ভূঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুখ লীড়ে ॥
কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলি।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ ॥
কেহে কেহো তেহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ ॥
কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।
ডোম্বি তআগলি নাহি চ্ছিনালী ॥

অনুবাদঃ তিন ভুবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হল। আমি মহাসুখ-লীলায় শুলাম ॥ ওলো ডোমনী, কি রকম তোর ছলা কলা? একপাশে কুলীন জন আর মধ্যস্থলে তোর কাপালিক। ওলো ডোমনী, তুই সকল নষ্ট করলি। কাজ নেই, কারণ নেই, শশধর টলালি। কেউ কেউ তোকে বিরূপ বলে; কিন্তু বিদ্বজ্জন তোর কণ্ঠ ছাড়ে না। কাহ্ন গায়—তুই কামচণ্ডালী, তোর বাড়া ছিনাল আর নেই।

এসব উদ্ধৃতি ও অনুবাদের সাহায্যে আমরা চর্যাকারদের তত্ত্বকথা না বুঝলেও তাদের ভাব-জগৎ কতকটা বুঝতে পারি। তারও অপেক্ষা আমরা বুঝতে যা সহজেই পারি তা হচ্ছে, অতি সামান্য ভাবে হলেও সেদিনের বাঙালী জীবনযাত্রার কথা এবং সিদ্ধাচার্যদের রীতিনীতি আচার বা ক্রিয়া-পদ্ধতির কথা,—উচ্চবর্গের শাস্ত্রে এসবের উল্লেখও থাকে না। কিন্তু চর্যাপদে আমরা দেখি—সরহ ও কাহ্নের মত সিদ্ধা ও পণ্ডিতেরা নিম্নবর্ণের ঘৃণিত ডোম-চণ্ডালের কাছ থেকে এই শাস্ত্র-বহির্ভূত "সহজ জ্ঞান" আহরণ করতেন। হাড়ি-পা'র মত কোনো কোনো সিদ্ধারা সত্যই হয়ত ছিলেন নিম্নবর্ণের,—তান্ত্রিক আচারে জাতবর্ণের কোনো গুরুত্ব নেই। এমন কি, বিবাহ ও যৌন-বন্ধনও একটু শিথিল,—সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগুলিতেও তার আভাস আছে। একথা কি মনে হয় না—শাস্ত্রকাররা যতই গুরুগম্ভীর শাস্ত্র-নিয়ম করুন, বাঙলার প্রাকৃত-জনের জীবন ও নীতিবোধ এরূপ সহজ বা স্বাভাবিক ও

শিথিল ধরণেরই ছিল, এবং বাঙ্‌লা সাহিত্য পণ্ডিতদের ঘরে জন্মায় নি, জন্মেছে লোক-গুরুদের হাতে লোক-জীবনের বুকে ?

কাব্যগুণ ঃ এ কথা বলাও বাহুল্য, সিদ্ধাচার্যরা কাব্যচর্চা করবার জন্য চর্যাপদ লেখেন নি ; কাজেই, কাব্যরস চর্যাপদে মুখ্যবস্তু নয়। অতএব, বিশুদ্ধ সাহিত্য যাঁরা চান, চর্যাপদ তাঁদের বিচারে শুষ্ক। কিন্তু বাস্তব জীবনের নানা চিত্রের ক্ষণিক উদ্ভাসে এবং মানুষের মনের ও প্রাণের আকস্মিক এক-আধটু আত্মপ্রকাশে এক-একটি চর্যায় মাঝে-মাঝে সত্যই রসসৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং কথার আশ্চর্য সংযম চর্যাগুলিকে একটি সংহত রূপ দান করেছে। বাঙালীর বাগ্‌বাহুল্য-ভরা কাব্যে পরবর্তী কালে এ গুণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে।

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ ঃ 'পদ' ও 'মঙ্গলকাব্য' ঃ চর্যাগীতি বাঙ্‌লা 'পদে'র বা পদাবলী সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের মোটের উপর ছিল দু'টি প্রধান কাব্যরূপ—'পদ' (বা খণ্ড কবিতা) যাকে বলা যায় 'লিরিক'; ও 'মঙ্গল' কাব্য (বা 'বিজয়' কাব্য) যাকে বলা যায় 'ন্যারেটিভ' বা আখ্যান-মূলক কবিতা। পদ-সাহিত্য হল গাইবার মতো গীতি-কবিতা, ভাব ও অনুভূতির কথা ; মঙ্গলকাব্য সুর করে শোনাবার বা গাইবার মতো কথাকবিতা। মনে রাখা প্রয়োজন—সেদিন সব কবিতাই সুর করে পড়া হত, এখনো হিন্দীতে তার চল রয়েছে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৫) পর থেকে বাঙ্‌লায় আর কবিতা সুর করে পড়া হয় না। প্রাচীন 'পদ' কিন্তু তালমান দিয়ে গীত হত। আর মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি আখ্যানও 'পাঁচালী'র মতো গান করা হত। পাঁচালী ছিল আখ্যান-বিবৃতির সাধারণ পদ্ধতি। 'পাঁচালী' গানে একজন থাকত প্রধান গায়েন, আর অন্তত একজন তার দোহার। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বাজনার ব্যবস্থাও থাকত। মাঝে মাঝে নৃত্যও থাকত। সেদিন অবশ্য নাটকও ছিল তা দেখেছি ;—কিন্তু সে নাটক ছিল গীত-প্রধান ও নৃত্য-প্রধান। নাট্যাভিনয়ে এইরকম গীত গান করে বা সুর করেই কথার আদানপ্রদান চলত প্রধানত একই কালে দুজনের মধ্যে ;—নাটকেও মোট তিনজনের বেশি অভিনয় করত না।

কিন্তু যা লক্ষণীয় তা এই যে, প্রথমাবধিই দেখি বাঙালী মনের ঝোঁক ছিল এই পদ-সাহিত্য বা গীতি-কবিতার দিকে। চর্যাপদ তারই প্রমাণ। প্রাচীন

বাঙ্‌লায় চর্যাপদ ছাড়াও হিন্দু, শৈব ও বৈষ্ণব পদও নিশ্চয়ই ছিল,—জয়দেব ও অন্যান্য সংস্কৃত বা অবহট্‌ঠ কাব্য-রচয়িতাদের রচনা থেকে তা অনুমান করা যায়। কিন্তু সেসব পদ আমরা পাই নি। তেমনি একথাও অনুমান করা চলে যে পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যের যা কথাবস্তু—যেমন ধর্ম-মঙ্গলের লাউসেনের কথা, চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতুর কথা, মনসা-মঙ্গলের লখিন্দর-বেহুলার কথা—এ সময়ে লোক-সমাজে নিশ্চয়ই পাঁচালী করে তা গাওয়া হত। এসব কথা ও আখ্যানবস্তু তখনো একেবারে পূর্ণাঙ্গ হয়ে না উঠলেও সাধারণ লোকের মধ্যে যে প্রচলিত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মঙ্গলকাব্যের সেই সব কথা ও কাহিনীই হল বাঙলা সাহিত্য বাঙালীর নিজস্ব বাঙ্‌লা বিষয়—হিন্দ্‌-আর্য সভ্যতা থেকে ধার করা বিষয় নয়। কিন্তু প্রাচীন যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে সেই বাঙ্‌লা বিষয়ের কোনো দৃষ্টান্ত আমরা পাই নি ; অত পুরাতন 'মঙ্গল কাব্য', 'বিজয় কাব্য' বা 'পাঁচালী' পাওয়া যায় না।

'ডাক', 'খনার বচন'ঃ 'চর্যাপদ' ছাড়া প্রাচীন যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোনো নিদর্শনই আর নেই। এ জন্যই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা মহৎ ঘটনা—তাতে একটা যুগ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ল। 'খনার বচন' ও কিছু কিছু 'প্রবাদ-প্রবচন' অবশ্য বিষয়বস্তু হিসাবে পুরাতন ; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মতই তাদেরও প্রাচীন নমুনা আমাদের হাতে বেশি নেই।

প্রবাদ, ছড়াঃ চর্যাপদে অন্তত ছয়টি প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যায়, যেমন, 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী' (ভুসুকু) ; 'বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্‌ঠু বলন্দে' (সরহ), 'দুহিল দুধু নাহি বেণ্টে সামাঅ'। ডাক্তার সুশীলকুমার দে 'বাঙ্‌লা প্রবাদে'র বিস্তৃত বিচারে পরবর্তী বাঙ্‌লা সাহিত্য থেকেও বহু প্রবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—"যেমন গানে, উপাখ্যানে, মঙ্গলকাব্যে, তেমনই প্রবাদের মধ্যেও বাঙালীর বাঙালীয়ানা নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ;...ইহার রসপ্রেরণা আসিয়াছে দেশের আলো জল বায়ু হইতে, জাতির জীবিত চেতনা হইতে। উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও এগুলি রসসম্পৃক্ত হইয়া উঠে" (বাঙ্‌লা প্রবাদ, ২য় সং)। এ সব প্রবাদকে তাই সাহিত্য না বললেও সাহিত্য-গোত্রীয় বলা চলে। অবশ্য প্রবাদের অপেক্ষাও ছড়া সাহিত্যের নিকটতর আত্মীয়। তারও প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই নি। অবশ্য বাঙ্‌লা ছড়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর ও সরস

বিচারের পরে বাঙ্‌লা ছড়াকে আর সাহিত্য-ক্ষেত্রে কারও অপাঙ্‌ক্তেয় করার সাধ্য নেই। ছড়ার জগৎ জগতের টুক্‌রো বা টুক্‌রোর জগৎ। প্রবাদের জগৎও তাই। তাতে করে বাঙালী মনের আর একটা বিশেষ দিকের পরিচয় আমরা পাই—চর্যাপদে যার চিহ্নও নেই: "যাহা অস্ফুট ও অতীন্দ্রিয় তাহা নহে, যাহা প্রাকৃত ও প্রত্যক্ষ, বাঙালীর সেই রস-জীবনই এগুলিতে (প্রবাদে) রূপান্তরিত হইয়াছে" (ডঃ দে—বাঙ্‌লা প্রবাদ)। চর্যাপদ একটা মণ্ডলীগত সাধন-রহস্যের গান। তাতে বস্তুবাদী, রসিকতাপ্রিয়, বাঙালীর পরিচয়, তার জীবনের বাস্তব চিত্র তাই আসবে কোথা থেকে? কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠাও যে বাঙালীর স্বভাববিরোধী নয় তা বাঙালীর লেখা সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ কবিতা থেকে, পরবর্তী মঙ্গলকাব্য থেকেও নানা ছড়া-প্রবাদ থেকে প্রমাণিত হয়। তবে এই বুদ্ধিবাদী, রসিকতাপ্রিয়, বাস্তব-নিষ্ঠ বাঙালী মনের পরিচয় পাব,—এমন প্রাচীন সাহিত্য টিকে নেই।

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের এত কম নিদর্শন যে আমরা পাচ্ছি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মনে রাখা উচিত—আধুনিক ইউরোপের অনেক ভাষারই এতদিনকার পুরাতন সাহিত্য-নিদর্শন নেই। তা ছাড়া বাঙ্‌লা ভাষা তখনো উচ্চবর্গের বাঙালীদের নিকট খুব আদরণীয় ভাষা হয়ে ওঠে নি। খাঁটি বাঙ্‌লা বিষয়বস্তু তাঁদের নিকট সম্ভবত তুচ্ছই ঠেকত। ক্রমে অবশ্য এই পণ্ডিত ও উচ্চবর্গের লোকেরা বাঙ্‌লায়ও সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হলেন। কিন্তু তার পূর্বে বাঙ্‌লা দেশের বুকের উপর দিয়ে তুর্ক-বিজয়ের প্লাবন বয়ে গিয়েছে—সেই হিন্দু উচ্চবর্গ তখন নিজেদের শাসক-মর্যাদা হারিয়ে নিজেরাই অনেকখানি শাসিতের পর্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এই অধিকার-লোপের পূর্বে বাঙ্‌লা ভাষা ছিল লোক-সাধারণের সাহিত্যের ভাষা,—সে সাহিত্য মুখে মুখে চলত, জনতার সাহিত্য হিসাবে।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগ : প্রাক্‌-চৈতন্য পর্ব

(খ্রীষ্টাব্দ ১২০০—খ্রীষ্টাব্দ ১৫০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্ক-বিজয়

তুর্ক-বিজয়ের স্বরূপ—খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দ শেষ হতে না হতেই বাঙলার ওপরে তুর্কী আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল। সম্ভবত তখন খ্রী: ১২০২ অব্দ।* দিল্লীতে তখন তুর্ক-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। মগধ জয় ও বিধ্বস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতে তুর্কদের বিলম্ব হল না। রাজা লক্ষ্মণ সেন অবশ্য পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন; বহু রাজপুরুষ ও বিদ্বজ্জনও তাঁর সহগামী হন। আরও অনেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকেও অনেকে চলে যান 'উদ্বাস্তু' হয়ে কামতা-কামরূপ অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে তাই প্রাচীন বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা কতকাংশে রক্ষা পেয়েছিল। এমন কি, নেপাল থেকে বাঙলার সেই ধারা হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে এবং চীনেও পৌঁছেছিল। পূর্ববঙ্গে নদীনালার পরিবেষ্টনে সেন, বর্মন প্রভৃতি ছোটবড় স্থানীয় রাজারাও আরও একশত বৎসর তুর্ক আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। সেখান থেকেও আরাকানের পথে উত্তর বর্মার সঙ্গে বাঙলার সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলত।

---

* মধ্যযুগ বলতে ভারতের ইতিহাসে সাধারণ ভাবে বোঝায় 'মুসলমান রাজত্বকাল' (খ্রী: ১২০৬ থেকে খ্রী: ১৭৬৫ পর্যন্ত; বা স্থূলভাবে খ্রী: ১২০০ থেকে খ্রী: ১৮০০)। মধ্যযুগ এক হিসাবে হর্ষবর্ধনের পরেই (খ্রী: ৬৪৭) আরম্ভ হয়। তখন থেকে খ্রী: ১১৯২ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের 'যুগসন্ধিকাল' বলাই উচিত। ইতিহাসের বিচারে বাঙলার মধ্যযুগও অনুরূপ, কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হিসাবে খ্রী: ১২০০ থেকে 'মধ্যযুগে'র সূচনা,—তার ভেতরে খ্রী: ১২০০ থেকে খ্রী: ১৩৫০ এই দুর্যোগের কালকে বলা চলে 'যুগসন্ধিকাল'।

একটা কথা: সচরাচর 'মধ্যযুগ' বলতেই 'সামন্ত সমাজে'র কাল বোঝায়। কিন্তু ভারতে সামন্ত যুগের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত কুশান রাজত্বে (খ্রী: ৩০০—খ্রী: ৫০০), তার প্রসার রাজপুত রাজাদের রাজত্বে (মোটের উপর খ্রী: ৭০০—খ্রী: ১২০০): এবং তুর্ক বিজয়ে (খ্রী: ১২০০) তা নবায়িত হয়। এর প্রথমার্ধ শেষ হলে (খ্রী: ১৫২৬), মোগল রাজত্বের শেষ দিকে খ্রী: ১৭০০ থেকে) সামন্তবাদী সমাজের ক্ষয় প্রকট হয়ে ওঠে। তবু তা চলে আরও একশত বৎসর (খ্রী: ১৮০০)। তারপরেও ব্রিটিশ শাসনে সামন্ততন্ত্র একেবারে শেষ হয় নি; একটা 'ঔপনিবেশিক' সমাজ-ব্যবস্থা চলতে থাকে। এখন (১৯৪৭-এর পরে) তা পরিবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু তুর্ক আক্রমণের ফলে বিহারে ও মধ্যপশ্চিম বাঙ্‌লায় চল্‌ল ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। তুর্করা নিজেরা ছিল দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর জাতি : ইস্‌লাম গ্রহণ করায় তাদের নৃশংসতা ও ধ্বংস-প্রবৃত্তি নতুন ধর্মোন্মাদনার বশে আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল। যা মুসলমান ধর্মে নেই তাই তাদের চক্ষে ছিল ভ্রান্ত। হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা, সংস্কৃতি সবই তাদের বিচারে ছিল 'কুফেরি'। কাজেই প্রথম দিকে যেখানেই তারা বিজয়ী হয়েছিল সেখানেই তারা রক্তে ও আগুনে প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তাই বিহার বিধ্বস্ত করার বিবরণ তাদের ঐতিহাসিকরাও সগর্বেই উল্লেখ করে গিয়েছেন। হয়তো তাতে অনেক অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু মোটের ওপর তুর্ক আক্রমণের তা'ই ছিল সাধারণ রূপ।

মধ্যযুগের ধর্ম-প্রাধান্য—দু'একটি কথা প্রসঙ্গত তবু মনে রাখা উচিত :—শুধু তুর্ক, বা সাধারণ ভাবে মুসলমান বিজেতারাই নয়, মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশের সকল বিজেতারাই একপ 'ধর্মোন্মাদ' ছিল। সেকালে ধর্মই ছিল জীবনযাত্রার প্রধানতম পরিচায়ক। ধর্মের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকত অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম ও তত্ত্ব,—সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির তো কথাই নেই। আর সামন্ত-যুগ পর্যন্ত রাজার ধর্মই ছিল প্রজাসাধারণের ধর্ম ;—সাধারণ মানুষের না ছিল ভূমিতে নিজস্ব অধিকার, না ছিল স্বতন্ত্র ধর্মাধিকার। মধ্যযুগের শেষেও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বিজয়ী স্পেনীয়রা পেরুতে মেক্‌সিকোতে, ওলন্দাজরা (বুয়র) আফ্রিকায় মধ্যযুগের মুসলমান বিজেতাদের চেয়ে কম নৃশংসতার বা কম বর্বরতার পরিচয় দেয় নি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বরং বিজয়ী মুসলমানরা সামরিক ও রাজনৈতিক জয়লাভই করেছে, সামাজিক ও ধর্মগত জয় সম্পূর্ণ করতে পারে নি। কিন্তু অন্যত্র দেখতে পাই—বিজয়ী মুসলমান যে দেশেই রাজত্ব করেছে সেখানকার অধিবাসীরাই অনতিবিলম্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ পাঁচশত বৎসর ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট্ ও রাজারা রাজত্ব করলেন ; তথাপি হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হওয়া তো দূরের কথা, ভারতভূমিতে শতকরা ত্রিশটি মানুষও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল না ;—ইতিহাসে এ একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য ও মুসলমান ধর্ম—এ ব্যতিক্রমের প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ প্রথমত জন-বহুল, দ্বিতীয়ত প্রায় একটা মহাদেশ। মধ্যযুগের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই শতসহস্র পল্লীকে প্রদক্ষিণ করতেই

দীর্ঘকাল লাগত ; তা ধ্বংস করা তো ছিল প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত, শুধু সহর বা রাজার পরাজয়ে ভারতের বিচ্ছিন্ন, স্ব-সম্পূর্ণ পল্লীসমাজ ও পল্লী-সভ্যতা সম্পূর্ণ পরাহত হত না। চতুর্থত, ভারতবর্ষ একটা সহন-পটু ও গ্রহণ-পটু বিচিত্র সভ্যতার দেশ। পরাজয় স্বীকার করেও ভারতবাসী তার 'বেতসী-বৃত্তি'র গুণে যেমন টিকে থাকত, তেমনি রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও আপন সভ্যতার ও সংস্কৃতির একটা প্রতিরোধ রচনা করতে সক্ষম হত। আর শেষ কথা, এসব কারণে বিধর্মী, বিজাতীয় বিজেতারা এ জাতিকে ধর্মান্তরিত করবার এবং এ-দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করবার আগেই এদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করল ; সেই সূত্রে তারা এ দেশবাসীর সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত হল ; এদেশেই বিবাহাদি করল, সামাজিক আদান-প্রদান চলল ক্রমে তারা এ দেশের মানুষ বনে গেল। বিজেতা ও বিজিত ক্রমেই পরস্পরের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকেও তাই স্বীকার করে নিল। প্রভেদ অবশ্য রইল, কিন্তু সংস্কৃতির বিরোধ আর তেমন উগ্র রইল না। সমন্বয় ঘটে নি, কিন্তু সংমিশ্রণ ঘটেছে নানা দিকে। বিভেদ বরাবর ছিল, কিন্তু বিরোধ কোথাও বরাবর ছিল না।

সংঘাত, প্রতিরোধ, সংযোগ—তুর্ক বিজয়ের এই সাধারণ হিসাব যেমন ভারতের ক্ষেত্রে তেমনি বাঙ্‌লার ক্ষেত্রেও যথাযথ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যেও আমরা এই সংঘাত, প্রতিরোধ ও সংযোগের সংকেত আবিষ্কার করতে পারি। কারণ, 'সাহিত্য' লিখব বলে তখন কেউ সাহিত্য রচনা করত না, তা রচনা করত সামাজিক কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের তাগিদে। আর একথাও আবার স্মরণীয়—তখন পর্যন্ত ধর্মই ছিল সমাজের প্রধানতম পরিচয়। ধর্মের সেই প্রধান গুরুত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করেও বোঝা দরকার যে, ধর্মের নানা কথা ও কাহিনীর আকারে ও আবরণে প্রকাশ লাভ করেছে সেদিনের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বেদনা-আনন্দ ; আর তারও অন্তর্নিহিত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, বর্গ-বৈষম্য, বর্গ-বিরোধ এবং বর্গে বর্গে আপোষ-রক্ষা।

রাজনৈতিক পটভূমি (খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৫০০)

তুর্কী-বিজয়ের প্রথম পর্বটা ছিল ধ্বংসের পর্ব। মোটামুটি খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০—এই দেড়শ বৎসরের বাঙ্‌লা দেশের কোনো সাংস্কৃতিক বা

সামাজিক চিত্র আমরা পাই না, সার্ধ শতাব্দী জোড়া এই নিস্তব্ধতাই তুর্ক-বিজয়ের ভয়াবহতার একটা প্রমাণ। বাঙ্‌লা দেশে এই খ্রীঃ ১২০০—খ্রীঃ ১৩৫০এর মধ্যে খিলজী, তুঘলুক (খ্রীঃ ১২২৭ থেকে খ্রীঃ ১২৮৭) ও বল্‌বনী শাসক বংশের (খ্রীঃ ১২৮৬ থেকে খ্রীঃ ১৩২৮) উত্থান-পতন ঘটল ;—তুর্ক রাজত্ব বল্‌বনী বংশের আমলে লক্ষ্মণাবতী (উত্তরবঙ্গ), সপ্তগ্রাম (মধ্যপশ্চিমবঙ্গ), সোনারগাঁও (মধ্যপূর্ববঙ্গ) ও চট্টগ্রামকে (পূর্ববঙ্গ) কেন্দ্র করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুফী ফকির দরবেশ ও গাজীরা তখন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে নববিজিত ভূমিতে ইস্‌লাম বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগল। লুণ্ঠন ও ধ্বংস অপেক্ষা ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক বিচারই হতে থাকে রাজ্যবিস্তারের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু তুর্ক অধিকার তখনো সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নয়, আর লক্ষ্মণাবতী সোনারগাঁ প্রভৃতি কেন্দ্রের তুর্ক শাসকদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, পরস্পর-পরস্পরে হানাহানি লেগেই থাকে। এ অবস্থার অবসান ঘটে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্-এর রাজ্যলাভে (খ্রীঃ ১৩৪২—খ্রীঃ ১৩৫৭)। তিনি বাঙ্‌লা দেশে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ধ্বংসের যুগ কেটে তখন আসতে থাকে স্বস্তির যুগ। নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায় দেশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইলিয়াস শাহী বংশও ক্রমে বিলাসে, আয়েসে ও আরামে ঝিমুতে থাকে। সম্ভবত তাতে হিন্দু সমাজ আপনাকে নূতন করে সংগঠন করবার সুযোগলাভ করে। এমন কি, একজন হিন্দু রাজাও (খ্রীঃ ১৪১৮) রাজ্যলাভ করলেন—মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁকে উল্লেখ করেছেন 'কন্‌স্‌' বলে। তা থেকে ঐতিহাসিকরা স্থির করেন এ নাম 'গণেশ' ; তিনিই 'দনুজমর্দনদেব'। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত এই যে, হয়ত আসলে 'কন্‌স্‌' শব্দটি হচ্ছে 'কোঁচ' ; সম্ভবত কোঁচ পাইকদের জোরেই এই কোঁচ-নেতা ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। বরেন্দ্রীয় কৈবর্ত অভ্যুদয়ের মতোই এও একটি উপজাতির অভ্যুদয়ের সংকেত। কবি কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গে হিন্দুরাজার অনুসন্ধান করতে হয় বলে, রাজা 'গণেশে'র কথা বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য হয়ে ওঠে। যাই হোক, এই রাজার পুত্র 'যদু' আবার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন নামে রাজত্ব করেন (আনুমানিক খ্রীঃ ১৪১৮—১৪৩১)। ভারতের প্রায় সর্বত্র শাসকবর্গের ধর্ম তখন ইস্‌লাম। তাই ক্ষমতাসম্পন্ন মুসলমান সামন্ত-বর্গকে এভাবে স্বপক্ষে না পেলে গণেশের বা যদুর পক্ষে রাজ্যরক্ষাও হয়তো সম্ভবপর হত

না। হিন্দুসমাজে যত্ন চাইলেও পুনঃপ্রবেশ করতে পারেন নি। সম্ভবত. জালালুদ্দীনের গোঁড়ামিও কম ছিল না—ধর্মত্যাগীদের তাও একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু এ হল বাঙালী মুসলমানের রাজত্ব। তাই বৃহস্পতি মিশ্রের মত কবি ও পণ্ডিতদের তিনি যথেষ্ট সমাদর করতেন। অবশ্য এ রাজবংশ বেশি দিন টেকে নি। আবার (খ্রীঃ ১৪৪২—১৪৮৭ পর্যন্ত) ইলিয়াস শাহী বংশই রাজত্ব করে। তারাও পুরুষানুক্রমে 'বাঙালীরই রাজা' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর পরে এল হাব্‌সী পাইকদের অরাজকতার কাল।* খ্রীঃ ১৪৮৭—১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে এদের জুয়াখেলা চলে। আর তা শেষ হয় ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ্‌-এর রাজ্যাধিকারে।

মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় হুসেন শাহ্‌ (খ্রীঃ ১৪৯৩—১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের (খ্রীঃ ১৫১৯—১৫৩২) তুলনা নেই। সম্ভবতঃ হুসেন শাহ্‌ ছিলেন আরব, মক্কার শরীফ্‌-বংশ-সম্ভূত। হিন্দুদের প্রতিও প্রথম দিকে তিনি হয়তো বিরূপই ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য তাঁর ও তাঁর পুত্রের প্রশংসায় মুখর। বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি তার পূর্বেই (আনুমানিক খ্রীঃ ১৩৫০—১৪৫০-এর মধ্যে) আপনাকে অনেকটা সংহত করে নিয়েছিল ; হুসেনশাহী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবার তাই বাঙ্‌লা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। তাই পরে আফ্‌ঘানী সুলতান (খ্রীঃ ১৫৫৩—১৫৭৫) বা মুঘল বাদশাহদের (খ্রীঃ ১৫৭৫—১৭৫৭) কালেও তার গতি অব্যাহত রইল।

যুগসন্ধিকাল ঃ কিন্তু খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০ কেন, খ্রীঃ ১৪৫০ অব্দ পর্যন্ত বাঙ্‌লার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়ে ছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার মত প্রেরণাই পায় নি। অন্তত বাঙ্‌লা ভাষায় যদি তখন কিছু লেখা হয়েও থাকে তার একটি ছত্রও আমাদের হাতে এসে পৌছয় নি। বাঙ্‌লা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা যা হয়েছে, তাও সামান্য। এই সন্ধিযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে তাই সাহিত্য-শূন্যতার ইতিহাস। এমন কি, তুর্ক ধ্বংসলীলার যে চিত্র আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যে পাই তাও অপ্রচুর ; এবং যা পাই তাও পরবর্তী কালের রচিত, স্মৃতি থেকে সংগৃহীত।

---

* হাব্‌সী পাইকরা 'দাস' ছিল। কিন্তু এদের এই বিদ্রোহকে রোমের ইতিহাসের 'দাস বিদ্রোহের' সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। তুলনা করতে হলে করতে হয় রোম-সাম্রাজ্যের প্রিটোরিয়ান গার্ডসদের রাজা-রাজ্য নিয়ে জুয়াখেলার সঙ্গে।

ধ্বংস-চিত্র ঃ তুর্কী আক্রমণের ধ্বংস-চিত্র হিসাবে বাঙ্‌লা ভাষায় একটি নমুনা প্রায়ই উল্লেখিত হয় ; সেটি 'শূন্যপুরাণে'র অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক একটি কবিতা-অংশ : সে অংশটুকু বেশ কৌতুককর। অনুমান করা হয়, এ হচ্ছে চতুর্দশ শতকে ওড়িষ্যার কোণারক নগর ধ্বংসের কথা! বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন,—দেবতারা এলেন মুসলমান-রূপে,—এই। হল সেই অংশের বক্তব্য।

বেদ করি উচ্চারণ বেরাায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার।

এইখান থেকে বর্ণনাটি উপভোগ্য :

অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হইল খোন্দ্‌কার।
হইয়া যবন রূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম।
নিরঞ্জন নিরাকার হইল ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলয়ে দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হইল মহামদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুনি।

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মেলি বাজায় বাজনা।
দেখিয়ে চণ্ডিকা দেবী তিহ হৈল হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল বিবি নুর।
যতেক দেবতাগণ করিল দারুণ পণ
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দোহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় পণ্ডিত রামাঞি গায়
এ বড় বিষম গণ্ডগোল।

'গণ্ডগোল'টা কিরূপ তা পরে ('শূন্যপুরাণে') উল্লেখিত হয়েছে—মূলত তা ফিরূজ শাহ্ তুঘ্লকের কোণারক ধ্বংসের কথা (ডাঃ সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস),—'শূন্যপুরাণ' কিন্তু অত পুরানো নয়, মাত্র ১৭ শতকের রচনা।

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দোহারা ভাঙ্গে গো-হাড়ের ঘায়
হাতে পুঁথি কর‍্যা যত দেয়াসী পালায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল দোহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।

'শূন্যপুরাণে'র অন্তর্গত ধর্মের গাজনের এই শেষ দিনকার কাহিনী 'ঘর-ভাঙ্গার পালা', একে বলে 'বড় জালালি'। এটা তুর্ক বিজয়ীদের ধ্বংসলীলারই কথা,—এ কথা প্রায় সর্ব-স্বীকৃত।

এরূপ চিত্রই মিথিলার কবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য়ও আমরা লাভ করি। বিদ্যাপতি অবশ্য মিথিলার মানুষ, তবে মিথিলা ও বাঙ্লায় তখন মনের দূরত্ব সামান্য;—কৃষ্ণলীলার বিদ্যাপতি তো বাঙ্লারও কবি বলে

পুজো পেয়েছেন। কিন্তু 'কীর্তিলতা' অবহট্‌ঠতে লেখা ; তার রচনাকাল খ্রীঃ ১৪০০—খ্রীঃ ১৪৫০ ; 'কীর্তিলতা'ও সত্যকারের কবির রচনা। তা থেকে আমরা জানি সেই ১৫ শতকেও, হিন্দুর পাশাপাশি দুই বা আড়াই শত বৎসর বাস করেও, হিন্দুর প্রতি তুর্করা কিরূপ অত্যাচারী ছিল—পথে যেতে যেতে হিন্দুকে তুর্ক বেগার ধরে ; ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে গোমাংস বহন করায় ; তার পৈতে ছিঁড়ে দেয়, তিলক মুছে ফেলে ; রোয়া ধানে মদ চোলাই করে সে খায়, মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ বানায় ; হাটে তোলা তুলে ফেরে ; নীচ বর্গের তুর্কও উচ্চ বর্গের হিন্দুকে যথেচ্ছ অপমান করে ; ইত্যাদি।

ধর্ম দিয়েই যে-কালে জাতিরও পরিচয় সেকালে রাজার ধর্ম ও প্রজার ধর্ম যদি এক না হয় তা হলে 'রাজার জাতি' যে 'প্রজার জাতি'র উপর নানা অজুহাতে অত্যাচার করবে, তা জানা কথা। তাই মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে —চৈতন্যদেবের জীবনীতে (বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'), বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে, এমন কি ১৬ শতাব্দীর শেষদিককার রচনা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পর্যন্ত,—মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীর এরকম নানা অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যই একটা ব্যাপক অর্থে হচ্ছে এই শাসক-ধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাসিত-সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য। আমরা পরে তার স্বরূপ বুঝব। কারণ, এই প্রতিরোধেরও তলায়-তলায় ও ভেতরে-ভেতরে আবার জড়িত হয়ে আছে সমাজের নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্গের সংঘর্ষ, তাদের বিরোধ ও পরস্পরের বোঝাপড়া ; আবার, অন্যদিকে লোক-সমাজে ও লোক-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের মিলন-মিশ্রণ।

'নিরঞ্জনের রুষ্মার' দেবতাদের রূপান্তরের কাহিনীটিও এই হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। 'শূন্যপুরাণে'র কবি বৌদ্ধ (?)। তাঁর কথা থেকে বুঝি, তুর্ক আক্রমণের কালে বৌদ্ধরা হিন্দুদের দ্বারা নিপীড়িত হত,—হিন্দুরাই যে তখন রাজার জাত। তাই বিজয়ী তুর্ক যখন হিন্দুর দেব-দেউল ভাঙছে তখন এই বৌদ্ধ লেখক মোটের ওপর তাতে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না, বরং ন্যায়েরই বিধান দেখছেন। এমন কি, তা বৌদ্ধ আদিদেবেরই নির্দেশানুযায়ী ঘটছে বলে লেখক আপনার ধর্মেরই জয় দেখছেন। অবশ্য সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আসলে নিরঞ্জনের রুষ্মার অর্থ তা নয়।

এ হচ্ছে বিজিত মানুষের সাধারণ অদৃষ্টবাদ। ইংরেজ আমলে ইংরেজ বিজেতাদেরও এভাবে দেবতাদের প্রতিরূপ কল্পনা করে স্তুতি করা হত। কিন্তু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের দ্বন্দ্ব যে তুর্ক আক্রমণের পূর্বক্ষণে তীব্র ছিল, তা একটা সামাজিক সত্য বলে স্বীকৃত। তার ছায়া কি এই পদ্যাংশে নেই ?

সামাজিক আবর্তন ও বিবর্তন

এই দুর্যোগের যুগটা সাহিত্যে অন্ধকারের যুগ, সমাজে আবর্তনের যুগ। এই আবর্তন অবশ্য শেষ হল প্রায় দেড়শ' বৎসরে; তার পরেকার দেড়শ' বৎসর ধরে চলল বাঙালী সমাজের বিবর্তন। কারণ, তুর্ক-বিজয়েও ভারতীয় পল্লীসমাজ ভগ্ন হল না, অব্যাহতই রইল। ভারতীয় বর্ণভেদও অক্ষুণ্ণ রইল, জন্মান্তর ও কর্মফলের আধ্যাত্মিক ধারণা বরং দৃঢ় হল। সামাজিক পরিবর্তনের এই মোট রূপটি মনে রাখলে আমরা দেখব মধ্যযুগের সাহিত্য সেই যুগের সামাজিক জীবন ও অধ্যাত্ম-চেতনারই বাহন।

তুর্ক আক্রমণের ফলে প্রধানত যে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল তা সংক্ষেপে এই :

(১) উচ্চ ও নিম্ন বর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হল।

(২) পরাজিত হিন্দু-সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল ; এবং

(৩) প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্যও ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর মুসলমান বিজেতারা বাঙালী হয়ে উঠলেন, আর বিদেশীয় রইলেন না।

বর্গ-সংযোগ ঃ তুর্ক-বিজয়ের কাল পর্যন্তও যারা ছিল শাসক, আজ তারা নেমে গেল শাসিতের পর্যায়ে। উল্লেখযোগ্য এই যে, শাসকরা এতদিন পর্যন্ত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের। তারা অনেকেই লৌকিকভাবে হিন্দু, কেউ লৌকিকভাবে বৌদ্ধ। কিন্তু আর্যেতর লৌকিক ধর্ম দেব-দেবী, নানা লৌকিক আখ্যান পরিবর্তিত হতে হতেও দেশের জন-সমাজে তখনো চলে আসছে। লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান এবং কৃষ্ণ ও শিবের নামে প্রচলিত বাঙলা দেশের নানা কাহিনীর মূল ছিল লোক-সমাজের এই সব ধর্ম ও কথায়। এতদিন এসব

দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী নিম্নবর্গের বিষয় বলে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞেয় ছিল; তাঁদের চক্ষে শ্রদ্ধেয় ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি। কিন্তু তুর্ক আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়েএসে গেল নিম্নবর্গের কাছাকাছি, তখন উপরতলার হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নিচের তলার মানুষদের এই মনসা, বনচণ্ডী, চাষীদেবতা শিব ও প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হল। অন্যদিকে নিচের তলার মানুষদের পক্ষেও তখন সুযোগ হল ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবার—অবশ্য নিজেদের মতো করে, নিজেদের শক্তি অনুযায়ী।

এই বর্গ-সংযোগেরই একটা পরোক্ষ ফল হল এই যে পশ্চিম বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম লোপ পেল। তখনো যারা বৌদ্ধ ছিল, তারা ক্রমে হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশে গেল। ১৬ শতকে নিত্যানন্দ অবশিষ্ট নেড়া-নেড়ীদেরও বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করে নিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধরা অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল, তাই তারা তখনো লোপ পায় নি। মুসলমান পীর ফকিরদের প্রচারে ও প্ররোচনায় এখানকার বৌদ্ধভাবাপন্ন সাধারণ লোক ইস্‌লাম গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বর্ধিত করল।

সাহিত্যিক ফল : উচ্চবর্গের ও নিম্নবর্গের এই সংযোগের ও সামাজিক আপোষ-রফার ফলে বাঙলা সাহিত্য দুইভাবে ঐশ্বর্য লাভ করল : একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলি (Matter of Bengal) 'মঙ্গলকাব্য'রূপে বিকাশ লাভ করল; অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির অমর আখ্যায়িকাও (Matter of Sanskrit) বাঙলায় অনূদিত ও রচিত হতে লাগল। বর্মা-আরাকানের প্রভাবে চট্টগ্রামে কিছু বৌদ্ধ থেকে গেল।

সমাজ-সংরক্ষণ : রাজশক্তি হারিয়ে হিন্দু সমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে আপনার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরল; তার সহায়তায় আপনার সমাজকে সংরক্ষণ করতে চাইল। এই ভাব গ্রহণ করলেন স্বভাবতই হিন্দু উচ্চবর্ণ, বিশেষ করে স্মার্ত পণ্ডিতেরা। তাঁরা হিন্দুর জাতিভেদ ও আচারধর্মের গণ্ডির মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরও সংকীর্ণ, আরও অনমনীয়, আরও রক্ষণশীল ও বর্জনশীল করে সংগঠিত করলেন। প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবধান তখন থেকে আরও দুস্তর হয়ে গেল; আচারে বিচারে কোনো উদারতা আর রইল না;—ম্লেচ্ছ-সংযোগ রাজা যত্নর মত যার যেভাবেই ঘটুক তাকেই

বর্জন করা হল নিয়ম। বলা বাহুল্য, এ পদ্ধতির সামাজিক প্রতিরোধ আসলে প্রগতিমূলক নয়, ছুদিন পরেই তা পরিণত হয় প্রতিক্রিয়ায়। অবশ্য এরূপ বজ্রবন্ধনে সমাজকে না বাঁধলে সেদিন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ইস্‌লামের প্লাবনে তলিয়ে যেত। কারণ, তখন বিপদ আসছিল ছুদিক থেকেই—একদিকে রাজধর্ম হিসাবে ইস্‌লামের অসীম প্রতিপত্তি, অন্যদিকে সূফী, পীর, ফকির, দরবেশদের প্রচারে ইস্‌লামের সহজ লোকপ্রিয়তা।

সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন : সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধেরও। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত চর্চা পুনরুজ্জীবিত করলেন—টোলে, চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাধ্যায়ন, দর্শন ও স্মৃতির অনুশীলন হতে লাগল। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তাই দেখি—নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের তীর্থক্ষেত্র; এমন কি মুসলমান সুলতানদের নিযুক্ত হিন্দু কর্মচারীরাও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যেমন, রায় রাজ্যধর, বৃহস্পতি মিশ্র, রামচন্দ্র খাঁ, দামোদর 'যশোরাজ খাঁ', কুলধর 'শুভরাজ খাঁ', মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ' প্রভৃতি। এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসেরই অন্য অঙ্গ ছিল বাঙ্‌লা ভাষায় ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পরিবেশন। শাস্ত্রের শিক্ষা দীক্ষা সদাচার ও দেবদ্বিজে ভক্তি সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত না হলে নিম্নবর্ণের হেয় আচার-নিয়মের মধ্যে উচ্চবর্ণেরাও তলিয়ে যেতেন।

বিজেতার স্বাজাত্য স্বীকার : শাসিত হিন্দুদের এই আত্মরক্ষার ও সামাজিক প্রতিরোধের প্রয়াসেই মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য পুনর্জন্ম লাভ করল, এ কথা সত্য। কিন্তু এই তিনশত বৎসরের শেষে দেখা গেল বিজয়ী মুসলমান শাসকবর্গের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছে। এক কথায় এই পরিবর্তনকে বলতে পারি—বিজেতার স্বাজাত্য স্বীকার।

প্রথমাবধিই তুর্ক বিজেতারা এদেশ থেকে পত্নী সংগ্রহ করছিলেন। কয়েক পুরুষ পরে তাঁদের সন্তান-সন্ততি প্রায় রক্তে ও জীবনযাত্রায় বারো আনা বাঙালী ও চার আনা তুর্ক হয়ে গেল। তারা একমাত্র দরবারে ফারসীর চর্চা করত, ধর্ম বিষয়ে আরবীর শরণ নিত। কিন্তু সাধারণ দশজনের সঙ্গে প্রথমে তারা আদান-প্রদান চালাতে অভ্যস্ত হল বাঙ্‌লায়; তারপরে শুনতে অভ্যস্ত হল বাঙালীর জীবনযাত্রার কাহিনী, বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কিংবা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা; আর ক্রমে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল রামায়ণ-মহাভারতের অমর কাহিনীর রসাস্বাদনে। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা ফারসীর

রসজ্ঞ ছিলেন,—মহাকবি হাফেজকে তাঁরা এদেশে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে বাঙ্‌লার বাঙালী সুলতান বনে যাচ্ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। হুসেন শাহের (১৪৯৩) আমলে পৌঁছে দেখি, যদিও হুসেন শাহ নিজে মক্কার আরব-সন্তান, তথাপি তিনি ও তাঁর পুত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ; এমন কি, তাঁদের সামন্ত সেনাপতি পরাগল খাঁ-ও সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত।

অবশ্য এই হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত জীবনযাত্রায় বাধা আসত দুই দলের থেকেই। ইরাণ-তুরাণ থেকে নানা ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা এসে এদেশে আপনাদের বাহুবলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেন, আর তাঁরা প্রায়ই প্রথম যুগের তুর্ক বিজেতাদের মতই ধর্মোন্মাদ হতেন। তা ছাড়া নানা পীর ফকির বাইরে থেকে এদেশে এসে গাজী হয়ে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিরোধকে জাঁইয়ে তুলতেন। অন্যদিকে হিন্দু সমাজও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে কিছুমাত্র শিথিলতা দেখায় নি। সর্ব রকমে মুসলমান ধর্ম ও আচারের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছে। তবে মুসলমান রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করতে তারা তত উদ্যোগী বা সাহসী হয় নি। তাই সে রাজশক্তি হিন্দুদের এই সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার চেষ্টায়ও বিশেষ বাধা দেয়নি।

যাই হোক, ষোড়শ শতক থেকে বলা যায় এক দেশে বসবাস করে, একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করে, একই ভাষা বলে, একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যোগদান করে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান তো নিশ্চয়ই, উচ্চবর্গের মুসলমান ও উচ্চবর্গের হিন্দুও বাঙালী বনে গিয়েছিল। বলতে গেলে 'বাঙালী'র একটা রাষ্ট্র জাতি বা নেশন হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা তখনি দেখা দিয়েছিল। তখন থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্য হচ্ছে অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর সমবেত সৃষ্টি, যদিও তার বনিয়াদ হিন্দু ভাষা, কথা ও ভাব।

সে তুলনায় সে সাহিত্যে তখনো (১৬শ শতক পর্যন্ত) মুসলমান বিষয়-বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি বা রচনা-শৈলীর ছাপ পড়ে নি। যাকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে বলা হয় আরব-পারস্যের বিষয় (Matter of Persia and Arabia), তা বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে অষ্টাদশ শতকে—মধ্যযুগের শেষ পর্বে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের ও চৈতন্য-যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য।

তার একটি দিক প্রগতির দিক—যেখানে সে লোক-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু আর একটা দিক প্রতিক্রিয়ার—যেখানে সে রক্ষণশীল, বিশেষ করে মুসলমান জীবন ও বিষয়ের প্রতি বিমুখ বা উদাসীন।

মধ্যযুগের পর্ব-বিভাগ ঃ মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের তাই যুগবিভাগ বা পর্ব-নির্দেশ করা যায় এইভাবে—

প্রথম পর্ব : যুগসন্ধিকাল, খ্রীঃ ১২০০—খ্রীঃ ১৩৫০ ;

দ্বিতীয় পর্ব : প্রাক্‌চৈতন্য যুগ, খ্রীঃ ১৩৫০—খ্রীঃ ১৫০০ ;

তৃতীয় পর্ব : চৈতন্যযুগ, খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০ ;

চতুর্থ পর্ব : নবাবী আমল, খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক্‌-চৈতন্য বাঙ্‌লা সাহিত্য

লোক-সাহিত্যের বাহন ঃ শুধু সন্ধিকাল (খ্রীঃ ১২০২—খ্রীঃ ১৩৫০) নয়, তারপরে আরও প্রায় একশ' বৎসর কালের (খ্রীঃ ১৪৫০ পর্যন্ত) বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও কোনো নিদর্শন আমাদের মেলে নি। অবশ্য, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে আমরা জানি যে, চৈতন্যদেবের জন্মের সময় রাত জেগে লোকে মনসার গান শুনত, চণ্ডী বাশুলীর গান গাইত, শিবের গান গেয়ে ভিক্ষে করত। যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীতও তখন লুপ্ত হয় নি। আর কৃষ্ণলীলার গান যে তখনো জনপ্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই আড়াই শ' বছর এই সব কথা আর গান লোকের মুখে মুখে বিকাশ লাভ করছিল। তা ছাড়া, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীও কিছু কিছু তখন রচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই সাহিত্য প্রধানত ছিল লোক-সাহিত্য ; তার প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী।

বিষয়বস্তু হিসাবে পাঁচালী কখনো হত লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক,—তার নাম হত 'মঙ্গলকাব্য' বা 'বিজয়-কাব্য' ; কখনো সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকাও পাঁচালীতে রচিত হত ; যেমন, রামায়ণ-মহাভারতের

কথা। কখনো বা সাধারণ নায়ক-নায়িকার কথাও গ্রথিত হত 'পাঁচালী'তে। 'পাঁচালী' ছিল এক ধরণের গান ও আবৃত্তির নাম—কখনো তা মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর সহযোগে গীত হত। একজন মাত্র 'গায়েন' কখনো গাইত, কখনো দ্রুত আবৃত্তি করত, মাঝে-মাঝে নাচতও; অন্যেরা দোহার হিসেবে হত তার সহযোগী। অবশ্য নৃত্য-গীত-সম্বলিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলাও অভিনীত হত—তার নাম ছিল নাট্য-গীত। স্বয়ং চৈতন্যদেবও যে 'রুক্মিণীহরণ' নামের এমনি এক নাট্যে রুক্মিণীর ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন, ত আমরা জানি।

প্রাক্-চৈতন্য বাঙ্‌লা সাহিত্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (খ্রীঃ ১৪৮৬—খ্রীঃ ১৫৩৩) আকস্মিক নয়। তার পূর্বেই বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি পুনর্গঠিত হতে আরম্ভ করেছে, এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যেও নূতন সূচনা দেখা দিয়েছে,—পদ ও পাঁচালীতে, মঙ্গল-কাব্য ও পৌরাণিক অনুবাদে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের এই বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তা সঠিক নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, এবং বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এক সময়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ হত কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে। মাঝখানে 'বৌদ্ধযুগ' ও 'শূন্যপুরাণ' থেকে সে ইতিহাস কল্পনা করা হত। কিন্তু দেখা গেল 'বৌদ্ধযুগ' কথাটা অর্থহীন; আর যা 'শূন্যপুরাণ' বলে কথিত হয় আসলে তা সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের রচনা মাত্র। তারপর 'চর্যাপদ' আবিষ্কারে লাভ করা গেল বাঙ্‌লার প্রথম গ্রন্থ। ঠিক সেই সময়েই (বাঙ্‌লা ১৩২৩, ইংরেজি ১৯১৬তে) আর একখানা প্রাচীন পুঁথি স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়; তিনিই এই পুঁথিখানার নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কারণ, এ পুঁথির নাম ও লিপিকাল পাওয়া যায় নি, প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা খণ্ডিত, মাঝেও দু এক পৃষ্ঠা নেই। পুঁথিখানা পাওয়া গিয়েছিল বাঁকুড়ার এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে।

পুঁথিতে ভণিতা পাওয়া যায় প্রধানত বাশুলীভক্ত বড়ু চণ্ডীদাসের। তাই বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কেই তখন থেকে ধরা হয় বাঙ্লার দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ স্থির করেছিলেন—এ গ্রন্থ হয়তো চতুর্দশ শতকেরই রচনা। সম্প্রতি এ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নিয়ে আবার উল্টো সন্দেহ উঠেছে। তার ফলে কেউ-কেউ কৃত্তিবাসকেই এখন ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান দিচ্ছেন, এবং বড়ু চণ্ডীদাসের এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে পিছিয়ে দিচ্ছেন চৈতন্য-জন্মেরও পরে। কিন্তু আমরা জানি, চৈতন্যদেব নীলাচলে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদন করতেন; তাই চণ্ডীদাসের পদ তাঁর পূর্বেই দেশে সুপ্রচলিত হয়েছে, মানতে হবে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদগুলি ভাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তী হবার সম্ভাবনা। তার ভাষাও যথেষ্ট প্রাচীন, তার লিপির ছাঁদও বেশ পুরনো। সম্ভবত সত্যই এ সব পদ রচিত হয়ে থাকবে খ্রীঃ ১৪৫০ থেকে খ্রীঃ ১৫০০-এর মধ্যে। অন্তত ভাষার দিক থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাঙ্লার দ্বিতীয় গ্রন্থ; কালের দিক থেকেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে গ্রহণ করলে অযৌক্তিক হবে না। আর পুঁথি হিসেবে বাঙ্লা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর আছে কিনা সন্দেহ।

চণ্ডীদাস-সমস্যা : মধ্যযুগের বাঙালীর প্রাণ যে কাব্য-মার্গে আপনাকে উৎসারিত করে দিয়েছে তা হল বৈষ্ণব পদাবলী। সেই পদাবলীর পদকারদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাচীনতম ও প্রধানতম বলে পূজিত। এঁদের মধ্যে নানা কারণেই বলা যেতে পারে চণ্ডীদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর নামে প্রায় বারো শ' পদ প্রচলিত; আর সে সব পদের মধ্যে কয়েকটি পদ আছে, যা বাঙালী চিত্তের পরম প্রকাশ, বিশ্ব-সাহিত্যেও পাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু এমন অনেক পদও আছে যা নিতান্তই মামুলী; কোনো শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীর অযোগ্য। তা ছাড়া, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কোনো কোনো পদের ভণিতায় অন্য পদকর্তারও নাম পাওয়া যায়। আর চণ্ডীদাসেরও ভণিতা পাওয়া যায় 'আদি চণ্ডীদাস', 'কবি চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস' প্রভৃতি নানা নামে। স্পষ্টই সন্দেহ হয়—একাধিক পদকর্তা চণ্ডীদাস নামে আপনাকে পরিচিত করে গিয়েছেন। এই হল 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারে এই প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কারণ এ কবির ভণিতা আরও নতুন; তিনি বাশুলী-ভক্ত 'বড়ু চণ্ডীদাস'। আর, বৈষ্ণব পদাবলীর বারো শ' পদের মধ্যে মাত্র দুটি,

বা ঐরূপ আরও দু'একটি পদ আছে যার মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কোনো রূপে খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদ-সমূহের সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ-সমূহের সম্পর্কের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ সনাতন গোস্বামীর একটি সংস্কৃত টীকা থেকে আমরা জানি যে—চণ্ডীদাস 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন; আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ড' দু'টি প্রধান 'খণ্ড' বা অধ্যায়। তাই স্বভাবতই মনে হয়, চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ-সংগীতে পরম আনন্দ-লাভ করতেন, আর সনাতন গোস্বামী যে চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন, আসলে তিনি আর কেউ নন, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু চণ্ডীদাস, আর সম্ভবত তিনিই আদি চণ্ডীদাস। তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী; অন্তত চৈতন্যদেবের সময়ে জয়দেব-বিদ্যাপতির মতো তাঁর রচিত পদও দেশে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে, কৃষ্ণভক্তদের নিকটে সমাদরও লাভ করেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদসমূহ তেমন অধ্যাত্মরাগরঞ্জিত নয়, বিদ্যাপতি বা জয়দেবের পদও তা নয়। তথাপি তা যে এত সমাদর লাভ করল তার কারণ সম্ভবত এই যে, 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি খণ্ডের এসব পদ যখন গীত হত, কিংবা নৃত্যসহযোগে অভিনীতও হত,—তখন সেদিনের মানুষ তাতে মেতে উঠত;—মেতে ওঠবার মতো রস-সম্পদ তখনো পল্লীসভ্যতায় মানুষ বাঙালীর আর বেশি ছিল না।

এ প্রসঙ্গেই তাই 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র আলোচনাও শেষ করা যেতে পারে। পণ্ডিতেরা অবশ্য কোনো মীমাংসায় একমত নন, আর তথ্যের অভাবে একমত হওয়া সম্ভবও নয়। তথাপি বলা যেতে পারে—অন্তত দু'জন বা তিনজন পদকর্তা চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বড়ু চণ্ডীদাস, তিনিই সম্ভবত 'আদি চণ্ডীদাস'; তিনি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি, বাশুলীর (শক্তির এক রূপ) ভক্ত, বৈষ্ণব নন। দ্বিতীয় জন দ্বিজ চণ্ডীদাস;—তিনি চৈতন্যের হয় সমসাময়িক, না হয় অল্প পরবর্তী। পদাবলীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদই তাঁর রচনা। তৃতীয় জন 'দীন চণ্ডীদাস'—যিনি খ্রীঃ ১৭৫০-এর দিককার লেখক। তাঁর পদসংখ্যাই বেশি, আর তাতে কাব্যগুণের প্রায় নামগন্ধও নেই। ততদিনে (খ্রীঃ ১৭৫০-এ) বৈষ্ণব পদাবলীর একটা ছাঁচ সুলভ হয়ে গিয়েছে। সেই ছাঁচে ঢেলে এই লেখকও তৈরী করেছেন পদের পর পদ।

অবশ্য এঁদের কারও নামে নিশ্চিত করে চালাবার উপায় নেই,

চণ্ডীদাসের ভণিতায় এমন কিছু কিছু পদ তবুও থেকে যায়। সে সব পদের মধ্যে আছে কিছু মামুলী বৈষ্ণব পদ, তার কয়েকটি ভালো। আর আছে চণ্ডীদাস ভণিতায় কিছু সহজিয়া রাগাত্মিকা পদাবলী,—কয়েকটি তার অপূর্ব। যেমন, বহুবিশ্রুত সেই পদটি :

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই॥

এ জাতীয় পদ কার রচনা, তা বলবার উপায় নেই। 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস', এদের কারও না হবারই সম্ভাবনা। 'তরুণী-রমণ চণ্ডীদাস' প্রভৃতি কোনো কোনো সহজিয়া সাধক কবিদেরই হবে।

চণ্ডীদাসের কথা : 'চণ্ডীদাস' পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও কবিশ্রেষ্ঠ বলে পদকর্তাদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। আর তাই তিনি নানা কাহিনীর বিষয়ও হয়ে পড়েন। যে সব কাহিনী তাঁর নামে প্রচলিত তা সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবার উপায় নেই। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর চণ্ডীদাসের গ্রাম, এই হল প্রসিদ্ধি। কিন্তু বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনাও এখন এ গৌরব দাবী করে। যুক্তি সে পক্ষেও আছে। চণ্ডীদাস যদি একাধিক হন, তা হলে একাধিক গ্রামও হবে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। দ্বিতীয় এক প্রসিদ্ধি এই—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি গঙ্গাতীরে পরস্পর মিলিত হয়েছিলেন। সত্য হলে এ বিদ্যাপতি আসলে মিথিলার বিদ্যাপতি নন, বাঙালী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, আর এ চণ্ডীদাসও তাহলে 'দীন চণ্ডীদাস'। চণ্ডীদাসের নামে তৃতীয় কাহিনী এই যে, নান্নুরে তাঁর পদ-গান শুনে গৌড়ের নবাবের বেগম আত্মহারা হন। নবাব তাই ক্ষুব্ধ হলেন। তারপরে আরও দুইরূপ কাহিনীও প্রচলিত রয়েছে :—এক হল, একদা কবি যখন স্বগৃহে পদগানে মত্ত, তখন নবাব তাঁর গৃহ আক্রমণ করলেন, কবির গৃহ ভগ্ন ও ভস্মীভূত হল, কবিও তাতেই নিহত হলেন। অন্য মতে, ক্রুদ্ধ নবাব কবিকে বন্দী করে আনলেন, হস্তিপৃষ্ঠে বেঁধে তাঁকে কশাঘাতে কশাঘাতে নিহত করলেন। যাই হোক, এ হল মামুলী হিন্দু ভক্তের মাহাত্ম্য-কাহিনী। কিন্তু আরও একটি কাহিনী আছে :—কবির প্রেম ছিল এক রজকিনীর সঙ্গে, তার নাম রামী বা তারা বা রামতারা। আর এ প্রেম হচ্ছে সহজিয়া প্রেম, 'নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'। সমাজের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে আপনার মহিমায় তা আপনি

প্রতিষ্ঠিত। রামীর নামেও আছে তেমনি সহজিয়া পদ, আর চণ্ডীদাসের নামেও আছে রামীর ধ্যান, পিরীতের জয়গান। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে সহজিয়াদের সৃষ্টি। চণ্ডীদাস যখন সমস্ত বাঙালী সমাজের সম্পত্তি হয়ে উঠেছেন, তখন সহজিয়ারাই বা কেন তাঁর ওপরে দাবী ছেড়ে দেবেন? চণ্ডীদাস আর বিশেষ মানুষ নেই, তিনি সমস্ত বাঙালী সমাজের প্রিয়তম-আত্মীয়, প্রেমমাধুর্যময় পদাবলীর মুখপাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যবস্তু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেরটি খণ্ড আছে, এক একটি খণ্ডের এক একটি বিষয়বস্তু। যেমন 'জন্মখণ্ড', 'তাম্বূলখণ্ড', 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' ইত্যাদি। 'ভাগবতে', 'হরিবংশে', 'বিষ্ণুপুরাণে', 'মহাভারতে' আমরা শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলার কথা পাই, তা থেকে এ গ্রন্থে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্মকথা ও গোকুলে আগমন এবং কালীয়দমন, এই দুটি বিষয় গৃহীত হয়েছে। অবশ্য বৃন্দাবন-লীলাও মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধেই রয়েছে। সেই গোপবধূ-প্রণয়ীর লীলা-কাহিনী দ্বাদশ শতকে কী বিশেষ রূপ লাভ করছিল, তা জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে' আমরা দেখতে পাই। মিথিলায় বিদ্যাপতি ও বাঙলায় চণ্ডীদাস যখন পঞ্চদশ শতকে সে বিষয়ে পদ রচনা করছেন, তখন বুঝতে পারি সমস্ত পূর্ব-ভারতেই তখন 'কানু বিনা গীত নাই' একথা সত্য হতে চলেছে। কিন্তু 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের যে বিশেষ কাহিনীগুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' স্থান লাভ করেছে, তা ভাগবতে পুরাণে নেই, তা হচ্ছে বাঙলা দেশের নিজস্ব সৃষ্টি। বিশেষ করে তা বাঙালী প্রাকৃত-জীবনের দান। আর এ সব কাহিনী এখনো যে স্তরে রয়েছে তাতে বুঝতে পারি চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মরাগের স্পর্শ না লাগাতে তার রূপ ছিল কী। এ কাহিনী তখনো পর্যন্ত ছিল স্থূল প্রণয়-লীলার কাহিনী।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র এক একটি খণ্ডে যে ভাবে এক একটি আখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনে হয় যেন তা পাঁচালী কাব্যের এক একটি পালা; এবং সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেন একটি মঙ্গলকাব্য বা বিজয় কাব্য। ধূর্ত প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে কিশোরী অনভিজ্ঞা গোপবধূ রাধার প্রথমে দেহ, পরে মনও বিজয় করে নিচ্ছেন; 'তাম্বূলখণ্ডে' আইহন-পত্নী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-নিবেদন সদর্পে প্রত্যাখ্যান করেন। 'দানখণ্ডে' মহাদানী বেশে নিরুপায় রাধাকে প্রায় বলপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রথম জয় করলেন। তথাপি

'নৌকাখণ্ডে' দেখি রাধা আপনার মান-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট। কিন্তু 'ছত্রখণ্ডে' পৌঁছতে পৌঁছতে বুঝি এ প্রণয়-খেলায় সেই অনভিজ্ঞা গোপবধূ নিজেও এবার ধরা দিয়েছেন। তখন আরম্ভ হল নব নব লীলা দু' জনে— 'বৃন্দাবন খণ্ড', 'বস্ত্রহরণ ও হারখণ্ড', এবং 'বংশীখণ্ডে' :—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর রে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাই লোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে কোন্ জনা।
দাসী হয়্যাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥…
আবার ঝরএ বড়ায়ি নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি মো হাচায়িলোঁ পরানী ॥ ২ ॥…
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥ (পৃঃ ২৯৪)

বুঝতে পারি, এসেছে এখন প্রণয়-পরিতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণের দূরাপসরণের পালা; আজ এই প্রণয়-ব্যাকুলা, বিরহ-বিধুরা নারীর বুক-ফাটা ক্রন্দনের দিন :

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
কাহ্নু বিণা সবখন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
অহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জা-এ ফুটিআঁ ॥ (পৃঃ ৩৯২)

সমস্ত কাহিনীটি এই বুক-ফাটা ক্রন্দনের মধ্যে এসে যখন ঠেকল তখন বুঝতে পারি কবির কাব্য-লক্ষ্মীর চক্ষুদুটিও আর্দ্র হয়ে উঠেছে। এই ব্যাকুলতা, বিরহ-পালার এই আকুলি-বিকুলি পরবর্তী বাঙ্‌লা পদাবলীতে প্রেমোন্মাদ চৈতন্যের দিব্যোন্মাদনার স্মৃতিতে অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই বিচ্ছেদের বেদনার, এই বিরহের গানের উৎস শুধু নর-নারীর এই ব্যর্থ প্রণয়ের কথাটুকু নয়, শুধু মানব-আত্মার সেই মহাবিরহের বেদনাও নয়—এর উৎসস্থল পরাজিত, যুগ-যুগ-নির্জিত বাঙালী সমাজের জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা। তাই বিরহের কাব্যে বাঙালী কবি অনবদ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূল কাব্যাংশও তাতে সজল-বিধুর। এ কাহিনী যখন গাওয়া হত তখন শ্রোতারা নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। আর এ কাহিনী যে গাওয়া হত তাতেও সন্দেহ মাত্র নেই। কারণ, প্রত্যেকটি পদের প্রারম্ভেই কবি তার রাগ ও তাল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রত্যেকটি খণ্ড আবার গ্রথিত হয়েছে সংলাপ-সূত্রে ; প্রধানত শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ির পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তরেই এক-একটি কাহিনী উদ্‌ঘাটিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে মনে হয় এ শুধু পাঁচালী করে না গেয়ে 'নাট-গীত' হিসাবে নৃত্য ও অভিনয়ের সঙ্গে গাওয়া চলত। তাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'ঝুমুর' জাতীয় লৌকিক 'নাট-গীতে'র প্রাচীনতম নিদর্শন বলেও কেউ কেউ নির্দেশ করেছেন।

উত্তর-প্রত্যুত্তর রচনায় চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব আছে। অন্তত চতুর প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের যুদ্ধে শ্রীরাধাকে পরাস্ত করতে পারেন নি। রাধা মুখরা, কিন্তু বাক্য-কুশলা। এ কাব্যের কবিত্ব সামান্য নয়,—চণ্ডীদাস যে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত দেড়শত সংস্কৃত শ্লোক থেকে সুস্পষ্ট। তথাপি সত্য কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আবেগ উচ্ছ্বাস অধিক নয়, কাব্যোচিত অলঙ্কার-প্রিয়তা নেই, রুচি ও ভাবের দিক থেকে তো অনেক পদ স্থূল ও গ্রাম্য। সুখশ্রাব্য যদি বা সেদিনে হয়ে থাকে, এখন সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের আসল কৃতিত্ব 'পদকার' হিসাবে নয়, চরিত্রকার ও কাহিনীকার হিসাবে। যেভাবে একটু-একটু করে তিনি অনভিজ্ঞা মুখরা বালিকা রাধাকে একটির পর একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গঠিত বিকশিত করে তুলে শেষ পর্যন্ত অন্তরের প্রেম-পরিপুষ্টা প্রেম-মথিতা নারীরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করেছেন, সে যুগের পক্ষে তা একটা অপ্রত্যাশিত সৃষ্টি-কৌশল। বড়ু চণ্ডীদাসের বড়ায়ি অবশ্য কুট্টনী ধরণের ধরা-বাঁধা মামুলী চরিত্র (টাইপ্)। কিন্তু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক সে ধূর্ত এক গ্রাম্য-লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়। চৈতন্যদেবের পরে আর কৃষ্ণ-চরিত্র এভাবে অঙ্কন সম্ভব নয়—সহস্র কপটতার মধ্যেও তিনি পরম

প্রেমিক, মধুর-লীলা-বিলাসী শ্যামরায়। আসলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অন্যতম প্রধান সার্থকতা এই যে, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বড়ু চণ্ডীদাসের গান নয়। কি রাধা, কি কৃষ্ণ, কেউ এখানে আধ্যাত্মিক বিগ্রহ মাত্র নন; একটু স্থুল হলেও তাঁরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক নয়, বরং সেদিনের প্রাকৃত জীবনে যে শত শত লম্পটের প্রণয়-জাল-বিস্তার ও প্রণয়-বিলাস কবি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, আর যেমন দেখে থাকবেন বহু বহু সবলা গ্রাম্যবধূর প্রণয়-প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা, অতি সহজ ভাবে বড়ু চণ্ডীদাস তাই চিত্রিত করেছেন। আর তাতে এ কাব্য দেবলীলার কাব্য না হয়ে মানবলীলার কাব্য হয়ে উঠেছে। হোক্ তা গ্রাম্যতাদুষ্ট, কিন্তু গ্রাম্যতাদুষ্ট মানুষও মানবতা-বর্জিত সূক্ষ্ম ভাবের ফানুস অপেক্ষা সাহিত্যে—এবং জীবনে—বেশি আদরণীয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ঃ মালাধর বসু 'গুণরাজখাঁ'র 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলার প্রথম কাব্য। এ গ্রন্থের অন্য নাম 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দ-মঙ্গল'। অর্থাৎ আসলে এটিও 'মঙ্গল' বা 'বিজয়' জাতীয় 'পাঁচালী' বা আখ্যান-কাব্য। ভাগবতকে পয়ার ছন্দে বেঁধে এ পাঁচালী তিনি রচনা করেছেন। অর্থাৎ এ কাব্য বাঙলার পৌরাণিক প্রচার-প্রয়াসের বা 'অনুবাদ-শাখার'ও একটি প্রাচীনতম নিদর্শন।

মালাধর বসুর নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য তাঁর শ্লোকও আবৃত্তি করেছেন, তা আমরা জানি। কবির পরিচয় তাঁর কাব্য মধ্যেও রয়েছে। খ্রীঃ ১৪৭৩-এ পরিণত বার্ধক্যে তিনি ভাগবতকে পয়ার ছন্দে বেঁধে পাঁচালী রচনা করতে আরম্ভ করেন। "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান"। ১৪৭৩-এ গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকন্ উদ্দীন বারবাক্ শাহ (১৪৫৯-১৪৭৩)। বাঙলার সুলতানেরা তখন হিন্দু শাসকগোষ্ঠীকে আপনাদের রাজ্যশাসনে সহযোগী করে নিচ্ছেন। মালাধর বসুও দরবারী মানুষ, জাতিতে তিনি কায়স্থ, বর্ধমানের কুলীনগ্রাম-নিবাসী। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখলেন লোক-নিস্তারের জন্য—গৌড়েশ্বরের কৃপালাভ ঘটলেও হিন্দু উচ্চবর্গ ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, এ প্রয়াস তারও প্রমাণ। বাঙলার সুলতানরা তাঁদের অনুগত হিন্দুর এই সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার প্রয়াসকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন না তাও বোঝা যায়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুসরণে লেখা পাঁচালী গান বলেই রাগ-

রাগিণীর উল্লেখ আছে। 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ডে'র মতো যা ভাগবতে বা পুরাণে নেই তারও অনেক কিছু এ পুঁথিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের অন্যান্য লীলার চেয়ে ব্রজ-লীলা বা রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী তিনিও বেশি বিশদ করেছেন। কাব্যকলা অবশ্য এ গ্রন্থে বেশি নেই। মোটামুটি সরল ভাষায় কাহিনীটি বলাই ছিল কবির লক্ষ্য। তখনকার শ্রোতারাও তাই মনে করত যথেষ্ট।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ বা 'শ্রীরাম-পাঁচালী' ছিল এক সময়ে বাঙলার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। প্রথম না হোক, কৃত্তিবাস চৈতন্য-পূর্ব যুগেরই কবি, তাঁর শ্রীরাম বাঙালী, বাঙলা সাহিত্যের এক প্রধান সম্পদ।

যে কালের কবিরা ভণিতায় পর্যন্ত আপনার নাম সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতেন না, সেকালে কৃত্তিবাস আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কিছুই বাদ দিয়ে যান নি। বুঝতে পারি ব্যক্তিত্ববান্ কবিপ্রকৃতি আপনার সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, শুধু পিতৃঋণ ও কুলগরিমা কীর্তন করেই ক্ষান্ত হতে পারছে না। কৃত্তিবাসের এ আত্মপরিচয় নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য; তা থেকে তাঁর পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির পরিচয় অবিসংবাদিতরূপে জানা যায়। গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে (নদীয়া জেলায়) মুখুটি বংশে তাঁর জন্ম। সেদিনটি আদিত্যবার পঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য?) মাঘ মাস:—কাল সঠিক স্থির করতে পারলে হয় তা হবে খ্রীঃ ১৩৯৮, নয় খ্রীঃ ১৪০৩। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে কৃত্তিবাস জন্মেন। বড় গঙ্গা (পদ্মা) পার হয়ে তিনি উত্তরে বরেন্দ্রভূমিতে গেলেন বিদ্যালাভের জন্য; পাঠ সাঙ্গ হলে গেলেন গৌড়েশ্বরের কাছে। সে বিবরণ থেকে অনুমান হয় এ গৌড়েশ্বর কোনো হিন্দু রাজা। রাজা তখন দরবারে বসে। ক্রমে দরবার ভাঙল। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাসের তখন ডাক পড়ল রাজার সকাশে। অনেক দেউড়ি পার হয়ে গিয়ে কবি দেখলেন, রাজা রাজ-পরিষদে বসে মাঘ মাসের রোদ পোহাচ্ছেন। তাঁর ডাইনে পাত্র জগদানন্দ, পার্শ্বে ব্রাহ্মণ সনন্দ; বামে কেদার খাঁ, ডাইনে নারায়ণ; সুন্দর ও শ্রীবৎস ধর্মাধিকরণী; রাজার পণ্ডিত মুকুন্দ; ইত্যাদি। কৃত্তিবাস সাতশ্লোকে রাজ-সম্ভাষণ করলেন। গৌড়েশ্বর আনন্দিত হয়ে তাঁকে পাটের পাছড়া উপহার দিলেন। কেদার খাঁ তাঁর মাথায় চন্দনজল ছিটিয়ে

দিল। কবি যা চাইবেন রাজা তদনুরূপই পুরস্কার দেবেন। কিন্তু, কবি জানালেন

> কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
> যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

'গৌরব মাত্র সার'—বাঙালী সাহিত্যিকের এই তো ঐতিহ্য। বাঙ্‌লার প্রথম এই কবি যেন পরবর্তী বাঙালী সাহিত্যিকের জন্য তাঁদের প্রেরণার প্রধান উৎসটি এই তিনটি শব্দেই নির্দেশ করে দিয়ে গিয়েছেন। আজ 'কাঞ্চন-মূল্যের' দিনেও কথাটা মনে রাখার মত। অন্তত মিথ্যা হয়নি কবির নিজের আশা:

> প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে,
> অপূর্ব জ্ঞানে লোকে ধায় আমা দেখিবারে॥
> চন্দন ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
> সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
> মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
> পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥

মনে পড়ে না কি রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উৎসবের কথা? শুধু গৌড়েশ্বর নয়, গৌড়জনও জানে কবির সম্মান। তাইতো কেঁদুলাতে জয়দেবের মেলা পৃথিবীর প্রাচীনতম মেলা—জনতার কবিপূজা, জয়ন্তী উৎসব।

কবি কৃত্তিবাস তারপরে লিখলেন রামায়ণ—হয়তো রাজার নির্দেশে, আর স্বভাবতই বাল্মীকির কৃপায়। এ রাজা কে, তা জানলে কৃত্তিবাসের কাল সুনিশ্চিত হয়। সম্ভবত 'গণেশ' (খ্রীঃ ১৪০৯-১৪১৪) বা দনুজমর্দন-দেবই এই 'গৌড়েশ্বর'। তাহলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল খ্রীঃ ১৪০০ এর পূর্বে। কিন্তু খ্রীঃ ১৪৭৫-এর পূর্বে কৃত্তিবাসকে পিছিয়ে দিতে কেউ বেশি ভরসা পান না। তাই কৃত্তিবাসের কাল নিয়ে তর্ক রয়েছে। আরও বেশী তর্ক থাকবে তাঁর রচনা কোন্‌টি, কোনটি নয়, তা নিয়ে। যা নিয়ে তর্ক নেই তা এই যে, তিনিই বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। এই কাব্যকে অনুবাদ না বলে 'রচনা' বলাই শ্রেয়ঃ। সে রামায়ণ পূর্বাপর জনপ্রিয় ছিল—অন্তত পশ্চিমবঙ্গে। সর্বশ্রেণীর বাঙালী আর কোনো গ্রন্থকে এমন আপনার করে নেয়নি—যেমন নিয়েছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে। তার ফলে যুগের

পর যুগ গায়েনের মুখে মুখে কৃত্তিবাসের পাঁচালী কীর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া লিপিকাররাও নকল করার সময় যা কৃত্তিবাসে ছিল না অন্য কবির এমন অনেক লেখা এই রামায়ণে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এক কথায় লোক-জীবনের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের এমন একটা স্বচ্ছন্দ বন্ধন গড়ে উঠেছে যে, এক অর্থে এ রামায়ণকে সত্যই লোককাব্য বলা চলে। বাঙালী সাধারণ মানুষের জীবন এ রামায়ণ অনেকাংশে গঠন করেছে। আর সাধারণ জীবনের সম্পর্কে এসে এ রামায়ণেরও পূর্বাপর অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। সবচেয়ে কৌতূহলজনক কৃত্তিবাসী রামায়ণের শেষ ভাঙাগড়া। বাঙ্‌লা মুদ্রণ যখন সম্ভবপর হল তখন শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা খ্রীঃ ১৮০২-১৮০৩-এ সে অঞ্চলের প্রধান লোকপ্রিয় গ্রন্থ হিসাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমস্ত বাঙ্‌লায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তখন থেকেই লোকে মনে করলে, বাল্মীকি যেমন সংস্কৃতের 'আদিকবি' কৃত্তিবাসও তেমনি বাঙলার 'আদিকবি'। বিশেষ করে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার খ্রীঃ ১৮৩০-৩৪-এর সংস্করণে কৃত্তিবাসের পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে একেবারে নূতন করে দিলেন,—লোকে তা পরম আনন্দে পাঠ করতে লাগল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলতে এই তর্কালঙ্কারী ভাষাই এখন বাজারে চলছে। কৃত্তিবাসের মূলোদ্ধার এখন দুঃসাধ্য। যেসব জনপ্রিয় আখ্যান কৃত্তিবাসের বলে চলিত, তার অনেকগুলি কৃত্তিবাসের নয়, যেমন কবিচন্দ্র-এর (?) রচিত 'অঙ্গদ রায়বার' ও এমনি আরো কোনো কোনো উপাখ্যান। তাই কী কৃত্তিবাসের রচনা, কী তাঁর রচনা নয়—তা নিয়ে তর্ক চলবে চিরদিন।

কৃত্তিবাস 'কীর্তিবাস তুমি'—উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল তাঁর অপূর্ব সনেটে এই বলে কবিকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। সত্য সত্যই যথেষ্ট কাব্য-শক্তি কৃত্তিবাসের ছিল। প্রাঞ্জল পরিচ্ছন্ন রূপে তিনি রামায়ণের কাহিনী পরিবেশন করতে পেরেছেন,—বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে তা যুগ যুগ ধরে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু তিনি বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নি। পরবর্তী রামায়ণকার বা মহাভারতের বাঙালী লেখকেরাও কেউই মূলকে যথার্থ অনুবাদ করবার চেষ্টা করেন নি,—তাঁরা মূল রামায়ণ-মহাভারতের অনুসরণে লিখেছেন বাঙ্‌লা রামায়ণ ও মহাভারত ; ইচ্ছামতো সংযোগ করেছেন তাতে বাঙ্‌লার লোকজীবনের কথা ও কাহিনী ; ইচ্ছামতো বর্জন করেছেন মূলের

কোনো কোনো উপাখ্যান। কৃত্তিবাসও রচনা করেছেন বাঙালীর মন নিয়ে বাঙালীর মতো করে তাঁর বাঙলা রামায়ণ। 'শ্রীরাম-পাঁচালী' মহাকাব্য নয়—বাল্মীকির মহাকাব্যের সেই সংযত, গম্ভীর করুণা পাঁচালীর গ্রাম্য গানে, বাঙলা পয়ারের ছন্দে পরিণত হয়েছে বাঙালীর ভাবাপ্লুত ভক্তিরসে। রূপেও এ রামায়ণ ভারতীয় মহাকাব্য নয়, রসেও তা ভারতীয় কাব্য নয়,—রূপে-রসে এ বাঙালীর কাব্য। তার চরিত্রাদর্শে ও চরিত্র-চিত্রণেও তাই আর সেই মহাকাব্যের ভাস্কর্য-বলিষ্ঠতা নেই, আছে বাঙালী পটুয়ার নিপুণ স্বচ্ছন্দ রেখার মাধুর্য। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কিংবা রাবণ, মন্দোদরী, বিভীষণ—বাল্মীকির এসব প্রত্যেকটি চরিত্র মহাকাব্যিক আদর্শে পরিকল্পিত। সেই বিরাট পরিকল্পনাকে ভাঙবার উপায় নেই; কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে এই মহান্ চরিত্রগুলোই আবার পরিণত হয়েছে বাঙালীর ঘরোয়া আদর্শের চরিত্রে—রাম বীর হলেও বাঙালী বীর: স্নেহে, মমতায়, কোমলতায় সজল। তিনি বাঙালী ঘরের আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী। তেমনি সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৈকেয়ী থেকে মন্থরা, শূর্পনখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ বাঙালী আদর্শের প্রলেপে পুনর্গঠিত। আর ভক্ত প্রধান হনুমান কমী, জীবন্ত চরিত্র। কৃত্তিবাসের সময়ে সম্ভবত রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার রূপে ভক্ত-সমাজের ভক্তি-আরাধনার বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন, রামায়ণও ভক্তিকাব্য হতে আরম্ভ করেছে। তথাপি তখনো গার্হস্থ্য ও সামাজিক আদর্শের চিত্র রূপেই রামায়ণ রচিত হয়ে থাকবে। পরবর্তী কালে যখন চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্লাবনে বাঙলা দেশ ভেসে গেল, তখন এই গার্হস্থ্য চেতনা অপেক্ষা ভক্তির আবেগই হয়ে উঠল রামায়ণের এবং মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের মুখ্যভাব। তাই, এখনকার কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আমরা এই ভক্তিরসের সুরটিকেই প্রধান সুররূপে দেখতে পাই—অবশ্য রামায়ণের এই কাহিনীতে তেমন ব্যাকুল উচ্ছ্বাসবহুল হয়ে উঠতে পারে নি সেই ভক্তিরস। কিন্তু সত্য কথা বললে, তাতে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র মতো অনাবিলতা ও কবিত্বও নেই। তুলসীদাস অবশ্য একশতাব্দী পরেকার কবি।

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কাব্য

রাধাকৃষ্ণ কাহিনী বা রামায়ণ কাহিনী দুই-ই মূলত 'সংস্কৃতের বস্তু'। 'বাঙলার জিনিস' নিয়ে সে যুগে যা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে আমরা পাই মনসামঙ্গলের কয়েকখানা প্রাচীন পুঁথি। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের প্রথম

দিককার কবিদের নাম পাওয়া গেলেও তাঁদের কারও পুঁথি পাওয়া যায় নি, কালও স্থির করা যায় নি। ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। মনসামঙ্গলেরও প্রথম দিককার যেসব রচয়িতাদের আমরা চৈতন্যপ্রভাব-মুক্ত বলে চৈতন্য-পূর্বাকালের বা তাঁর সমকালের বলে গ্রহণ করছি, তাঁদের পুঁথি ও পুঁথির ভাষা তত পুরানো নয়। তথাপি আমরা এ-কথা জানি, বিষহরির পুজো সে যুগে সুপ্রচলিত ছিল। কাজেই, মনসামঙ্গলের এই অপেক্ষাকৃত পুরনো কাব্যগুলির মধ্যে চৈতন্যপূর্ব যুগের বাঙ্‌লার কাহিনী ও ভাব, হয়তো বা কতকটা রচনাও, যে টিকে রয়েছে, তা অনুমান করা যেতে পারে।

মনসামঙ্গলও পাঁচালী পালা। এর কবিও আছেন শতাধিক, মুদ্রিতও হয়েছে অনেক পুঁথি। গান করে রাতের পর রাত তা গাওয়া হত। এখন (১৯৪৭-এর পরে) তা আর পূর্ব বাঙ্‌লায় ও উত্তর বাঙ্‌লায় গাওয়া হয় কি না জানি না; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ-ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানপ্রধান ঐসব অঞ্চলের মুসলমানরাই ছিল শ্রোতা হিসাবে অধিক উৎসাহী—'গায়েন'রাও অনেক ক্ষেত্রেই ছিলেন মুসলমান। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই ঝোপঝাড়, বনবাদাড়ের দেশের সাধারণ মানুষকে জীবিকার ধান্দায় রাত-বেরাতে ঘুরতে হয়; তারা সাপের দেবীকে অবজ্ঞা করবে কি করে? বেদ-পুরাণ, কোরাণ-হাদিস তো সর্পাঘাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে না। আর তাছাড়া, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী শোনবার আগ্রহও তাদের কম নয়;—বহু-বহু পুরুষ ধরে এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই যে বাঙ্‌লার এই কথাবস্তু তাদেরই গানে গানে গড়ে উঠেছে।

বেহুলার ভাসান: মনসা অবশ্য অনেক পুরনো দেবী,—পদ্মা, বিষহরি প্রভৃতি তাঁর আরও নাম আছে। নাগপূজা বহু আদিম ও সভ্য জাতির মধ্যেই সুপ্রচলিত ছিল; মোহেন-জো-দড়োতেও তার চিহ্ন রয়েছে। 'মনসা' নামটি বেদেও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্‌লা মনসামঙ্গলের প্রাণবস্তু বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। চম্পকনগরের রাজা চাঁদ বেনে, তিনি মনসার পুজো না দিলে পৃথিবীতে মনসার পুজো প্রচলিত হবে না। কিন্তু চাঁদ শিবের ভক্ত; 'কানি চ্যাং মুড়ি'কে পুজো দেবেন কেন? মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে ছলে-বলে-কৌশলে চাঁদ বেনের সর্বনাশ করলেন; তাঁর 'মহাজ্ঞান' নামে শক্তি

অপহরণ করলেন ; তাঁর ছয় ছেলে একে একে নিহত হল। চাঁদের ঘর ভরে গেল রাণী সনকা ও বিধবা পুত্রবধূদের কান্নায়। চাঁদ তখন বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। অমনি তাঁর 'সপ্তডিঙা মধুকর' ডুবিয়ে দিলেন মনসা। তারপর বিদেশে রাজরোষে ফেলে চাঁদের লাঞ্ছনার একশেষ করলেন। কিন্তু চাঁদ বেনে ভাঙেন না। ইন্দ্রের শাপে তখন মনসার পুজো প্রচলনের জন্য চম্পকনগরে চাঁদের ঘরে জন্ম নিলেন অনিরুদ্ধ ; আর উজানীতে জন্ম নিলেন চাঁদ বেনেদের পাল্‌টা ঘরে তাঁর স্ত্রী উষা। সে ছেলের নাম হল লখিন্দর, আর সে মেয়ের নাম হল বেহুলা। বাল্য ছাড়িয়ে তাদের কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সনকা এবার ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু জানতেন বিয়ের রাত্রেই মনসার কোপে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু লেখা আছে। তেমন বউ কে যে স্বামীর এ মৃত্যু খণ্ডাতে পারে? অনেক খুঁজে অনেক পরীক্ষা করে পাওয়া গেল বেহুলাকে। আর এদিকে চাঁদ লৌহ-মন্দির নির্মাণ করলেন পুত্রের বিবাহরাত্রের বাসরশয্যার জন্য, হাতে হিন্তালের লাঠি নিয়ে নিজে পাহারা দিতে লাগলেন সেই মন্দির। কিন্তু জানবেন কি করে যে মনসার ভয়ে স্থপতি বিশ্বকর্মা সেই মন্দিরের গায়ে এক তিল পরিমাণ ছিদ্র রেখে দিয়েছিলেন? সেই অদৃশ্য ছিদ্রপথে সূত্রের মতো ঢুকল কালনাগ, আর বিবাহ-রাত্রেই দংশন করল লখিন্দরকে। বেহুলাও পরাজয় মানবেন না, স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় নিয়ে তিনি চললেন ভেসে,—যমপুরে যাবেন, লখিন্দরের জীবন ভিক্ষা করে উদ্ধার করবেন। ভেলা চলল, কত দেশ-বিদেশ দিয়ে :—ভূগোলের দেশ আর উপকথার দেশে একাকার। জীবে মানুষে মিলে কত ছলনা আর কত বিভীষিকা উৎপাদন করছে সতী বেহুলার চারিদিকে। ত্রিবেণীর ঘাটে এসে লাগল ভেলা। বেহুলাকে উপায় নির্দেশ করবার জন্য সেখানে তখন এল নেতা ধোবানী—মনসার সে অনুচরী। বেহুলা দেখলেন—আশ্চর্য কাণ্ড! সকালে এসে নেতা ছেলেকে মারে, কাপড় কাচে, আবার সন্ধ্যায় সেই ছেলেকে জীইয়ে তুলে মা আর ছেলে ফিরে যায় বাড়ীতে। বেহুলা বুঝলেন—এখানেই তো আছে মৃতের সঞ্জীবনী। নেতাকে তখন ধরলেন বেহুলা। নেতাও তাঁকে নিয়ে চলল স্বর্গে। কিন্তু প্রাণ কি সহজে ফিরে পাওয়া যায়? বেহুলা নাচে গানে দেবতাদের তুষ্ট করে উদ্ধার করলেন লখিন্দরের প্রাণ, চাঁদের অন্য ছয় পুত্রেরও প্রাণ ; কিন্তু চাঁদ বেনেকে দিয়ে মনসার পুজো দেওয়াবেন, এই হল এই প্রাণপণের শর্ত। বেহুলা-

লখিন্দর তখন ফিরে এলেন উজানীতে। অন্য ছয় পুত্রও বেঁচে উঠেছে, সব ফিরিয়ে দিচ্ছেন মনসা। কিন্তু চাঁদ বেনে কি তাই বলে পূজো দেবেন 'কানি চ্যাং মুড়ি'কে? বেহুলার লক্ষ্মী বউ, তাঁর মুখ চেয়েই শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন চাঁদ বেনে মনসার পূজো দিতে—চাঁদ বাম হস্তে মনসার পূজো, দিলেন, মনসার পূজো পৃথিবীতে প্রচলিত হল।

এই উপাখ্যানের চারদিকে অসম্ভবের রাজ্য :—বণিকের রাজ্য, সমুদ্র-যাত্রা, বেহুলার গুণের পরীক্ষা, লৌহমন্দির নির্মাণ, বেহুলার নদীপথে যমপুরে যাত্রা—এ সবে লোককল্পনা ও পরিকল্পনা পক্ষবিস্তার করে উড্ডীন হতে পারে, এমন কি অসম্ভবের আতিশয্যে শূন্যে আপনাকে হারিয়েও ফেলে। তবুও এ কাহিনীর পাদপীঠটি একটি স্থির পৃথিবীর জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। উজানী নগরের বণিকবধূ সনকার সোনার সংসারেও আসে সর্বনাশ,—এ ভাগ্য-বিপর্যয় বুঝি সেদিনের সমাজে ছিল সুপরিচিত ঘটনা। চাঁদ ও বেহুলার মত ভাগ্য-তাড়িত মানুষেরও বুঝি সে যুগে অভাব ছিল না। দেবতার রোষ, অদৃষ্টের বিধান, ও জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল বলে এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবার শিক্ষা সাধারণ ভাবেই তাই আসত। কিন্তু এ কাহিনীতে তা এল যে দুটি চরিত্র অবলম্বন করে তার একটি গরিমামণ্ডিত, অন্যটি মাধুর্যের প্রতীক। ট্রাজেডির নায়কের চরিত্রের মতো দৃঢ়তা আর মহিমা আছে এই চাঁদ বেনের চরিত্রে। আর ট্র্যাজিক নায়িকার মতোই সাহস ও সহজাত সৌন্দর্য আছে বেহুলার চরিত্রে। তাদের পাশে অন্যেরা ম্লান হয়ে যায়। এ কাহিনীকে মনসার বিজয়ও ততটা বলা যায় না, এখানে আসলে বিজয় বেহুলারই। কারণ, ক্রুর আক্রোশময়ী মনসা দেবী সে দিনের অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির মতো শেষ প ন্ত যথেচ্ছ শক্তির দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন; ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় তিনি উদ্রেক করতে পারেন না। অবশ্য, মনসাও দেবতার সমাজে বড় নির্যাতিতা, স্বর্গের উচ্চবর্গের চক্ষে অপাঙ্‌ক্তেয়া। আপনার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তাঁকে আদায় করতে হয় অক্লান্ত সংগ্রাম করে, অন্য পথ নেই। অনেক সংগ্রাম-সংঘর্ষের ফলে তবেই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের অধিকারহীন সাধারণ মানুষ স্বীকৃতি আদায় করে কায়েমি স্বার্থের ও কায়েমি হিন্দু চিন্তার অধিকারী উচ্চবর্গের কাছ থেকে। তাদের দেবতাও না হলে থাকেন উচ্চবর্গের পূজিত দেবসমাজে অস্বীকৃত। আর এই স্বীকৃতি যেখানে সমাজে উচ্চ-নীচের

আপোষ-রক্ষার ফলে ঘটে, সেখানে উচ্চবর্গের কবিদের পরিকল্পনায় উচ্চবর্গের ভাগ্যতাড়িত পুরুষই হয়ে ওঠেন চাঁদের মত মহৎ গুণগ্রামের আধার।

মনসামঙ্গলের প্রথম কবি: কাণা হরিদত্ত মনসার গীত প্রথম রচনা করেন বলে কথিত হয়। বিজয়গুপ্তের "পদ্মপুরাণে" বা মনসামঙ্গলেও তাঁর নামের উল্লেখ আছে। আর তাতে বলা হয়েছে "হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে"। যা লোপ পায় নি, তার মধ্যে প্রথম মনসামঙ্গলের লেখক বিপ্রদাস পিপলাই ও বিজয়গুপ্ত।

বিজয়গুপ্ত: বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'ই এতদিন প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে গৃহীত হত। কিন্তু এখন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জন্মেছে। কারণ সমগ্র পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় নি। খণ্ড খণ্ড ভাবে বিজয়গুপ্তের রচনা পাওয়া গিয়েছে—নানা পুঁথিতে; নানা লোকের রচনা মিশে গিয়েছে গায়েনদের মুখে। যাই হোক, বিজয়গুপ্ত আত্মপরিচয় রেখে গিয়েছেন। তিনি ফুল্লশ্রী গ্রামের সনাতন গুপ্তের পুত্র। ফুল্লশ্রী বরিশাল জেলার বৈদ্যপ্রধান গৈলা গ্রামের কাছে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই মনসামঙ্গল গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যের বহু-স্বীকৃত বস্তু। বহুরূপে নবায়িত, কিন্তু এখনো পড়া চলে। গ্রন্থ রচিত হয় ১৪৯৪তে, যখন 'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতিতিলক' ছিলেন বাংলার সিংহাসনে। কাজীর অত্যাচার প্রভৃতি এক আধটুকু সাময়িক অবস্থার উল্লেখও আছে, চৈতন্যজীবনীতেও যা পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস: হুসেন শাহের উল্লেখ আছে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা-বিজয়ে'ও। তিনিও আত্মপরিচয় রেখে গিয়েছেন। নাড়ুড়্যা বটগ্রাম (২৪ পরগণা) তাঁর বাড়ী। ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। (ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এ, এস, বি থেকে সম্প্রতি এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে) রচনার দিক থেকে এ গ্রন্থের প্রথমার্ধে ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডীর কলহ নিয়ে এত উৎকট গল্প আছে যাতে পাঠক হাঁপিয়ে ওঠে; শেষার্ধে এসে লখিন্দর বেহুলার কাহিনী পাওয়া যায়; তখন পাঠকও উদ্ধার পায়। গ্রন্থের রচনা কাল খ্রীঃ ১৪৯৫।৯৬।

মঙ্গল-কাব্যের সাধারণ কাব্যগুণ: এসব সুদীর্ঘ কাব্য আজকের দিনের পাঠকের পক্ষে পড়া কষ্টসাধ্য; একমাত্র বেহুলা-লখিন্দরের মানবীয় কাহিনীই তার আকর্ষণ। নইলে মনসামঙ্গল অলৌকিক উপাখ্যানের দুর্ভেদ্য অরণ্য। কল্পনায় শ্রী নেই, কবিত্বও সামান্য; আর যেটুকু বা আছে, সংস্কৃত কাব্যরীতির বাঁধনে সে কবিত্বও আড়ষ্ট। শুধু মনসামঙ্গল নয়, দু'একখানা

মঙ্গল-কাব্য ছাড়া অধিকাংশ মঙ্গল-কাব্যেরই এই অবস্থা। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল-কাব্যই একই মূল কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, কোনো একটি ভক্তের পরীক্ষার নামে বিশেষ কোনো দেবদেবীর জয় ঘোষণা। অবশ্য তাঁরা মনসাদেবীর মতো অত ক্রূর অমন আক্রোশপরায়ণ নন, তবু তাঁরাও জোর করেই পুজো আদায় করেন। স্বেচ্ছাচারিতার যুগে দেবতারা স্বেচ্ছাচারিতারই বিগ্রহ, মানুষ যেন তাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা। প্রধানত কাহিনীর জন্যই সংস্কৃতিসন্ধানীরা এসবকে মূল্য দেন। বিশেষজ্ঞরাও গবেষণার জন্য ছাড়া প্রায়ই এসব কাব্য পড়ে দেখেন না। এরূপ কাব্যের লেখকও কম নয়—একই কাহিনী তাদের বিষয়বস্তু। তাই রচনার প্রাচীনতা, আখ্যানের কোনো একটি বিশিষ্ট বর্ণনা-ভঙ্গী, সমসাময়িক কোনো ঘটনার আভাস কিম্বা সত্যকার সাহিত্যগুণ—এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে এসব কাব্যের উল্লেখও এখন নিরর্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-সাহিত্য

(খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০)

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গলাদেশে"—বাঙ্‌লা সাহিত্যের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পরলোকগত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এ কথাটি অনেকেরই কানে অত্যুক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু কথাটি তাঁর একার নয়, কথাটি সাধারণ বাঙালী হিন্দু নর-নারীর অধিকাংশের। চৈতন্যদেব তাঁদের অনেকেরই কাছে প্রেমের অবতার; আরও অনেকেরই কাছে মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। এই প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসী বাঙালীর জীবনে ও ইতিহাসে যে অপূর্ব প্রেরণা দান করে যান, বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা বিচার করলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে বাঙালীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে মানতেই হবে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাঙ্‌লা সাহিত্যকে এমন সৃষ্টি প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন নি। তাই একটি পঙ্‌ক্তি না লিখলেও শ্রীচৈতন্য ইংরেজ-পূর্বযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান পুরুষ।

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৫৫ শকাব্দে) পুরীতে তাঁর দেহাবসান হয়। তাঁর পিতা ছিলেন নবদ্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্টের পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। তাঁর এক অগ্রজ বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর, ডাকনাম ছিল নিমাই। তাঁর গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, তাই তাঁর নাম গৌরাঙ্গ (গোরা)। অসাধারণ মেধাবী নিমাই কিন্তু বাল্যে ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চলপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ও টোলের পড়ুয়াদের ক্ষ্যাপাতে, জ্বালাতন করতে ওস্তাদ। সেদিনের নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায়ের পীঠস্থান। এই দুষ্টু ছেলেই যৌবনে সেখানকার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। অধ্যাপক রূপে টোলও তিনি খুললেন। নবদ্বীপে তখন বৈষ্ণব ধর্মেরও জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল, তার ইতিহাস আছে ; আর তা চৈতন্যদেবের সহচরদের দেখেও বোঝা যায়। নিমাই পণ্ডিতের জীবনেও ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার ঢেউ নিশ্চয়ই আগেই লেগেছিল ; কিন্তু পিতৃকৃত্য করতে গয়া গিয়ে তিনি যখন ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তারপর থেকেই তাঁর জীবনে এক নূতন পর্বের সূচনা হল।

ভগবৎপ্রেমে পাগল হয়ে বিশ্বম্ভর তখন নবদ্বীপে মদ্ভাগবত পাঠ, হরিসংকীর্তন প্রভৃতি নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর ভাবের বন্যায় নবদ্বীপ তখন টলমল করতে লাগল। তাঁর প্রধান সঙ্গী তখন নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। কিন্তু তখনো চৈতন্যদেবের ভক্তি-জীবনের মাত্র প্রথম পর্ব। তিনি তখনো সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। এর পরে ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিমাই হলেন 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য', সাধারণ কথায় 'শ্রীচৈতন্য'। তাঁর নবদ্বীপ-লীলার সহচরেরা তাঁকেই আরাধ্য এবং অবতার রূপে সাধনার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই চৈতন্যের পরবর্তী জীবন-লীলা, তাঁর রাধাভাবের সাধনা, কৃষ্ণপ্রেমের উজ্জ্বল উল্লাস স্বচক্ষে দেখেন নি, সেই লীলার বিশেষ উল্লেখও করেন নি। তাঁদের নিকট গৌরলীলাই প্রধান কথা।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে চৈতন্যদেব পুরীতে যান। বলতে গেলে তখন থেকে পুরীতে নীলাচলই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান আসন। অবশ্য প্রথম দিকে তা ছেড়ে অন্তত তিন-চারবার তীর্থ পর্যটনেও তিনি বেরিয়েছিলেন, তাতে

ছ বছর কেটে যায়। প্রথমবার তিনি দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বারে তাঁর লক্ষ্য ছিল বৃন্দাবন। কিন্তু শান্তিপুর, গৌড় ও রামকেলি হয়ে তিনি ফিরে আসেন। এই রামকেলিতেই তখন তাঁর সংস্পর্শে আসেন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী 'দবীর খাস্' সনাতন ও 'সাকর মল্লিক' রূপ। এই দুই ভাই বৈষ্ণব ইতিহাসের দুই অপরাজেয় ভক্ত পণ্ডিত, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুই গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এর পরে শ্রীচৈতন্য যখন তীর্থযাত্রা করলেন তখন ঝাড়খণ্ড (ছোটনাগপুর) হয়ে অরণ্যময় পথে গেলেন। কাশী, মথুরা প্রভৃতি বড় বড় তীর্থ তাঁর পথে পড়ল; সাধু, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, দার্শনিক সকলের সঙ্গে পথে পথে তাঁর প্রেমধর্ম নিয়ে বহু বিচার হল। প্রয়াগে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয় রূপের; আর প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে সনাতন তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

এই তীর্থপর্যটনের ফলে ভারতবর্ষের বিরাট জীবনের সঙ্গে শুধু শ্রীচৈতন্য-দেবেরই যে পরিচয় ঘটল, তা নয়। তাঁর জীবন ও প্রেমধর্ম যখন সমস্ত সম-সাময়িক বাঙালী জীবনকে প্রেরণা দান করল তখন সাধারণ ভাবে সেই বাঙালীও ভারতের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করল, বাঙালীর দৃষ্টি প্রাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল। এ ব্যাপারে চৈতন্যদেবের জীবনই হল তাদের প্রথম যোগসূত্র, আর তাঁর পরে সে সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখলেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা। তাঁরাই হয়ে ওঠেন গৌড়ীয় ভক্তিধর্মের প্রধান প্রণেতা ও পরিচালক।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তীর্থপর্যটনের পর্ব শেষ হয়ে এসেছিল। এর পরে জীবনের শেষ আঠার বছর শ্রীচৈতন্য আর পুরী ছেড়ে কোথাও যান নি। রথযাত্রার সময় তাঁর বাঙালী ভক্ত ও অনুচরবৃন্দ অনেকে পুরীতেই আসতেন। সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হত শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনে, গানে, প্রবল প্রেম-উচ্ছ্বাসে। দিনের পর দিন তাঁর জীবন কৃষ্ণ-প্রীতিতে উদ্বেল হয়ে উঠত। শেষের কয়েক বৎসর তাঁর প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানও থাকত না, ক্ষণে ক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিরহ কল্পনায় বিহ্বল বিবশ হয়ে পড়তেন। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাই তাঁর অন্ত্যলীলা, এ সময়ে 'গম্ভীরা'য় সময় কাটত তাঁর। স্বাভাবিক মনুষ্য-দেহ ও মনুষ্য-প্রাণ এই প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনায় ক্ষয় হয়ে যাবার কথা, সম্ভবত তা যাচ্ছিলও। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে না

যে, সত্যই প্রেম সেদিন রূপ গ্রহণ করেছিল, আর তা এই বাঙালী সন্ন্যাসীরই মধ্যে।

৪৮ বৎসর বয়সে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে এই মহাপ্রেমিকের দেহাবসান হল, তার সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। পুরীতে কৃষ্ণভ্রমে সমুদ্রের নীলজলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন, এই হল সুপ্রচলিত কাহিনী। রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে পায়ে তিনি আঘাত পান, আর তাতেই তাঁর দেহাবসান হয়, এ হল আর একটি ক্ষুদ্র বিবৃতি। আসল কথা, বহু পূর্বেই 'মহাপ্রভু' অবতার বলে ভক্ত-সমাজে গৃহীত হয়েছেন। সেকালে কেন, এখনও যে এদেশ অবতারের দেশ। কাজেই তাঁর মৃত্যুর কথা আর ভক্ত-সমাজ আলোচনাই করেন না, তা তাঁর দেব-লীলার চূড়ান্ত রহস্য।

সামাজিক পরিবেশ: এই হল চৈতন্যদেবের জীবনীর রূপ-রেখা; আর খ্রীষ্টীয় ১৪৮৬ থেকে খ্রীষ্টীয় ১৫৩৩ এই হল চৈতন্যদেবের জীবন-কাল। চৈতন্যের বাল্যকালেই খ্রীঃ ১৪৯৩-এ হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান হন, তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ্ রাজত্ব করেন খ্রীঃ ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ অব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে এটি সর্বাপেক্ষা গৌরবের কাল। বাঙলা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে হুসেন শাহ্ ও নুসরৎ শাহ্ দুই উজ্জল নক্ষত্র। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার পূর্বেই নৈশান্ধকার লঘু হয়ে আসছিল। অর্থাৎ এখানে সেখানে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুর উপরে অত্যাচার করলেও বিজেতার সেই ধর্মগত উগ্রতা তখন আর নেই। অন্তত সুলতান ও শাসকবর্গ পুরাতন হিন্দু শাসকবর্গকে সমাদর করতে প্রস্তুত। হিন্দু কারিগর, কর্মচারী প্রভৃতি সাধারণ লোকদেরও তাঁরা উৎপীড়ন করতে ব্যস্ত নন। মালাধর বসুর মতো সনাতন রূপ প্রভৃতি অভিজাতেরা স্বচ্ছন্দেই রাজদরবারে উচ্চপদে আরূঢ়। এক কথায়, উপরতলার হিন্দু সমাজ ও উপরতলার মুসলিম সমাজও অনেকটা পরস্পরের সন্নিকট হতে চলেছে। তার ফলে, পরাগল খাঁর মতো উচ্চবর্গের মুসলমানরাও যেমন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পাঁচালী গান শুনছিলেন, উচ্চবর্গের হিন্দুরাও তার চেয়ে বেশি ফারসী, আরবী প্রভৃতি পড়ে রাজদরবারের ম্লেচ্ছ-আচার কিছু-না-কিছু গ্রহণ করছিলেন। অথচ হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তখনই আবার শাস্ত্রচর্চা করে, নূতন দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি প্রণয়ন করে হিন্দু উচ্চবর্ণকে আত্ম-মর্যাদায় আস্থাশীল করে তুলছে।

মালাধর বসু-ও রাজ-প্রসাদে অস্বস্তি বোধ করেন ; সনাতন ও রূপের ত কথাই নেই। মনে হয়, হিন্দুর সাংস্কৃতিক জাগরণ চৈতন্যদেবের পূর্বেই সেই শাসকবর্গের সন্নিকটস্থ হিন্দু অভিজাতবর্গকে পর্যন্ত আপনার স্বপক্ষে লাভ করেছিল। অবশ্য এ জাগরণ নিতান্তই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নয় ; তাই সুলতানদেরও আপত্তি হয় নি। এই ছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কালে বাঙালী সমাজের অবস্থা। মিলিত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান স্তরের নয়, বরং সেই নব-জাগ্রত আত্মরক্ষাকামী সংস্কৃতির প্রাণ-পুরুষ হয়ে উঠলেন শ্রীচৈতন্য-দেব আর তাঁর বৈষ্ণব-মণ্ডলী।

অন্যদিকে একটা কথা স্মরণীয়—চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) সময়ে পাঠান রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্বের তুর্কী ঔদ্ধত্য আর ছিল না, কিন্তু ছিল দুর্বল রাজত্বে ডিহিদার, ইজারাদার প্রভৃতি সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার—খাজনা আদায়ের পীড়াপীড়ি, দুর্বলের প্রতি প্রবলের পীড়ন। মুসলমান সামন্তরা স্বভাবতই সে উৎপীড়ন চালাত ধর্মের নামে ; বিজয়ী বলে আর নয়; সামন্ত-প্রভু বলেই। কিন্তু ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগলেরা বাঙলা দেশ অধিকার করে ;—অবশ্য বাঙলা দেশকে সম্পূর্ণ সেই কেন্দ্রীয় শাসনের তলায় আনতে আনতে আকবরের রাজত্ব প্রায় শেষ হয়—অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে মোটের উপর বাঙলা দেশে সামন্ত শক্তির উপদ্রব হ্রাস পায়। ততদিনে, একেবারে উত্তরাপথ থেকে শাসকবর্গের যে-সমস্ত মুসলমান কর্মচারী আসতেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্য মুসলমান ছোট বড় সকলেই বাঙলা-ভাষী বাঙালীই হয়ে গিয়েছেন। বিজিত-বিজয়ীর যে বিরোধকে আশ্রয় করে শাসিত হিন্দুর প্রতিরোধ (১৩শ-১৫শ শতকে) সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রূপে মূর্ত হয়েছিল, তা যখন সার্থক হল (১৬শ ও ১৭শ শতকে), তার পূর্বেই সেই বিজেতা-বিজিত বিরোধ হ্রাস পাচ্ছিল, এখন (১৭শ শতকে) তা বিলুপ্ত হল। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সার্থক হতেই এ সময়ে এখন বিরোধ মন্দীভূত, অনেকটা নিরর্থক হয়ে উঠল। কারণ শাসকশক্তি তখন শাসিতের সাংস্কৃতিক পথ মুক্ত করে দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকে এসে তাই মোগল শাসনও তার দরবারী কায়দা-কানুন বিস্তারের প্রশস্ততর পথ পেল। বাঙলা সাহিত্যের চৈতন্য যুগ (খ্রীঃ ১৫০০-খ্রীঃ ১৭০০) অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ—যদিও বৈষ্ণব প্রেরণা ছিল প্রতিরোধের প্রেরণা, সে প্রতি-রোধ রাজনৈতিক নয়, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক।

মধ্যযুগে উত্তর ভারতে, পারস্যে, ইউরোপে ও অনেক দেশে এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন সাধক সম্প্রদায় ও তাঁদের ধর্মগুরুদের আবির্ভাব দেখা যায়, এটা আকস্মিক নয়। কারণ, তখন সমাজ সামন্ত যুগের কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই বন্ধনের জ্বালা তারই মধ্যে কখন কখন অতি-সংবেদনশীল চিত্তে অসহ্য হয়ে উঠত। তাঁরা সেদিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ, অচেতন বিদ্রোহী। তাঁদের সেই বিদ্রোহ তখনকার দিনে স্বাভাবিক ভাবেই রূপ গ্রহণ করত ধর্মগত কোন আবরণের আড়ালে—তাতে অনেক সময়ে বাস্তব রাজশক্তি ও সমাজশক্তির কঠোর শাসন এড়িয়ে যাওয়া যেত, অনেক সময়ে শাসকশক্তির অত্যাচার সইতেও হত না। অবশ্য বিদ্রোহটা বাস্তব ক্ষেত্রেও যে একেবারে প্রভাব বিস্তার করত না তা নয়। যখন সামন্ত যুগে সমস্ত সমাজই ছিল থাক-থাক করে ভেদের নীতিতে সংগঠিত—তখন এই আধ্যাত্মিক সাম্য ও মরমিয়া প্রেমভক্তিবাদ মানুষে মানুষে ভেদ-রেখা টানত না। এই আধ্যাত্মিক অভেদবাদ বাস্তব জীবনেও মানুষে মানুষে ভেদের রেখাটাকে মুছে ফেলতে চাইত। তাঁদের অনুচররা প্রায়ই আসত জনসাধারণ থেকে। আর তার জন্যই প্রায় দেশেই এই ধর্মগুরু ও তাঁদের মণ্ডলী রাজশক্তির হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। একথা বিশেষ করে সত্য পারস্যের সুফী সাধকদের সম্বন্ধে ও ভারতের নানক-শিষ্য শিখদের সম্বন্ধে।

চৈতন্যদেবের দান : মধ্যযুগের সাধকদের যে কথা সত্য, তা শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও সত্য—প্রেমধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ তা হল সামন্তযুগের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ, কিন্তু সামন্তযুগের মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও নয়। তা সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না, অথচ সে ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতেও প্রস্তুত নয়। চৈতন্যদেব মুসলমান-শাসিত হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রবক্তা হিসাবে সদাচারী, হিন্দু সমাজধর্মের পক্ষপাতী ; জাতিভেদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রত্যক্ষত দণ্ডায়মান হন নি। কিন্তু সামন্তযুগের অনুদার মতাদর্শকে অস্বীকার করেই তিনি প্রচার করলেন—জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম-ধর্ম, নাম-সংকীর্তন। এই অধিকারভেদের দেশে কৃষ্ণ নামে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই অধিকার, এই একক সাধনার দেশে সকলের সমবেত সংকীর্তন নবদ্বীপের পথে পথে, পুরীর রথাগ্রেও সকল জাতের মানুষ নিয়ে প্রেমের পরমোৎসব—সেখানে যবন হরিদাস পর্যন্ত তাঁর পরম অনুগ্রহভাজন সহচর,—এসব চৈতন্য-

দেবের মহৎ সংস্কার-প্রয়াসেরই প্রমাণ। এদেশে, এ সমাজে—সে যুগের তুলনায়,—নিশ্চয়ই এই সাধনাদর্শ ও সাধন-প্রয়াসকে আমরা আজকের প্রচলিত ভাষায় 'গণতান্ত্রিক' বলতে পারি—যদিও তা রাষ্ট্রশক্তির সম্বন্ধে নিরপেক্ষ,—নবদ্বীপের কাজীর মত অত্যাচারী রাজপুরুষকে প্রতিরোধ করা তাঁর প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণ ভাবে রাজা ও রাজশক্তিকে তা মেনে নেয়। সমাজশক্তিকেও তা অস্বীকার করতে ব্যস্ত নয়। কৃষ্ণনামে সকলের অধিকার স্থাপনেই তা সন্তুষ্ট, বর্ণভেদ, উচ্চনীচ ভেদ তুলে দিয়ে সামাজিক সংহতি স্থাপনের কথা মুসলমান সমাজকে দেখেও প্রয়োজন মনে করে নি। এ হিসাবে বুদ্ধদেবের সঙ্গেই চৈতন্যদেব তুলনীয়, দু'জনেই সমাজের মহৎ সংস্কারক, তবে বিপ্লবী নন, বিদ্রোহীও পুরোপুরি নন। সে ভাবে তাঁদের চিত্রিত করলে বা পরিমাপ করতে গেলে সেকালের উপর আমরা একালের আদর্শ চাপাবো।

মধ্যযুগের সাধারণ অন্যান্য সাধকগুরুর মতো শ্রীচৈতন্যদেবেরও ভূমিকা ছিল প্রধানত সংস্কারকের, ভাববাদী বিদ্রোহীর। কিন্তু বাঙালী সমাজে তাঁর নিজস্ব একটি ভূমিকা ছিল, তাও আমরা এখানে দেখতে পাই। বাঙালী শাসিত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে তিনি সার্থক রূপ দান করেন—একদিকে অভিজাতদের মধ্যে ম্লেচ্ছাচার রোধ করে, অন্যদিকে জনসাধারণকে সংকীর্তন ও নামধর্মের সাহায্যে প্রেমধর্মে সমান অধিকার দান করে। আর তৃতীয়ত এইভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন বর্গকে এক-ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়-ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন;—এবং সেই সমাজের মন থেকে আগেকার অনুষ্ঠান-বাহুল্য কতকটা বিদূরিত করেন, সাধারণ ভাবে সেই মনে জাগিয়ে তোলেন সমকালের প্রতি একটা মমতা (তাই চৈতন্য-ভক্তের কথা হল, 'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার'), মানুষের একটা মূল্যবোধ (তুচ্ছতম মানুষও 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে')। নর মানুষেরও একটা ঐশী মহিমা ('কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ')। এই সাংস্কৃতিক-সামাজিক জাগরণে বাঙালীর চেতনা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে নানাদিকে অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাঙালীর এই জাগরণ সম্পূর্ণ জাগরণ নয়, কারণ বাস্তব জীবন ও বৈষয়িক উদ্যোগ-প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সীমাবদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই জাগরণ

আবদ্ধ ছিল। তবু এই জাগরণ এক পরম মহোৎসব, আর সাহিত্যে মুখ্যত তা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত বৈষ্ণব-মণ্ডলীর দান।

বৈষ্ণব-মহাজনমণ্ডলী

এই বৈষ্ণব-মণ্ডলী চৈতন্যদেবের জীবিত কাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় একশত বৎসর বাঙালী সমাজকে প্রাণরস যুগিয়েছেন। তার পরেও তাঁদের ধারা অব্যাহত থাকে। আজও বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজে পণ্ডিত, মনস্বী ও ভাবুকের অভাব নেই। কিন্তু কালের নিয়মে তাঁদের ধারা ক্রমে গতানুগতিক হয়ে পড়ে। জীবন্ত কাল এগিয়ে গিয়েছে, তাতে তাঁদের বাণী আপনার দান যুগিয়ে সার্থক হয়েছে, কিন্তু ক্রমে নিঃশেষিতও হয়ে গিয়েছে। অন্তত সাহিত্য হিসাবে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বৈষ্ণব প্রেরণা আর তত সৃষ্টিশালিনী রইল না। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশও তখন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীচৈতন্যের নিজ পারিষদ্‌দের মধ্যে এমন অনেক পণ্ডিত ও মনীষী ছিলেন যাঁরা যে-কোনো যুগে তাঁদের অধ্যাত্ম-প্রতিভার জন্য বা পাণ্ডিত্যের জন্য নমস্য হতেন। বাঙলার সাংস্কৃতিক জাগরণ তাঁর সমকালে যে কোন্ স্তরে পৌঁছেছে, শ্রীচৈতন্যের মতোই এঁদের আবির্ভাবও তার প্রমাণ। এই মহা-প্রতিভাশালী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাঁদের কাব্য, দর্শন ও ভক্তিবাদের অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন সংস্কৃত ভাষায়; বৈষ্ণব ধর্মের অনেক মূল গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত। কারণ, প্রেমধর্মটা ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা না করলে চলে না, আর এই পণ্ডিত সমাজের সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃত। এসব সংস্কৃতে-রচিত সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য নয়। কিন্তু এ সবের মধ্যে কোনো কোনো মূল গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাঙলায় অনূদিত হয়েছে। তা ছাড়াও বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যও এই সব মূল শাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত, সে হিসাবে এরকম কোনো কোনো মূল গ্রন্থের উল্লেখ না করলেই নয়। আর, যে মহাজনরা এসব গ্রন্থের রচয়িতা ও বৈষ্ণব-মণ্ডলীর পরিচালক, তাঁদেরও কিছুটা পরিচয় এই কারণে বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-দেরও গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ পারিষদ্‌দের মধ্যে প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য আর নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। চৈতন্যের জন্মকালের পূর্বেই অদ্বৈত আচার্য পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন, মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনিও শ্রীহট্টের এক পণ্ডিতের পুত্র। তাঁর দুই

পত্নী—শ্রীদেবী ও সীতাদেবী। আচার্য ও সীতাদেবীর জীবন-কথা বাঙ্‌লা সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। নিত্যানন্দের স্থান বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভুর পরেই। তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই, জীবিতও ছিলেন মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে। কিন্তু চৈতন্যদেবের নির্দেশমতো সন্ন্যাস ত্যাগ করে তিনি দেশে এসে দারপরিগ্রহ করেন, প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁর দুই পত্নী—বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবী—দুই ভগ্নী। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের পরে বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের শিষ্যবর্গের মধ্যে পড়েন তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস, জ্ঞানদাস। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাই নিত্যানন্দ-শিষ্যদের প্রেরণা প্রচুর ফলদায়িনী হয়েছে।

ভক্ত হিসাবে হরিদাসের তুলনা নেই। তিনি জন্মেছিলেন মুসলমানের ঘরে, কিন্তু শুধু এক মুসলমানী জন্ম ছাড়া কোরাণ-হাদিস-সম্মত আচরণের কোনো চিহ্ন তাঁর ছিল না। তাঁকে নিয়েই নবদ্বীপের মুসলমান-সমাজের সঙ্গে চৈতন্য-মণ্ডলীর কলহ দেখা দেয়; নীলাচলে তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গী।

এই তিন প্রধান পারিষদ্ ছাড়া নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীচৈতন্যের অন্য প্রধান অনুচর ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত (সংস্কৃতে লেখা চৈতন্যচরিতম্-এর লেখক), মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নয়নানন্দ মিশ্র, জগদানন্দ পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ (পদকর্তা) ও তাঁর দু'ভাই প্রভৃতি। এই সঙ্গেই উল্লেখ-যোগ্য শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-মণ্ডলীর কথা,—যেমন, নরহরি সরকার (পদকর্তা) ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন। এঁরা শ্রীচৈতন্য-পূজারও প্রধান প্রবর্তক। এঁদের শাখায় উদ্ভূত হন লোচন দাস, কবিরঞ্জন, 'কবিশেখর রায়' (দেবকী-নন্দন সিংহ) প্রভৃতি প্রধান কবিরা।

পুরীতে মহাপ্রভুর অনুচরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বরূপ দামোদর (অধুনালুপ্ত সংস্কৃত শ্লোক বা কড়চা রচনা করেন), রায় রামানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি। রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের এক ধনী গোস্বামীর পুত্র, আবাল্য ভক্তি-পিপাসায় উদ্‌গ্রীব। গৃহত্যাগ করে পুরীতে এসে তিনি চৈতন্যদেবের শরণ নেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তিনি বৃন্দাবনবাসী হলেন, সেখানে তিনি 'ষড়্‌গোস্বামীর' অন্যতম রূপে গণ্য হন।

বৈষ্ণব আন্দোলন

চৈতন্যদেব কোনো সম্প্রদায় গঠন করে যান নি, কিন্তু তাঁর জীবিত-কালেই তাঁকে কেন্দ্র করে একাধিক বৈষ্ণব মতবাদ ও বৈষ্ণব-মণ্ডলী গঠিত হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রবিহিত ভক্তিবাদ বা 'বৈধী ভক্তির' পরিবর্তে চৈতন্য-ভক্তরা 'রাগানুগা ভক্তিকেই' শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে গ্রহণ করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের নিকট চৈতন্যই হন স্বয়ং ভগবান্। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবদের নিকট যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীরা তেমনি চৈতন্যই আবার 'পরম নাগর' আর ভক্তরা 'নাগরী'। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে অদ্বৈত আচার্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে এক বৈষ্ণব শাখা; গদাধরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'গৌর পারম্যবাদ' বা গৌরাঙ্গ পূজার সম্প্রদায়; এবং নিত্যানন্দের নেতৃত্বে যারা গঠিত হল তাদের মধ্যে ষোল শত নেড়ানেড়ীও ছিল—যারা ছিল বিলুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধ (সহজিয়া) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মানুষ। (দ্রষ্টব্য—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'।) বোঝা যায়, সহজিয়া তান্ত্রিক মণ্ডলী-গুলির পক্ষে চৈতন্য সম্প্রদায়ের দ্বার প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মতবাদেও সহজিয়া প্রভাব দেখা যায়, আর নিত্যানন্দের নামে তো সহজিয়ারাই বৈষ্ণবদের এক বৃহত্তম সম্প্রদায় (বৈরাগী) হয়ে ওঠেন। বৈষ্ণব সমাজের মতবাদের মধ্যে তাই 'প্রকৃতি-সাধনা', 'পরকীয়াতত্ত্ব' প্রভৃতি সহজেই অঙ্গীকৃত হয়।

এই সব নানা শাখা লুপ্ত হয় নি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীরা। ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৈরাগ্য-বাদী পরম ভক্ত এই গোস্বামীরা বাঙ্‌লার এই সব শাখা থেকে দূরে ছিলেন। বৃন্দাবনে বসে রামানুজ ও মাধ্ব সম্প্রদায় প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর পরিবেশে তাঁরা নিজেদের মত, তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি প্রণীত করলেন (এবিষয়ে দ্রষ্টব্য ডঃ সুশীলকুমার দে'র Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal); শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ, বিশেষ করে ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্রের উপরে তা প্রতিষ্ঠিত হল। সেই মতেও শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের যুগ্মাবতার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের ব্রজলীলাই হল তাঁদের নিজেদের তত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য। 'রাগানুগা ভক্তিই' অবশ্য এই সাধনারও প্রধান পথ; কিন্তু আচারে-নিয়মে শাস্ত্রোক্ত সদাচার, এবং (শক্তি ও তান্ত্রিক আচারের বিরোধী) শুদ্ধাচারই গোস্বামীরা প্রতিষ্ঠা

করলেন—বাঙালী বৈষ্ণব সমাজ ক্রমে প্রধানত এই গোস্বামীদেরই প্রণীত ও প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মেই সংগঠিত হয়। অবশ্য 'রাগানুগা ভক্তি'ই তাঁদের সৃষ্টি-প্রয়াসকে কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত করে তোলে—চৈতন্যদেবের নাম সমস্ত যুগের উপর অঙ্কিত করে দেয়।

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী

বৃন্দাবনের এই ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে সনাতন ও রূপ দুই ভাই; বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনাই হয়ে ওঠে তাঁদের জীবনের মহাব্রত। এঁদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম বৃন্দাবন থেকে রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে, সিন্ধুদেশেও বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙালীর মানসিক যোগও এঁরা সুদৃঢ় করেন। অবশ্য মোগল রাজত্ব বাঙলা দেশে স্থাপিত হলে পর (খ্রীঃ ১৫৭৫-৭৬) এই যোগের পথ আরও অবাধ হয়। রূপ ও সনাতন বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। সনাতন 'হরিভক্তিবিলাসে'র লেখক, অসামান্য পণ্ডিত, নিরভিমান ভক্ত। রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ। এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব বৃন্দাবনের তৃতীয় গোস্বামী, তিনি সংস্কৃতে বহু দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর প্রধান কীর্তি 'ষট্‌সন্দর্ভ'। অন্য তিন-জন গোস্বামী গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। এই তিন জন বৃন্দাবন পুনরাবিষ্কার করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা সেখানে অপ্রতিহত করে তোলেন, আর গোস্বামীদের রচিত বৈষ্ণব শাস্ত্রও বাঙলা দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজের কৃষ্ণলীলার দর্শন ও তত্ত্ব যোগান এই বৃন্দাবনের গোস্বামীরা;—সেই তুলনায় নবদ্বীপের ও শ্রীখণ্ডের চৈতন্য-পূজারী ভক্তরা বাঙলা দেশে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ

ষড়্‌গোস্বামীর উত্তরাধিকার লাভ করেন, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রমুখ মহাজনেরা। এঁদের জীবনকাল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ, অর্থাৎ চৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে,—মোগল সাম্রাজ্য তখন স্থাপিত হচ্ছে। এঁদের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্মে বাঙলা দেশ আবার নতুন করে ভেসে গেল; হরিনাম সংকীর্তনে আর বৈষ্ণবদের মহোৎসবে দেশ গেল ছেয়ে।

এই তিন জনের মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করেছেন অবশ্য শ্রীনিবাস আচার্য। বৈষ্ণব সমাজে তিনি শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার বলে কল্পিত হয়েছেন; অপর দু'জনে গণ্য হয়েছেন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বলে—অবতারের পুনরাবৃত্তি-কল্পনা এ দেশের ভক্ত সমাজের এরূপই একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। সাহিত্যে শ্রীনিবাস দুই একটি পদ ভিন্ন বিশেষ কিছু দান করেন নি। কিন্তু পাণ্ডিত্যে, আধ্যাত্মিকতায় ও ব্যক্তিত্বে অগ্রগণ্য বলে তাঁর খ্যাতি ছিল—তা যাচাই করবার উপায় এখন আর নেই। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের কাছে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাও গ্রহণ করেন। সেইখানেই নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গেও তাঁর মিলন হয়। কথিত আছে, শ্রীনিবাসই বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করেন। এ বিষয়েও একটা কাহিনী আছে। বৃন্দাবন থেকে তিনি বাঙ্‌লায় ফিরছিলেন এক সিন্দুক বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। জীব গোস্বামী সে সব প্রচারের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পথে বিষ্ণুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজার অনুচর দস্যুরা সেই সিন্দুক লুণ্ঠন করে। তারই মধ্যে ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমূল্য মহাগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র পাণ্ডুলিপি। বলা হয়, বৃদ্ধ লেখক কবিরাজ গোস্বামী এই পুঁথি অপহরণের সংবাদ শুনে ভগ্নহৃদয়ে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থগুলি উদ্ধার না করে শ্রীনিবাসও ছাড়বেন না। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে রাজা হাম্বীরের পরিচয় হল; আর হাম্বীর শেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বিষ্ণুপুর বাঙ্‌লায় বৈষ্ণব-ধর্মের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সব কাহিনী কতটা সত্য তা বলা যায় না, তবে কালক্রমে শ্রীনিবাসের ও তাঁর কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য-প্রশিষ্যরা ছড়িয়ে পড়েন সমস্ত পশ্চিম বাঙ্‌লায়। আর শিষ্য বলে নিশ্চয়ই গুরুর মহিমাও পরিব্যাপ্ত হয়েছে—যদিও গোস্বামীরা তাঁকে 'স্খলৎপাদ' বলেছিলেন।

নরোত্তম দাস ঠাকুর ভক্ত হিসাবে অদ্বিতীয়। নরোত্তম ছিলেন পদ্মা-তীরের খেতরি গ্রামের কায়স্থ জমিদারের পুত্র। সাহিত্যেও তাঁর দান অসাধারণ; তাঁর অপূর্ব চরিত্রমাধুর্য তাঁর প্রার্থনা-বিষয়ক রচনাকে সুন্দর শ্রী দান করেছে। বৃন্দাবন থেকে দেশে ফিরে খেতরিতে তিনি যে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন, বৈষ্ণব ইতিহাসে তা নানা দিক থেকেই একটা মহৎ ঘটনা। তখন থেকেই রসকীর্তনের সূচনা হয়, 'গৌরচন্দ্রিকা' গানের রীতি প্রচলিত

হয়। নরোত্তম দাস ছিলেন উত্তর বঙ্গের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান উৎস, কিন্তু সমস্ত বাঙালী বৈষ্ণব সমাজ ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের রসিক 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র লেখক এই পরম ভক্তের আন্তরিকতায় ও সরলতায় এখনো বিমুগ্ধ হন।

শ্যামানন্দ দাস (মৃত্যু আনুমানিক খ্রীঃ ১৬৩০) জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। তিনি মেদিনীপুর জেলার লোক, বৃন্দাবন থেকে সেখানেই ফিরে আবার ভক্তিধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। এই প্রচারে তাঁর ধনী শিষ্য রসিকানন্দ তাঁর প্রধান সহকারী হন। শ্যামানন্দের প্রভাবে মেদিনীপুর-ওড়িষ্যার সীমা-ভাগে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রসার লাভ করে। শ্যামানন্দ নিজেও কয়েকটি পদ ও স্তবের রচয়িতা।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজনদের পরেও বৈষ্ণব মহাজনদের অভাব হয় নি। পদ-রচনায়, জীবনী-রচনায়, ভক্তিধর্ম-প্রচারে তাঁরা বৈষ্ণব-সমাজ ও বাঙালী জাতিকে সমুজ্জ্বল করেছেন; পাণ্ডিত্যে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে, সাধনায় তাঁরা অনেকেই ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ মানুষ। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁদের কীর্তি আমাদের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাঙালীর জীবন-ইতিহাসে কিংবা পরবর্তী জীবন-প্রকাশে তাঁদের দানকে মুখ্য বলে আর গণ্য করা চলে না।

রাজনৈতিক পটভূমিকা : মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বৈভব

চৈতন্যদেবের বাল্যকালেই হুসেন শাহ্‌ গৌড়ের সুলতান হন; চৈতন্য-দেবের মৃত্যুর (খ্রীঃ ১৫৩৪) সময়ে সে রাজবংশ প্রায় অবসান লাভ করছে—মোগল সাম্রাজ্য ও শের শাহের বিরোধিতা তখন সমাসন্ন। বড় একটা পরিবর্তন সংঘটিত হল মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠায়—রাজনৈতিক গণনায় চৈতন্য-পর্ব জুড়ে আছে এই মোগল সাম্রাজ্যের কাল।

বাঙ্‌লা দেশের রাজশক্তির সঙ্গে বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল হুসেন শাহ্‌ (খ্রীঃ ১৪৯৮-১৫১৯) ও নুসরৎ শাহের (খ্রীঃ ১৫১৯-১৫৩২) আমলে। সেই রাজশক্তি ছিল অনেকাংশে বাঙালী ভাবাপন্ন, আর দেশেও তাঁরা শান্তিস্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদের সহানুভূতিতে তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্য মোটের উপর দরবারে লালিত হয় নি—পল্লী সমাজেই তা পালিত হয়। বাঙালী লেখকদের রাজনৈতিক ঔদাসীন্যও তাই কিছুতেই ঘোচে নি। হুসেন

শাহ্-এর রাজত্বকালেই লোদি সম্রাটদের হাতে জৌনপুরের শর্কি সুলতান হুসেন শাহ্ পরাজিত হন (খ্রীঃ ১৪৯৪) ; অযোধ্যার এই সুফী-প্রভাবিত শর্কি-গোষ্ঠী আমীর অনুচর নিয়ে এসে তখন প্রথম বিহারে, পরে বাঙলার হুসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড় দরবারের এই ষোড়শ শতাব্দীর শরণার্থী আমীর-ওমরাহ অনুচরেরা ক্রমে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব বাঙলার শ্রীহট্ট-চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় সামন্তদের মধ্যে অধ্যুষিত হন ; আর তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে ওসব অঞ্চলে নূতন সাহিত্যের, বিশেষ করে সুফী-প্রভাবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে,—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানে বাঙলা সাহিত্যের কেন্দ্রে তা নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সমসাময়িক কালে (ষোড়শ শতকে) সাহিত্যে কোথাও এই ঘটনার উল্লেখ নেই। হুসেন শাহ্-এর কামতা অভিযান, আসাম অভিযানের কথা 'আসাম বুরঞ্জী'তে পেলেও বাঙলা সাহিত্যে পাই না, জাজপুর-ওড়িষ্যা অভিযানের (খ্রীষ্টাব্দ ১৫০৪-৫—১৫০৯, বা, ১৫১৩ ?) আভাস মাত্র সংগ্রহ করা যায় 'চৈতন্যভাগবত' থেকে (দ্রঃ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা বাঙলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)। 'পরাগলী মহাভারতে' লস্কর পরাগল খাঁর ও নুসরৎ শাহ্-এর ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম জয়ের উল্লেখ অবশ্য স্পষ্ট। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্য উদাসীন।

নুসরৎ শাহের সময়েই দেশে বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। বাবর দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য পত্তন করলেন (খ্রীঃ ১৫২৬) ; নুসরৎ শাহ্ ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করে পারলেন না (খ্রীঃ ১৫২৯) ; আহোম আক্রমণেও নুসরৎ শাহ্ অপদস্থ হলেন। তবে বাঙলার শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। নুসরৎ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ্ এক বৎসর রাজত্ব করলেন, (খ্রীঃ ১৫৩১-৩২)। তিনিও ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের পরিপোষক, শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁর অনুরোধেই লিখিত হয়। তারপরে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ (১৫৩৩-৩৮) সুলতান হলেন ; কিন্তু উদীয়মান পাঠান-সম্রাট শের শাহ্ শূরের হাতে তাঁর বারবার পরাজয় ঘটল। বাঙলা শের শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, আর বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের এই বিলুপ্তিতে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার রাজশক্তির সম্পর্কও তখনই ছিন্ন হয়ে গেল।

হয়তো তখন আর বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে রাজানুকূল্যের প্রয়োজন ছিল

না। বাঙালী পণ্ডিত সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণ ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস তৎপূর্বেই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে; চৈতন্যভক্তদের, বিশেষত শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভৃতির ভক্তিপ্লাবনে তা আরও সুস্নিগ্ধ ও নবায়িত হচ্ছে; আবার রাজ-নৈতিক আবর্তন-বিবর্তনে বাঙালী সমাজ ভক্তি ও বৈরাগ্যের বশে রাজনীতিক বিষয়ে আরও উদাসীন হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব ভাবালুতা, 'প্রকৃতি-সাধনা' ও 'পরকীয়াবাদ' মানুষকে নির্বীর্য করে, সুস্থ পুরুষকারের উদ্বোধন করে না। অন্যদিকে শের শাহ্-এর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাঙ্‌লার কেন্দ্রীয় রাজশক্তির গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও সুদূর হয়ে উঠল। শের শাহ্ বাঙ্‌লা দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন ছোট ছোট জায়গীরে বিভক্ত করে। পরবর্তী মোগল আমলে শের শাহ্-এর এই জায়গীর-বিভাগকে ভিত্তি করেই বাঙ্‌লা রাজ্যের পুনর্ব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব শূরবংশের পর থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ছোট বড় পরিপোষক হতে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী-প্রধানরা,—রাজা-রাজড়ারা নয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাঙ্‌লা কাব্যে এই পল্লীর (যেমন, মুকুন্দরাম, সীতারাম দাস, প্রভৃতি) পৃষ্ঠপোষকদেরই উল্লেখ পাই। তাছাড়া বাঙ্‌লা সাহিত্যের পরিপোষকতা করেছিলেন স্বাধীন আরাকান-রাজরা, কামতা-কামরূপ, ত্রিপুরা, মল্লভূমি প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলের অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত রাজারা।

শূর রাজবংশ বাঙ্‌লায় রাজত্ব করলেন (খ্রীঃ ১৫০০ থেকে খ্রীঃ ১৫৬৪ পর্যন্ত), কররানি বংশ তারপর বাঙ্‌লা দখল করে রাখতে চাইল (১৫৬৪-১৫৭৫);—ওড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য তাদের পদানত হয় তখনই,—কিন্তু শূর বা কররানিরা কেউ বাঙালী নন, বাঙালী হবার মতো সুযোগও লাভ করেন নি। এঁদের দিন শেষ হয়ে এল ভারতে মোগল-সূর্য আকবর শাহের উদয়ে (খ্রীঃ ১৫২৬-খ্রীঃ ১৬০৫)। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে নানা আফ্‌গান সর্দার ও প্রায়-স্বাধীন হিন্দু-মুসলমান 'বার ভূঞাদের' দমন করে মোগল শাসন সুসংগঠিত করতে করতে আকবরের জীবন প্রায় শেষ হয়ে যায়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ কররানি মুনিম খাঁর হাতে পরাজিত হন; কিন্তু দাউদ, উসমান প্রভৃতি রাজ্যাভিলাষী পাঠান রাজারা ছাড়াও খিজরপুরের দুর্ধর্ষ ভূঞা ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র মুশা খাঁ, বীরভূমের বীর হামীর, পাছেটের শাম্‌স খাঁ, হিজলির সলিম খাঁ, ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার রাজা রামচন্দ্র, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, শ্রীপুরের চাঁদরায়-কেদার-

রায়, ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, সুষং-এর রঘুনাথ প্রভৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন ভূঞারা তখনো প্রায় স্বাধীন ছিলেন। মানসিংহের (খ্রীঃ ১৫৯৪-১৬০৪) পরে বাঙলার ভূঞাদের দমন করেন (খ্রীঃ ১৬১১-১৬১২) ইস্‌লাম খাঁ— তখন জাহাঙ্গীরের (খ্রীঃ ১৬০৫-২৭) রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে।

বার ভূঞাদের আমরা অবশ্য আধুনিক-কালে বাঙালী স্বাধীনতার নেতা হিসাবে কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু মূলত তাঁরা ছিলেন সামন্ত যুগের সামন্ত-ভাগ্যান্বেষী। রাষ্ট্রজাতির ধারণা (ন্যাশনালিজম্) তখনো জন্মাবার কথা নয়, জন্মায়ও নি ; এমন কি যথার্থ স্বাদেশিকতাও (পেট্রিয়টিজম্) তাঁদের কতটা ছিল, সন্দেহ। তাঁরা বুঝতেন নিজেদের সামন্ত রাজ্য, নিজেদের সামন্ত স্বার্থ, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দৌর্বল্যের দিনে ছলে বলে কৌশলে নিজ নিজ ক্ষমতা-বিস্তার। অবশ্য এটা সব দেশের সামন্তশক্তিরই সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু বাঙলার এই বিদ্রোহী বারভূঞা ও জমিদাররা আসলে যুদ্ধ-বিগ্রহ কম করেন নি ; স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরা আকবর শাহ্-এর ইতিহাস-বিশ্রুত সেনাপতিদের দীর্ঘদিন (অন্তত খ্রীঃ ১৫৭৫ থেকে খ্রীঃ ১৬০৪, অথবা প্রায় ১৬১১-১২ পর্যন্ত) ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। এজাতীয় যোদ্ধাদের নিয়েই অন্যদেশে বীরগাথা রচিত হয়। রাজপুত-বীরদের নিয়ে মুখর হয়েছিল তাঁদের কবিরা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী বীরদের প্রায় উল্লেখও নেই ; বীরত্ব কাহিনী বলতে আছে কালকেতু ও লাউসেনের সেই গ্রাম্য যুদ্ধের বর্ণনা। মানসিংহের খ্যাতি অবশ্য বাঙলায় স্থাপিত হয় খ্রীঃ ১৬০১-এ ; মুকুন্দরাম তাঁর উল্লেখ করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তা ক্রমে লোকশ্রুতির মত হয়ে (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে) ভারতচন্দ্রের হাতেও গিয়ে পৌছায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতক বাঙলা সাহিত্যের গীতিমুখর যুগ ; কিন্তু যোদ্ধা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রভৃতি উপাদান থাকলেও কোনো বীরগাথা, জাতীয় বীরের কাহিনী সে সময়ে রচিত হয় নি। তুর্ক-বিজয়ের পর থেকে শাসিত সমাজে রাজনীতিক আগ্রহ আর বর্ধিত হয় নি, সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রকাশই বাঙালী সমাজের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া, পল্লী-জীবনের বিচ্ছিন্নতা এসব রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিদূরিত হয় নি, মূলত বাঙলা সাহিত্যের পরিবেশও তাই তখন পরিবর্তিত হয় নি। সাধারণ ভাবে তাতে উল্লেখিত হয়েছে এই অরাজকতার ও অনিশ্চয়তার কালে গ্রাম্য

ডিহিদার, সামন্তশক্তির নানা অনুচর, সিপাহী-পাইকের অত্যাচার, ধনজন-মান-সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা-বোধ (শ্রীযুক্ত তপনকুমার রায় চৌধুরীর ইংরেজিতে লেখা, সম্প্রতি প্রকাশিত—Bengal under Akbar and Jehangir নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তাতে একালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও সম্যক্ আলোচিত হয়েছে)।

বৈষ্ণব আন্দোলন বাঙালীর সাহিত্যে পৌরুষ ও পুরুষকারকে আরও খর্ব করেছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্য মোটের উপর তিন জাতীয় :—জীবনী কাব্য, বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও 'পদাবলী'। সাহিত্যের দিক থেকে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীকেই মনে করি অমর সম্পদ ; জীবনী-কাব্যকে এ দেশের সাহিত্য-ধারায় অপূর্ব বলে না মেনে পারি না। কিন্তু বৈষ্ণব-শাস্ত্র, বিশেষ করে বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি মেনেই বৈষ্ণব কবিরা কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তাই সে-সব শাস্ত্রেরও গুরুত্ব যথারীতি স্বীকার করতে হয়। তা ছাড়া অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের অনুকরণে কৃষ্ণমঙ্গল-জাতীয় কাব্যও রয়েছে ; তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, চৈতন্যদেবের প্রেরণা ও ধর্ম কৃষ্ণ-কাহিনীমালাকে নূতন প্রাণ দান করে। অবশ্য চৈতন্য-পরবর্তী সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই, এবং রামায়ণ-মহাভারতেও, সর্বত্র যে ভক্তিধর্মের প্রচার দেখা যায়, তারও উৎস শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ।

জীবনী-কাব্য

ভারতবর্ষের সাহিত্যে বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যসমূহ এক নূতন জিনিস। দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল এতদিন সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। অবশ্য অবতার-বাদের দেশে দেবতারাও আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অনেকটা মানুষেরই অপরূপ। তবু তাঁদের ক্রিয়াকর্ম হল দেবতার লীলা-খেলা। বৈষ্ণব জীবন-চরিতসমূহ যে এই প্রভাব থেকে মুক্ত, তা নয়। কারণ চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তিনি অবতার বলে গণ্য হয়েছিলেন। বৈষ্ণবজীবনী তাই সর্বাংশে জীবনী নয়, ভক্তি-কাব্য, আর তাই ধর্মের প্রভাবমুক্তও নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সাহিত্য যতক্ষণ সত্য সত্যই মানুষের কথা না হয়ে ওঠে, এবং ধর্ম ও অলৌকিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্য হিসাবে তা স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না, তার নাবালকত্ব ঘোচে

না, তার বিকাশ স্বচ্ছন্দ হয় না। বৈষ্ণব-জীবনীসমূহও মধ্যযুগের ধার্মিকতার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ, তা সম্পূর্ণরূপে মানব-জীবনের চিত্র নয়। কিন্তু চৈতন্যদেব, অদ্বৈত আচার্য ও অন্যান্য ভক্ত মহাজনরা ছিলেন জীবন্ত মানুষ, লোকে তাঁদের রক্তমাংসের দেহে বরাবর দেখেছে। ভক্তি-মাহাত্ম্যেও অবতার বা গুরু বলে সেই রক্তমাংসের মানুষকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া তাই সম্ভব হয় নি। বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যও এদিক থেকে সত্যকারের 'সাহিত্যের পথে এগিয়ে গিয়েছে—মানুষকে আশ্রয় করেছে।

শুধু তাই নয়। এসব জীবনীতে সেই মানুষের জীবন-কথা এসেছে, তার গৃহ, পরিবার, সমাজ এবং সমসাময়িক পরিবেশের কথাও এসেছে। এমন কি, চৈতন্যদেব যেমন প্রাদেশিক সীমা ছাড়িয়ে ভারত পর্যটন করেছেন, তাঁর জীবনীতেও তেমনি ভারতের নানা অংশের তথ্যও কিছু-না-কিছু স্থান পেয়েছে। এই সব তথ্যের গুরুত্বও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ঐতিহাসিকের চক্ষে তারও কিছু মূল্য আছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, লেখকদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার ও সেইসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা। সাহিত্যরচনার ধারণা তাঁদের ছিল না; সাহিত্যরসের দিকেও তাঁদের মনোযোগ থাকত না; জীবন-চরিতের জীবনী-অংশ বা চরিত্র-চিত্রণেও তাঁদের আগ্রহ দেখা যেত না। নানা অদ্ভুত কথা, অলৌকিকতা, অতি-প্রাকৃতের বাহুল্যে এসব জীবনী ভারাক্রান্ত, রচনা অনেক সময় নীরস, আর ঘটনার বিবরণ বা আখ্যান বহু স্থলে স্বাদ-গন্ধহীন। অবতার বা মহাজনদের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বা লীলা-মাহাত্ম্যের কথা ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে নিশ্চয়ই মূল্যবান; কিন্তু একালের সাহিত্য-রসিক পাঠকদের নিকট সেসব তেমনি হাস্যকর—স্থূল অধ্যাত্ম চেতনার না হোক, শিশু-সুলভ অপরিপক্ব বুদ্ধির পরিচায়ক। আমরা মানব-চরিত্রই চাই, দেব-চরিত্রের কথা শুনতে চাই না। বৈষ্ণব-জীবনী সে হিসাবে সম্পূর্ণ জীবন-চরিত নয়; দেব-চরিত ও ভক্ত-চরিত। মানুষের পরিচয় সেখানে সীমাবদ্ধ।

চৈতন্য-জীবনী

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেই তাঁর যে-সব জীবনী লিখিত হয় তা লিখিত হয়েছিল সংস্কৃতে, তার মধ্যে মুরারি গুপ্তের ও পরমানন্দ সেন 'কবি-

কর্ণপুরে'র লেখা জীবনী-কাব্য দুটি ও নাটকখানি সুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্‌লায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী হল বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'।

চৈতন্য-ভাগবত—'চৈতন্য-ভাগবত' নানাদিক দিয়েই মহামূল্যবান গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের তিরোধানের (খ্রীঃ ১৫৩৩) পনের বৎসরের মধ্যেই তা রচিত হয়ে থাকবে। বৃন্দাবনদাস এ কাব্য লিখেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহে। তখনো চৈতন্যের অনেক অনুচর-পরিকর: জীবিত ছিলেন; তাঁদের মুখেই তিনি অনেক বৃত্তান্ত শুনেছিলেন, উদ্ভাবনা প্রায়ই কিছু করেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলারই নূতন সংস্করণ চৈতন্য-লীলা, শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তাই ভক্ত-সমাজে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে-সব অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল তা তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল মহাপ্রভুর লীলাপ্রচার। আর সেই সঙ্গে প্রধান গৌরব তিনি দান ক রছেন নিজের গুরু নিত্যানন্দকে।

শ্রীবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন নারায়ণী। বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর পুত্র। নিত্যানন্দের বিপক্ষীয়দের প্রতি তিনি যেমন রুষ্ট, নানা অপবাদকারীর উপর তাঁর তেমনি উগ্র ক্রোধ। বৈষ্ণব কবি হলেও তাঁর কথায় স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট। যেমন,

উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে বলে॥
কোনো পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
আপনাকে গাওয়ায় করিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র-কাছ মাত্র কাছে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল॥
অতএব তারে সবে বলেন শৃগাল।

আবার

উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি মূল জরদ্গব॥

বৃন্দাবনদাসের আপত্তি—লোকে অবতার মানে বলে নয়, শ্রীচৈতন্য ছাড়া অন্য কাউকে অবতার মানে বলে।

চৈতন্য-ভাগবত প্রকাণ্ড গ্রন্থ, কিন্তু মোটের উপর সুপাঠ্য গ্রন্থ। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের বাল্য-জীবনী সম্বন্ধে যে সব তথ্য বৃন্দাবনদাস পরিবেশন করেছেন তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি উপাদেয়। দুরন্ত ছেলে নিমাইকে আমাদের কারও চিনতে দেরী হয় না। এছাড়া 'চৈতন্য-ভাগবতে' সমসাময়িক সামাজিক অবস্থারও আমরা বহু সংবাদ পাই। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ যে কি পূজা ও 'মঙ্গল' গান নিয়ে মেতে থাকত, টোলে কি ভাবে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করত, মুসলমান ধর্ম ও সমাজের প্রভাব হিন্দু সমাজে কিরূপ ছড়িয়ে পড়েছিল,—এসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস এই 'চৈতন্য-ভাগবত'। তাছাড়া, চৈতন্যদেবের নানান্ সহজ স্বাভাবিক জীবন-কথা 'চৈতন্য-ভাগবত' থেকে আমরা শুনতে পাই। মোটের উপর, একালে যাকে আমরা বলি human interest, মানব-রস, 'চৈতন্য-ভাগবতে' তার অভাব নেই। এখানেই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। তাছাড়া বৃন্দাবনদাসের পয়ারও স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল।

চৈতন্য-মঙ্গল—লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল কালানুক্রমে দেখলে চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামে আর একখানা জীবনীও আছে, তা জয়ানন্দের রচনা। সে গ্রন্থ পরবর্তী কালের রচনা (খ্রীঃ ১৫৫০-এর পরে)। লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'রই সুখ্যাতি সমধিক। এ গ্রন্থ পূর্বাপর সমাদর লাভ করেছে, এখনো তা পাঁচালীর মতো গাওয়া হয়। এ জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাস-রচিত জীবনীর তুলনায় আকারে ক্ষুদ্র। তাছাড়া লোচন শ্রীখণ্ডের ও নবদ্বীপের চৈতন্যপন্থীদের অনুবর্তী; তিনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য; এই নরহরিদাস সরকার 'গৌরনাগর' শাখার প্রবর্তক। লোচনও সেই দৃষ্টিতেই চৈতন্যকে দেখেছেন। তাঁর গ্রন্থও মুরারিগুপ্তের সংস্কৃতে লেখা চৈতন্য-চরিতের প্রায় অনুবাদ। কিন্তু কাব্য হিসাবে লোচনের কাব্য উপাদেয় ও সমাদৃত।

চৈতন্য-চরিতামৃত—গুরুত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, মূলত কাব্যরসে তার পরিচয় নয়। সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে যদি কোনো বিশেষ গ্রন্থকে মহৎ বলতে হয়,

তা হলে তা বলতে হবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কে ;—হয়তো বা তার সঙ্গে আর নাম করতে হবে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের। কিন্তু বাঙ্‌লার অন্য কোনো কাব্য বিষয়-মাহাত্ম্যে, অকৃত্রিমতায়, তথ্য-নিষ্ঠায়, সরল প্রাঞ্জল বাক্য-গুণে—দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে—এমন গৌরব অর্জন করতে পারে নি।

চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবের পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ। কিন্তু সেই নরদেহধারী প্রেমাবতারের মানবীয় প্রকৃতি মাঝে মাঝে তাতে সুপ্রকাশিতও হয়েছে। কঠোর সংযমী সন্ন্যাসী ছিলেন শ্রীচৈতন্য। কারণ,

আপনি আচরি ধর্ম সবারে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥

মানব-সমাজের এই সমাজ-নীতি তিনি বিস্মৃত হন নি একবারও। আবার, এই সন্ন্যাসীরই হৃদয়ে মায়ের সম্বন্ধে কী মধুর বেদনা :

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥

এই রক্তমাংসে তৈয়ারী মানুষের স্পর্শটিও কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যে ক্ষণে ক্ষণে লাভ করা যায়।

'চৈতন্য-চরিতামৃত' বৈষ্ণবের চক্ষে মহামূল্য গ্রন্থ হলেও চৈতন্যের জীবন-চরিত তার মুখ্য প্রতিপাদ্য নয়। তার মুখ্য প্রতিপাদ্য সেই চরিতামৃত, প্রেম ও ভক্তিরসের যে বিগ্রহরূপে চৈতন্যদেব আরাধ্য সেই প্রেম ও ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান। চৈতন্যের জীবনী অপেক্ষা যুক্তিতর্ক দিয়ে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠাই ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের লক্ষ্য। এই দুরূহ তত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিকের মতো বা বৈজ্ঞানিকের মতো সূত্রাকারে। সহজ নিরলঙ্কার সুস্পষ্ট সেই ভাষা। কোথাও কোথাও বিষয়ের কাঠিন্যের জন্যই তা দুরূহ, এমন কি প্রায় নীরস। দীর্ঘদিন বৃন্দাবন-বাসের জন্য তাঁর বাক্যে এখানে ওখানে পশ্চিমী হিন্দীর শব্দও দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর এই দার্শনিক বিশ্লেষণ বাঙ্‌লা ভাষার আশ্চর্য শক্তিরও পরিচায়ক। আজিকার চিন্তাশীল বাঙালীরাও এ গ্রন্থ থেকে ভরসা পেতে পারেন—বাঙ্‌লা ভাষার শক্তি সম্পর্কে।

এই বৈষ্ণব-তত্ত্ব চৈতন্যের জীবন ও উপদেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই জীবন-বর্ণনায় অদ্ভুত রকমের সত্যনিষ্ঠ। মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় একশত বৎসর পরে তাঁর এই গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর জীবনলীলার সম্বন্ধে তিনি যে সব তথ্যের অবতারণা করেছেন, তার প্রত্যেকটিরই প্রমাণ-স্বরূপ, কার থেকে তিনি তা জেনেছেন, তাও উল্লেখ করেছেন। এক একটি সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে কঠিন তত্ত্ব এক এক সময়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন কবিরাজ গোস্বামী :

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥

অবিচ্ছেদ্য রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন :

মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ॥

তারপরে সেই প্রসিদ্ধ পার্থক্য বিশ্লেষণ—কাম ও প্রেমের :

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেমনাম ॥

এবং—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥

অথচ—

সেই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের রঘুনাথদাসের শিষ্য ও সেবক ছিলেন। বর্ধমানে কাটোয়ার নিকটে তাঁর জন্ম ; পরিণত বয়সে তিনি বৃন্দাবনবাসী

হন। সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন রূপ ও সনাতন গোস্বামীদের কাছ থেকে। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ, সংস্কৃত 'গোবিন্দ-লীলামৃত' নামে একখানা মহাকাব্যও কৃষ্ণদাস প্রণয়ন করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে যখন চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করতে নির্দেশ দেন তখন কৃষ্ণদাস খুবই বৃদ্ধ। তাঁর ভয় ছিল, হয়তো তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করে যেতে পারবেন না। কবে তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত হয় তা নিয়ে এখনো মতভেদ আছে। তবে মনে হয় তখন সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা হয়েছে ; খ্রীঃ ১৬১৫তে তা সমাপ্ত হয়ে থাকবে। কবি সম্ভবত তখন অশীতিপর, হয়তো বা অশীতি-উত্তীর্ণ। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের 'আদিলীলা'য় নবদ্বীপলীলার বর্ণনা তিনি খুব সংক্ষেপে শেষ করেছেন—ভক্তিনম্রচিত্তে অনুসরণ করেছেন বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে'র কাহিনী। কারণ,

'নবদ্বীপলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।'

'মধ্যলীলা'ও তত বিরাট নয়। এ সকল বিষয়ে কবিরাজ গ্রহণ করেছেন বৃন্দাবনদাসের, মুরারিগুপ্তের ও কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত গ্রন্থের সহায়তা ও স্বরূপ-দামোদরের সাক্ষ্য। আসলে 'অন্ত্যলীলা'য় চৈতন্যদেবের নীলাচলের শেষ সত্তের-আঠার বৎসরের লীলা-বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, সে সময়কার কথা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে স্থান পায় নি। এ সময়ে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। যে পুলক-রোমাঞ্চে, আর্তি ও আকুলতায় সমস্ত বৈষ্ণব গীতিকাব্য শিহরিত, আলোড়িত, বিহ্বল—সেই মহাভাবেরই আভাস পাই এই দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গোস্বামীর মুখে :

কাঁহা কাঁহা যাও কাঁহা গেলে তোমা পাও
তাহা মোরে কহও আপনি।

সুগভীর রহস্যময় সেই অন্ত্যলীলা বর্ণনা করা ও ব্যাখ্যা করা অভাবনীয় ভক্তি ও শক্তি সাপেক্ষ। এই লীলার সাক্ষী রঘুনাথ দাস, স্বরূপ-দামোদর, প্রভৃতি ; কৃষ্ণদাস গুরুমুখে সে-সব কথা শুনেছিলেন। এই লীলা-বর্ণনায়—কি তত্ত্ব-বিশ্লেষণে, কি তথ্য-নিষ্ঠায়, কি আপনার ভাব-মাহাত্ম্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অভাবনীয় সার্থকতা লাভ করেছেন।

গ্রন্থশেষে কবি আপনার যে পরিচয় দিয়েছেন তাও এই মহৎ কাব্য ও মহৎ বৈষ্ণবেরই উপযোগী :

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহ মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ ও বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ ইত্যাদি।

সে কাহিনী যদি সত্য হয় যে এহেন অপূর্ব গ্রন্থ বীর হাম্বীরের দস্যুদল লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল, তাহলে মানতে হয়—সত্যই এরূপ গ্রন্থ-লোপের ভয়ে সেই বৃদ্ধ কবির প্রাণবিয়োগ ঘটতে পারে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ বিলুপ্ত হয় নি, কবির নামও তাই অমর হয়ে আছে; চৈতন্যলীলাও তাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় নি; সর্বোপরি বাঙলার মধ্যযুগের সাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে আছে কবিরাজ গোস্বামীর সুমহৎ কীর্তিতে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'ঃ জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'ও প্রচলিত গ্রন্থ। এটি সাধারণ মানুষের জন্য লেখা, ১৫৭০ খ্রীঃ ১৬০০ খ্রীঃ-র মধ্যেই তা রচিত হয়ে থাকবে। তাতে চৈতন্য যোগ-রহস্য-ব্যাখ্যাতা, গোপিনীভাবে নবদ্বীপের নারীরা তাঁর সন্দর্শন-প্রার্থিনী, গোপন আরাধিকা। চৈতন্যের তিরোধানের সম্বন্ধেও একটি নূতন কাহিনী আছে, কিন্তু তা প্রামাণিক বলে গৃহীত হয় নি। জয়ানন্দের কাব্যও পাঁচালী করে গাওয়া হত; মন্দারন, মল্লভূমি অঞ্চলে তার চল ছিল। জয়ানন্দ নিজেও ছিলেন সে অঞ্চলের লোক। কিন্তু এ গ্রন্থের কাব্যগুণ বেশি নয়।

'গোবিন্দদাসের কড়চা'ঃ 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙলা বৈষ্ণব-সমাজে বিষম মতভেদ আছে। মাত্র ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ এই বই প্রকাশিত হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই বিবরণকে সত্য সত্যই চৈতন্যের ভৃত্য ও সেবক গোবিন্দদাস কর্মকারের লিখিত বিবরণ বলে গ্রহণ করেন। বাঙলার বৈষ্ণবমণ্ডলী তেমনি একে জাল বলে প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, এই বিবরণীর ভাষা আধুনিক। বিবরণেও একালের মানুষের হাত পড়েছে;—চৈতন্য চরিতামৃতের সঙ্গে তাল রেখে তা রচিত। কিন্তু তথাপি মনে হয়—এর

গোড়ায় হয়তো কিছু সত্য ছিল। অন্তত মহাপ্রভুর তিরোধান ও তাঁর দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভ্রমণকালীন বৎসর দু'একের কথা এ 'কড়চা'য় যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা বৈষ্ণবদের গ্রাহ্য না হলেও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে অবিশ্বাস্য নয়। 'কড়চা'য় প্রচার-প্রবৃত্তি ও লীলা-বর্ণনার বাড়াবাড়ি নেই। আধুনিক মানুষের হাত যদি পড়ে থাকে, তা হলেও বলতে হবে—এই আধুনিক মানুষ লোভ সামলিয়েছেন খুব। (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেন)

আশ্চর্য কথা এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে আর কেউ চৈতন্য-জীবনী লিখলেন না ; অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনীই সেই সময়ে লেখা চলল। আরও একশত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' অবলম্বন করে প্রেমদাস রচনা করেন 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী'। তাঁর আসল নাম ছিল পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। আর তিনি 'বংশীশিক্ষা' নামে আর একখানি জীবনীকাব্যও রচনা করেন ; তখন বৈষ্ণব গুরুদের জীবনী-বিবরণ লেখা বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সুপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য ভক্ত-জীবনী

চৈতন্যের জীবনীর মধ্যেই তাঁর প্রধান পারিষদ্ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কথা বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত। এর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হয়েছে অদ্বৈত আচার্যের আর তাঁর পত্নী সীতাদেবীর জীবনী।

অদ্বৈত-জীবনী : শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ পরিণত বয়সে অদ্বৈত আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসারত্যাগ করেন। তাঁর নাম হয় কৃষ্ণদাস। তিনি ১৪০৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৪৮৭) সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন 'বাল্যলীলাসূত্রে'। পরবর্তী কালে শ্যামানন্দ এ গ্রন্থ অনুবাদ করেন 'অদ্বৈততত্ত্ব' বলে। বাঙলায় ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' লাউড়ে লিখিত হয় খ্রীঃ ১৫৬৮-৬৯এর দিকে। ঈশান নাগর বাল্যে আচার্যের গৃহেই পালিত হন। তিনি আচার্যের পুত্রের সমবয়স্ক ছিলেন বলে প্রকাশ। ঈশান নাগরের গ্রন্থ সুপরিচিত। অবশ্য এই দুটি গ্রন্থই ('বাল্যলীলাসূত্র' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ') জাল বলেও অনুমিত হয়। না হলে মানতে হবে, 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ক্ষুদ্র হলেও বেশ উপাদেয় কাব্য। তাতে চৈতন্যদেবের জীবনেরও অনেক কথা পাওয়া যায়। হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে'

চৈতন্যদেবের কথাও প্রচুর। সে কাব্য বেশ বড়। চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে তিনি শুধু কবিকর্ণপুরের লেখার কথা উল্লেখ করেছেন; তা থেকে অনুমান করা চলে অন্যান্য জীবনী তখনো লিখিত হয় নি। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য রাধা-রূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণ-রূপে এবং নিত্যানন্দ বড়ায়ি-রূপে দানলীলার অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু সে শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে, চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে; আর ভাবাবেশে চৈতন্য সে অভিনয় শেষ করতে পারেন নি। আর একখানি 'অদ্বৈতমঙ্গল' ছিল শ্যামাদাসের লেখা, তা পাওয়া যায় নি। নরহরিদাসের (চক্রবর্তী) 'অদ্বৈতবিলাস' অষ্টাদশ শতকের রচনা।

অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর ক্ষুদ্র দুখানি জীবনী আছে—বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব' ও লোকনাথ দাসের 'সীতা-চরিত'। দুইখানিতেই সংশয়ের কিছু কিছু কারণ রয়েছে। সীতাদেবী অবশ্য আচার্য-পত্নী, গুরুও। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীও বৈষ্ণব সমাজে গুরু রূপে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার যাই বলুন, শাক্ত বা বৈষ্ণব সাধনায় নারীর স্থান নিচে নয়। কিন্তু সাধারণত বাঙালী সমাজ, বিশেষত উচ্চবর্ণ, স্মার্ত পণ্ডিতদের শাসনেই চলেছে—চৈতন্যদেবের সময়েও, তার পরেও। তথাপি এরূপ নারীজীবনী যে এ-দেশের জীবনী-কাব্যেরও বিষয়বস্তু হয়েছে, তা বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রন্থ দু'খানিতে কৃত্রিমতা থাকলেও এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিষদ্ বংশীবদন চট্ট অন্য দিক দিয়ে ভাগ্যবান। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর প্রপৌত্র রাজবল্লভ তাঁর জীবনী অবলম্বন করে লেখেন 'বংশীবিলাস' (মুরলী-বিলাস)। বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে এ গ্রন্থ মূল্যবান। আবার অষ্টাদশ শতকে প্রেমদাসের 'বংশী-শিক্ষা'ও এঁকেই নিয়ে রচিত। দুই গ্রন্থেই চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও নূতন কথা কিছু কিছু আছে।

শ্রীনিবাসাদির জীবনী: ষোড়শ শতকের জীবনী-কাব্যে যেমন চৈতন্য ও অদ্বৈতই বিষয়বস্তু, সপ্তদশ শতকের জীবনী-কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু তেমনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তম। এই সব কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত অবশ্য নিত্যানন্দদাসের 'প্রেম-বিলাস' (খ্রীঃ ১৬০০-১৬০১)। নিত্যানন্দদাস শ্রীখণ্ডবাসী ছিলেন, আর তাঁর আসল নাম ছিল বলরামদাস; তিনি 'বীরচন্দ্র-চরিত'ও লিখেছিলেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নরহরি চক্রবর্তী

'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসে'র কিছু কিছু জিনিস এই গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 'প্রেম-বিলাসে' প্রক্ষিপ্ত যথেষ্ট আছে। তথাপি বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় এ গ্রন্থ প্রয়োজনীয়। গুরুচরণদাসের 'প্রেমামৃত' এ গ্রন্থের পরে রচিত হয়—শ্রীনিবাস ও তাঁর পুত্র গতিগোবিন্দের বাল্যজীবনী তাতে বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের অন্য দুইখানি বৈষ্ণব জীবনী হল গোপীবল্লভদাসের 'রসিকমঙ্গল' (শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী) ও শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের 'বীররত্নাবলী' (নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের কাহিনী)। তখনকার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গুরুচরণদাসের 'প্রেমামৃত' এবং যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ' (খ্রীঃ ১৬০৭-১৬০৮) আর শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোহরদাসের 'অনুরাগ-বল্লরী'রও বিষয় শ্রীনিবাস। যদুনন্দনদাস অবশ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা এবং রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদক হিসাবেও বাঙ্‌লা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য, তাঁর অনুরোধেই 'কর্ণানন্দ' রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' শুধু শ্রীনিবাসের জীবনী-গ্রন্থ নয়; আরও ব্যাপক তার পরিধি ও বিষয়। নরহরি চক্রবর্তী জীবনীকার হিসাবে আরও খ্যাতিমান। কিন্তু শ্রীনিবাসের জীবনীর মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর'কেও গণ্য করতে হয়। 'ভক্তিরত্নাকরে' নরোত্তম ও শ্যামানন্দের স্থানও গৌণ নয়। তা ছাড়াও নরোত্তমের জীবনী নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন 'নরোত্তম-বিলাসে'। শ্যামানন্দের ছোট দু'খানি স্বতন্ত্র জীবনী আছে আঠার শতকের রচনা। কিন্তু সপ্তদশ শতকের 'রসিকমঙ্গলে'ও তাঁর কথা আছে; 'রসিকমঙ্গল' তাঁর প্রধান শিষ্য রসিকানন্দকে নিয়ে লিখিত, তা পূর্বেই জেনেছি। ওড়িষ্যা অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ইতিহাস সে গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষে বৈষ্ণব-প্রেরণা অনেক দিকে মন্দীভূত হয়ে আসে সত্য। কিন্তু মহাজনদের জীবনী-রচনা বা মহাজনদের গণাখ্যান, শাখা-নির্ণয় প্রভৃতি সমভাবেই চলে; বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে সে-সবের মূল্য আছে, কিন্তু সাহিত্য বলে মূল্য বিশেষ নেই। তথাপি প্রেমদাস, মনোহরদাস ও বিশেষ করে নরহরি চক্রবর্তী সেই বৈষ্ণব ইতিহাসের ধারাকে অব্যাহত রাখেন; অষ্টাদশ শতকের মানুষ হলেও এ জন্যেই এ প্রসঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণীয়।

পদাবলী

আধুনিক কালের (খ্রীঃ ১৮০০) পূর্বেকার বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব জীবনী-কাব্য নয়, মঙ্গল-কাব্য নয়, নানা পৌরাণিক কাব্যও নয়,—সে গৌরব বৈষ্ণব গীতিকবিতা বা 'পদাবলী' সাহিত্য।

সম্ভবত গীতিকবিতাই বাঙালী প্রতিভার নিজস্ব প্রকাশ-পথ। 'চর্যাপদ' থেকে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রোত্তর কাল পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান পরিচয়—বাঙালীর গীতি-কবিতা। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার ধারাও সেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুজদের কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। অবশ্য, পদাবলীর প্রধানতম বিকাশের কাল ছিল এই শ্রীচৈতন্য যুগের দুই শতাব্দীতে (খ্রীঃ ১৫০০-খ্রীঃ ১৭০০); তারপরে সে ধারা গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিশাল এই পদাবলী-সাহিত্যের অনেক পদই ভক্ত ভিন্ন অন্যদের নিকট বিশেষত্ব-বর্জিত, ক্লান্তিকর, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধরাবাঁধা মামুলী দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু সে সব ছাঁটাই করে এমন শুটি পঞ্চাশ পদ আমরা আবিষ্কার করতে পারব, শুধু বাঙ্‌লায় কেন, ভারতের কোনো ভাষার কৃষ্ণ-লীলার কাব্যেই যার তুলনা নেই। আর তারও মধ্যে এমন দশটি পদ আবার আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পারব, বিশ্ব-সাহিত্যের যে কোনো গীতিকবিতার সংকলনে যার স্থান হতে পারে।

'ব্রজবুলি'ঃ কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বন করে গীতিকবিতা রচনা চলেছিল অনেক দিন থেকেই, বিশেষত ভারতের এই প্রাচ্যমণ্ডলে—গৌড়ে মিথিলায়। মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় সেই গীতিকাব্য কিছু কিছু রচনা হয়েছিল জয়দেবের অনুকরণে—সংস্কৃতে ; কিছু খাঁটি বাঙ্‌লায়—চণ্ডীদাসের ধারায়। কিন্তু বেশির ভাগ বৈষ্ণব পদই রচিত হয় একটি মিশ্র ভাষায়, 'ব্রজবুলি'তে। এই ধারার মূল উৎস বলা যায় মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে। ব্রজবুলি যে আসলে ব্রজভূমির ভাষা নয়, মূলত মৈথিল ও বাঙ্‌লা মিশ্রিত ভাষা, আর তার সঙ্গে এখানে ওখানে ব্রজবাসী বৈষ্ণব মহাজনদের প্রভাবে মিশ্রিত হয়েছে এক-আধটি ব্রজভাষার শব্দ,—এই সত্য প্রথম আবিষ্কার করেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ও বিশদ আলোচনা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন।

'ব্রজবুলি'র মতো ভাষার উদ্ভব হল মৈথিল ভাষায় কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতিসমূহ থেকে।

বিদ্যাপতি ঃ জয়দেবের পরে পূর্ব ভারতে বিদ্যাপতির মতো কবি আর জন্মান নি। পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, আর প্রায় একশত বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। সংস্কৃতে তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। আর অপভ্রংশে তিনি যে 'কীর্তিলতা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। নিজের মৈথিল ভাষায় তিনি রচনা করেন রাধাকৃষ্ণ-লীলার এই-সব পদ। সম্ভবত বিদ্যাপতি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চোপাসক, হর-গৌরীর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অকৃত্রিম। অন্তত বিদ্যাপতির সময়ে চৈতন্যদেব জন্মান নি; তাই রাধাকৃষ্ণ-লীলার গানের সেই আধ্যাত্মিক রূপান্তরও বিদ্যাপতির সময়ে হয় নি। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-লীলাও নর-নারীর প্রেম-মিলন-বিরহের গান; বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণও নর-নারীরই অনুকল্প। দেহ নামক বাস্তব জিনিসটির জন্য সংস্কৃত কবিদের মনে লজ্জা জাগত না; দেহাতীত প্রেমেও তাঁদের কোনো বিশেষ আস্থা বা আগ্রহ ছিল না। বিদ্যাপতিও এই ভারতীয় ঐতিহ্যের কবি, অপূর্ব কাব্যশক্তির ও সঙ্গীতমাধুর্যের অধিকারী কবি। মিথিলা তখন ন্যায়ের প্রধান পাঠকেন্দ্র। বাঙালী ছাত্ররা সেখানে ন্যায় অধ্যয়ন করতে যেতেন, বিদ্যাপতির পদাবলী শুনতেন, মুগ্ধচিত্তে স্বদেশে তা নিয়ে ফিরতেন। তখনো মৈথিলী ও বাঙ্‌লা ভাষার পার্থক্য দুস্তর নয়। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে বিদ্যাপতির পদ তাই বাঙ্‌লায় বিস্তৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালেই দেখি—মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাঙ্‌লার কবি বলেই বাঙালীর নিকট পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মৈথিল পদসমূহ যে মৈথিলীতে রচিত তাও পরে আর কেউ মনে করেন নি। বিদ্যাপতির রচনা-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যাপতির অনুকরণে বাঙালী পদকর্তারাও অনুরূপ ভাষায় পদ-রচনায় মেতে উঠলেন,—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ব্রজবুলিতে লেখেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। বাঙালীর লিখিত এই অনুকৃত কাব্যভাষায়ও যে বাঙ্‌লা ভাষার প্রভাব পড়বে তা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এ ভাষা যে খাঁটি বাঙ্‌লা নয়, তা সকলেই বুঝতেন। মৈথিলী ভাষা অপরিচিত বলে সাধারণ লোকে মনে করে নিলেন—এই বিদ্যাপতির পদের ভাষাই ব্রজভূমির ভাষা, রাধা-কৃষ্ণের শ্রীমুখের ভাষা। তাই এর নামকরণ হয় 'ব্রজবুলি' অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা। কিন্তু 'ব্রজভাষা'র সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি সহজেই বুঝবেন এ ধারণা ভুল। 'ব্রজবুলি'

আসলে ব্রজলীলার মৈথিলী-বাঙ্‌লা-মিশানো কাল্পনিক ভাষামাত্র। অবশ্য রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা ছাড়া অন্য গীতিকবিতাও এ ভাষায় রচিত হয়েছে, এবং বাঙ্‌লার বাইরে নেপালে কামরূপে ওড়িষ্যাতেও এই ব্রজবুলিতে কাব্য-রচনা চলেছিল। তাই, সে সব ক্ষেত্রে এই মিশ্রিত মৈথিলীর সঙ্গে বাঙ্‌লা ছাড়া প্রাদেশিক অন্য বুলিরও ছাপ এক-আধটুকু পাওয়া যাবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠকুর মৈথিলী কবিতা অপেক্ষাও সংস্কৃত অপভ্রংশে কাব্য রচনা করেছিলেন অনেক বেশি; কিন্তু তিনি বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজে বৈষ্ণব-ভক্ত বলেই শুধু গণ্য হন নি, বাঙালী তাঁকে বাঙ্‌লার কবি বলেই জানত। আর যিনি বাঙ্‌লার এত বড় এক কাব্য-ধারার জন্মদাতা তাঁকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের আপনার বলা নিশ্চয়ই সমুচিত।

পদাবলীর সাধারণ রূপ ঃ বিষয় অনুসারে পদাবলীর পদসমূহ সংগৃহীত হয় নি। সে ভাবে ভাগ করলে বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলি চার ভাগে পড়ে (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস); যথা (১) গৌর-পদাবলী : এ-সব পদে চৈতন্য-লীলা বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-লীলারই যে তা নূতন রূপ, এ কথাটি এ-সব পদের প্রতিপাদ্য; তত্ত্ব হিসাবে এই যে নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মহাজনদের মতবাদ ছিল, তা পূর্বেই দেখেছি। (২) ভজন পদাবলী : এ-সব আসলে বন্দনাগীতি, প্রার্থনা-কাব্য, গুরু ও মহাজনদের উদ্দেশ্যে রচিত। (৩) রাধাকৃষ্ণ পদাবলী : পদাবলী বলতে সচরাচর বোঝায় প্রধানত এই ব্রজলীলার কাব্য। এ যে বহুদিনের সুপ্রচলিত একটি ধারা, তা আমরা দেখেছি; কিন্তু তখন এ কাহিনী ছিল আদিরসের বিষয়-বস্তু; চৈতন্যদেবের পর থেকে তা হয়ে উঠল প্রেমভক্তিরসের অপূর্ব আশ্রয়। রাধা আর রাধা নেই, চৈতন্যদেবের তীব্র আকুলতার মধ্য দিয়ে তিনি মানব-আত্মার চিরন্তন বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। অবশ্য, গোপীদের মধুর রস ছাড়াও, কৃষ্ণ-যশোদার আশ্রয়ে বাৎসল্য রস আর গোপ-বালকদের আশ্রয়ে সখ্যরসও এই অধ্যাত্ম-রাগরঞ্জিত কাব্যধারায় স্থান লাভ করেছে। (৪) রাগাত্মিকা পদাবলী : এর প্রাচীনত্ব হয়তো আরও অধিক; 'চর্যাপদে' আমরা এই ধারারই তখনকার প্রথম নিদর্শন দেখেছি বাঙ্‌লায়। আর এ ধারা এসে একেবারে আধুনিক আউল-বাউলের গানে ঠেকেছে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের হাতে এ ধারার এমন কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পেয়েছি যার তুলনা নেই। অবশ্য সাধারণত গুহ্য সাধন-তত্ত্বের বিষয় বলে অনেক সময়ে এ-সব পদ দুর্বোধ্যও।

কিন্তু বিষয় হিসাবে পদাবলীগুলি সাধারণত ভাগ করা হয় নি। পদকর্তাদের নাম বা কালানুযায়ীও তা গ্রথিত নয়। দু-একজন প্রধান প্রধান পদকর্তার পদের অবশ্য স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। নাহলে পদাবলীগুলি আমরা পাই কিছু কিছু বৈষ্ণব অলঙ্কার-নিবন্ধ থেকে ; এবং প্রধানত পাই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের সংগ্রহ-গ্রন্থ থেকে। সেই সব সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রায়ই অষ্টাদশ শতকে সংকলিত। অথচ অষ্টাদশ শতকেই বৈষ্ণব পদাবলী অনেকাংশে একটা ছাঁচে-ঢালা ভক্তিরীতি ও কাব্যরীতি হয়েছে। পদাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ গিয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে, তখনো চৈতন্যের প্রেমোন্মাদনায় তা মঞ্জরিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেই সে প্রেরণা আর ততটা প্রাণোচ্ছল নেই। তবু তখনো সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা, অকৃত্রিমতা, এবং বিশেষ করে, কাব্য-কৌশল সবই তাতে সুপ্রচুর।

পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থসমূহে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীর কবিতাগুলি সাজান হয়েছে বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগ, মানবিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্য, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি অনুক্রমে এবং নায়িকা-বিভাগের নিয়মে বাঁধা নানা পার্থক্য অনুযায়ী—যথা, মানিনী, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, ইত্যাদি। অবশ্য অনেক সময়েই গৌরলীলার পদ দিয়ে তা আরম্ভ। এসব রস-বিশ্লেষণের মূল হচ্ছে রূপ গোস্বামীর সংস্কৃতে লেখা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বল-নীলমণি', এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'। পদসংগ্রহকারীরাও সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ীই পদ সাজিয়েছেন। আসলে পদকর্তারা কেউ কেউ হয়তো খণ্ড কবিতা বা খণ্ডগীত রচনা করেছেন। অনেকে হয়তো ধারাবাহিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাও বর্ণনা করতে চেয়েছেন। আরও অনেকে চেয়েছেন পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের চব্বিশ প্রহরের অষ্টকালিক লীলা যথাক্রমে বর্ণনা করতে। কিন্তু শেষদিকে অনেকে যেন একেবারে রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণ সম্মুখে রেখেই বসেছিলেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে পদ-প্রণয়ন করতে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। ভক্তি অকৃত্রিম হলেও এরূপ রচনায় প্রেরণার স্বচ্ছতা কমে আসবেই ; আর, রচনাতেও ক্রমশই দেখা দেবে কৃত্রিমতা। পদাবলীর অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই সৃষ্টি-লক্ষণ এত চোখে পড়ে।

সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী অবশ্য আজও সংগৃহীত হয় নি ;—এখনো তার সংগ্রহ চলেছে। যা সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা তথাপি সাত আট হাজার। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই দেখি তিন হাজারের উপর পদ সংগৃহীত হয়েছে। পদকর্তার সংখ্যাও তখনি ১৫০এর উপর ; অন্তত ৩ জন তার মধ্যে নারী

কবি, ১১ জন মুসলমান। মধ্যযুগের বাঙালী প্রতিভা যে আপনার প্রকাশপথ চিনে নিয়েছে, তার প্রমাণ একদিকে পদাবলীর এই অজস্রতা; অন্যদিকে উৎকৃষ্ট পদ-সমূহের অমোঘ আবেদন।

চৈতন্য-পর্বের পদকর্তা

রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ ও চৈতন্য-লীলার পদ ভাবে ভাষায় ক্রমেই এত প্রথাগত ও গতানুগতিক হয়ে উঠেছে যে, এই সব পদের অধিকাংশেরই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক পদ থেকে পদকর্তাকে আবিষ্কার করাও তাই দুঃসাধ্য;—অনেক ক্ষেত্রে তা অসাধ্য। কারণ, একই পদে হয়তো বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন ভণিতা পাওয়া যায়; একই পদে দুই-এক সময়ে দুই কবির ভণিতা একই সঙ্গে পাওয়া যায় (যেমন, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ-দাসের); একই নামের পদকর্তাও আছেন একাধিক (যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদাস চক্রবর্তী); আবার কখনো বা কোন্‌টা নাম কোন্‌টা উপাধি তাও অনিশ্চিত (যেমন, কবিশেখর, রায়শেখর, কবিরঞ্জন,—সবই কি দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি? কবিরঞ্জন ও কবিশেখর—কি একই লোক?—'ছোট বিদ্যাপতি'?); এবং একই নামে (যেমন, 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস') যে কত জন লিখেছেন তাও বলা কঠিন,—নূতন পদ বা পদ্যাংশকে কোনো পূর্ববর্তী মহাজনদের পদ বলে চালিয়ে দেবার বা তাঁদের প্রচলিত পদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার ঝোঁকও পূর্বাপরই ছিল। অতএব, বিশেষ প্রসিদ্ধ পদ ও বিশেষ প্রসিদ্ধ পদকর্তা ভিন্ন অন্য পদ ও পদকর্তাদের পরিচয় গ্রহণ সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। (ডঃ দীনেশ সেন পদকর্তাদের একটি তালিকা দিয়েছেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'। বলাই বাহুল্য, তাও অসম্পূর্ণ। ব্রজবুলি ও ব্রজবুলি-পদকর্তাদের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন ইংরেজিতে লিখিত ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে।) একটা জিনিস তবু এই সব পদ থেকে বোঝা যায়—পদের বিশেষ গুণাগুণ থেকে অনুমান করা চলে তা কোন্ শতাব্দীর রচনা (অবশ্য লিপিকাররা তার উপরও ছাপ দিয়ে যান নিজেদের হাতের ও কালের); হয়তো 'পদকর্তা'র পরিচয় থেকেও তা আবার স্থির করা সম্ভব। বিভিন্ন শতাব্দীর এই প্রধান পদকর্তাদের কয়েকটি নামই শুধু জ্ঞাতব্য, অরণ্যে প্রবেশ করে লাভ নেই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অবশ্য প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। তাঁরা দু'জনে দুটি বিশিষ্ট ধারার স্রষ্টা—ভাষায় ও ভাবে। এঁদের পদে চৈতন্যদেবের উল্লেখ থাকবে না, এবং চৈতন্য-প্রভাবেরও ছাপ থাকবার কথা নয়। চৈতন্যদেবের সময় (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) থেকে তাই গণনা করলে প্রথমত আমরা পাই চৈতন্য-সমকালীন মহাজনদের,—যেমন, মুরারি গুপ্ত, যিনি চৈতন্যের প্রথম জীবনীকার (সংস্কৃত ভাষায়); সাত আটটি পদের তিনি রচয়িতা। তিনি গাইলেন 'পিরীতির' জয়!

পিরীতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।

এবং

স্রোত-বিথার জলে এই তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষ চৈতন্য-লীলার প্রথম দিককার পদকার ও প্রসিদ্ধ ভক্ত। 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদ মিশে গিয়ে থাকতে পারে, তাছাড়া নরহরির নামে সহজিয়া পদও রয়েছে, হয়তো শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সহজিয়াদের তা কীর্তি। বাসুদেব ঘোষ লেখেন প্রায় আশীটি পদ, আর তার অকৃত্রিমতা সবজন-স্বীকৃত। বিশেষ করে বাৎসল্যরসের সৃষ্টিতে তিনি কৃতী। বংশীবদন (চট্ট) ছিলেন আর এক সমসাময়িক পদকর্তা। তাঁর পদ ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বংশীদাসের পদ মিশে গিয়েছে। এর পরেই উল্লেখযোগ্য ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের নরহরিদাসের শিষ্য, 'চৈতন্যমঙ্গলের' রচয়িতা লোচনদাস,—যাঁর দু'একটি পদ চণ্ডীদাসের নামেও চলে, লাচাড়ি ছন্দের পরে যাঁর দক্ষ হাতের স্বাক্ষর কেউ ভুল করতে পারে না;

ব্রজপুরে রূপ নগরে রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া লাগিল গোরা গায়।
রূপ-ভাবনা গলায় সোনা ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল পারা বহিছে জগত-আঁধা॥
রূপ-রসে জগত ভাসে এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে মজে দেখিলে মজে কহিলে কেবা জানে॥

এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য বলরাম দাসের নাম। যদিও এ নামেও একাধিক পদকর্তা ছিলেন, তবু তাঁদের মধ্যে যিনি স্মরণীয় তিনি হয়তো এ সময়কারই কবি, আর বাৎসল্যরসের বর্ণনায় এই বলরাম দাস প্রায় অতুলনীয়।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূরে নব-তৃণ-কুশাঙ্কুরে
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আছে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব-তৃণাঙ্কুর আগে রাঙা পায় জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥

কারণ, তা মায়ের মন, এবং বাঙালী মায়ের মন,—কাঁটা যদি ফোটে তবে যারা আগে পাছে যাবে সেই শ্রীদাম সুদামের পায়েই ফুটুক, আমার গোপালের পায়ে যেন না ফোটে।

পদাবলীর অমর কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাস এই ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি, নিত্যানন্দ শাখার ভাবনায় ভাবিত। তাঁর বাড়ী ছিল বর্ধমানে কাঁদড়ায়। গোবিন্দদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মেন, শ্রীনিবাসের শিষ্য, নরোত্তম দাসের সুহৃদ্ রামচন্দ্র কবিরাজের অনুজ ভ্রাতা; শ্রীখণ্ড থেকে তাঁরা তেলিয়া বুধরি গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন।

বাঙ্লা পদকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান চণ্ডীদাসের সঙ্গে, ব্রজবুলির কবিদের মধ্যে যেমন গোবিন্দদাসের স্থান বিদ্যাপতির সঙ্গে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে ও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলীতে অবশ্য তাঁদের অনুকারী নানা পদকর্তার পদ এসে মিশে গিয়েছে—এখনকার গবেষকরা তা অনেকটা যুক্তি-বিচার দিয়ে পৃথক করে নিচ্ছেন। সে সত্য গ্রাহ্য করেই আমরা বলতে পারি বাঙ্লায় চণ্ডীদাসের নামীয় এই সব পদ (তিনি 'দ্বিজই' হোন আর 'দীনই' হোন) এই ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকেই রূপ গ্রহণ করেছে, পরে তার সংখ্যা আরও বেড়েছে। বিদ্যাপতির নামীয় পদাবলীও তখন 'ব্রজবুলি'র পদাবলী বলে গ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে, পরে তার সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু এই দুই কবিই তখন বৈষ্ণব পদরীতির আদর্শস্থল বলে গণ্য। আর এঁদের সেই ধারায়, ভাবে ও ভাষায় যারা

বাঙ্‌লার শিরোমণি তাঁদের মধ্যে একদিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাস, অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস। যে-সব পদাবলী বাঙালীর গৌরব, তার অধিকাংশই হয় চণ্ডীদাসের বা বিদ্যাপতির ভণিতার, নয় জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের ভণিতার। জ্ঞানদাস অবশ্য ব্রজবুলিতেও প্রায় একশত পদ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর উৎকৃষ্ট পদ বাঙ্‌লায়। গোবিন্দদাসের প্রায় সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে রচিত। ছন্দ-ঝঙ্কারে, অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, কবিকর্মের অপূর্ব নিপুণতায় গোবিন্দদাস অতুলনীয়। ভাবগৌরব তাঁর কম নয়; কিন্তু গীতিমাধুর্যই তখন যে কবিত্বের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারা যায়।

সপ্তদশ শতকে এই ছন্দ-কৃতিত্ব ক্রমেই বেড়ে চলল, ভাব-সরসতায় তখন ক্রমশঃ ভাঁটা পড়ছে। সপ্তদশ শতকেও তবু উৎকৃষ্ট পদকর্তার অভাব নেই। গোবিন্দদাসকে ছেড়ে দিলে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হেমলতা দেবীর শিষ্য ছন্দশিল্পী যদুনন্দন দাস। জগদানন্দ ছন্দের কারুকর্মে তাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদাবলীতে কাব্যরসও তলিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য প্রখ্যাত পদকর্তা হলেন শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ দাস (চক্রবর্তী), গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম, শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস (গোপাল দাস), এবং সৈয়দ মর্তুজা (জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ); ও 'পদ্মাবৎ'এর কবি সৈয়দ আলাওল (আরাকান),—যাঁর কবি-প্রতিভা অন্যদিকেও ছিল অসামান্য।

এই কালের কবিরা ছিলেন শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের প্রচারে ও প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ। আর সেই সময়েই বাঙ্‌লার বিচিত্র কীর্তন-পদ্ধতির প্রচলন হয়, বিভিন্ন ধারা ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে; যথা, গরানহাটী, রেনিটী (রাণীহাটী); মনোহরসাহী, ঝাড়খণ্ডী (বা মান্দারণী)। বিশেষ একেকটি ক্ষেত্রের নাম অনুসারে এই সব কীর্তন-পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকেও অবশ্য কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। যেমন, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী। উনবিংশ শতকেও পদাবলীতে মুগ্ধ হয়ে মাইকেল কি লেখেন নি, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' আর রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'? এমন কি, বঙ্কিমও পদ লিখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও চৈতন্য যুগই (১৫০০-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) হল মোটের উপর পদাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ।

পদাবলীর বৈশিষ্ট্য : বৈষ্ণব পদাবলীর মূলকথা ব্রজলীলা, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এ লীলা সমাদৃত। পদাবলীর কাব্য-ঐতিহ্য ভারতীয়

(সংস্কৃতানুগত) কাব্যাদর্শ ও কাব্য-ঐতিহ্য ; ভারতের অন্যান্য ভাষারও প্রধান আশ্রয় তাই। অতএব বাঙালী বৈষ্ণবের যা নিজস্ব তাই শুধু দু'কথায় এখানে আমরা স্মরণ করছি। প্রথম কথা হল—রাধাকৃষ্ণ-লীলা ঠিক এমন করে আর কোনো সাহিত্যে অধ্যাত্ম-সাধনার ভাবময় রূপক হয়ে ওঠে নি। মানব-দেহ ও মানব-প্রাণের এই সহজ ধর্মকে অস্বীকার না করেও দেহের পরিধিকে অতিক্রম করে যায় পদাবলীর প্রণয়ী-প্রণয়িনী। শৈব ও সহজিয়া তন্ত্রের পরিবেশেই হয়তো ও বিকাশ সম্ভব। তন্ত্রের প্রকৃতি-পুরুষ অবশ্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু কৃষ্ণ-রাধা এক একটি মহা-মুহূর্তে নিজেদের ভেদাভেদ ঘুইয়ে এই মধুর রসে এক হয়ে ওঠেন। কামনা-বাসনা কোনোটাই এখানেও অস্বীকৃত হয় নি ; বিলুপ্ত হয় শুধু তার বিচ্ছেদ-বেদনা, আর তাবিলুপ্ত হয় এক সর্বব্যাপী নিঃসীম অন্তরাবেগের মধ্যে। অবশ্য মধুর রস ছাড়াও সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য রসের পদও আছে। কিন্তু পদকর্তাদের চোখে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতের এই সন্ধান, ব্যক্তি-কামনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-কামনার মধ্যে এই জাগরণ, মানব-আত্মার এই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের অভিসার—এই রহস্যটিই বৈষ্ণব পদাবলীর আত্মা। মানুষী প্রেমের ভাগবতী ভক্তিতে এই রূপান্তর-রহস্যকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত সাধনা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ সাধনার পরিণিত হয়তো বৈষ্ণবের পরম বৈরাগ্য, শান্তরস ; কিন্তু সাধনার পদ্ধতি হল আর্তি ও আকুলতা। কান্তরসই হল সব-রসসার। বিশ্বের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে বৈভবে তার যাত্রা, স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ থেকে সুরু করে প্রেমোন্মাদনার ভাবৈশ্বর্যে তার পরিণতি। 'বন-বৃন্দাবন', 'মন-বৃন্দাবন' আর শেষে 'নিত্যবৃন্দাবন'—কোনো বৃন্দাবনই তাই এ সাধনায় মিথ্যা নয়। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' নয়, লক্ষ্য তথাপি বৈকুণ্ঠই। প্রেম-চতুরের বংশী গোপবধূকে ব্যাকুল করে—সমস্ত গৃহকর্মে তার ভুল ঘটে। কিন্তু শুধু দেহটাই বিবশ হয় না, তার প্রাণও ছোটে। আর সেই প্রাণও একা শুধু ছোটে না বংশীবটের দিকে, ছোটে ব্রজের শ্যামলী-ধবলী ; সেই বংশীধ্বনিতে উজান বহে যমুনা, খসে পড়ে গোপবধূর বসন-ভূষণের মতোই সংসারের বন্ধন, সত্তার স্বাতন্ত্র্য-বোধ। তৃতীয় কথা, পদাবলীর ভাষা হল আকুলতার ভাষা। এই আর্তি ও আকুলতার বাহক যে পদসমূহ সেগুলি তাই শব্দপ্রধান কাব্য নয়, সুর-প্রধান সঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলী তাই পড়বার জিনিস নয় ; সুরে তালে ছন্দে রসকীর্তনে তার

সম্পূর্ণতা। এ কথা মনে না রাখলে আজ পড়তে বসে 'ব্রজবুলি'র অনেক পদকে মনে হবে অলঙ্কার-বাহুল্যে অচল, আর অনেক বাঙ্‌লা পদকে মনে হবে হাস্যকর, ভাব-বিলাসিতায় অসম্বৃত, রুচিতে দৈন্যগ্রস্ত। বৈষ্ণব ভক্ত না হলে অবশ্য পদাবলী বা পদকীর্তনের অনেক কিছুই মনে হবে অসহ্য। তবু পদাবলীর তত্ত্ব ও জগতের সঙ্গে এই সাধারণ পরিচয়টুকু রাখলে কাব্যরসিক পাঠকও, ভক্তিতে বিগলিত না হোন, অন্তত তার রসাস্বাদনে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হবেন। বিশেষ করে তাঁকে পরিতৃপ্তি দেবে চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ।

পদাবলীর কাব্যরস: বাঙ্‌লা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই পদাবলীর এক একটি পদের দু'একটি পঙ্‌ক্তিকে আপনা থেকেই আপনার ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ;—তা আর শুধু বৈষ্ণবের গান নেই, রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ও নেই, তা চিরন্তন মানবলীলার স্বাক্ষর বহন করে হয়ে গিয়েছে বিশ্বমানবের গান, তাদের প্রাণলীলার কথা। যেমন, চণ্ডীদাসের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্বরাগে'র উক্তি (রাধার রূপ) :

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।

অথবা : জ্ঞানদাসের সেই অপূর্ব দু'টি 'পূর্বরাগে'র পঙ্‌ক্তি :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

প্রেমের কবিতা এর চেয়ে স্বচ্ছন্দ আর সত্য বোধ হয় হতে পারে না। আরও আধ্যাত্মিক হতে পারে তার ভাব, আরও স্পষ্ট প্রাণোজ্জ্বল হতে পারে তার রূপ, কিন্তু এমন সুস্পষ্ট অথচ এমন সরল প্রেম-বেদনার প্রকাশ কবিতায় আর বেশি নেই। এই কামনা অবশ্য মানবীয় কামনা ; আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মতোই তাও বৈষ্ণব কবিতার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত। কোথাও হয়তো কাব্যালঙ্কারে তা একটু আচ্ছাদিত, অধ্যাত্মভাবে আচ্ছন্ন ; কিন্তু সমস্ত উজ্জ্বল রসের মধ্যে মানব-কামনার সরাগ জ্বালা কোথাও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, প্রায়ই তা দেখা যাবে। তাই তা সর্বসাধারণের ভাষা হয়েছে। যেমন, চণ্ডীদাসের এই পদটি—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

কিংবা চণ্ডীদাসের রাধার এই উক্তি :

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন ॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির—বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর ॥

এবং

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।

আর ভাব-সম্মেলনের এই তন্ময়তা :

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥

বিদ্যাপতি অবশ্য অনেক বেশি অলঙ্কার-বিদগ্ধ কবি। কিন্তু তাঁর পদও সাধারণে নিজস্ব করে নিতে বাধা পায় নি। যেমন,

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা

আর তাই

সোই কোকিল অব লাখ ডাকয়ু লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা ॥

আর রাধার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি :

গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

আর প্রার্থনামূলক এই পদ :

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত রমণী সমাজে।

কিংবা ভাবাবেশের এই অপূর্ব পদ—যা সম্ভবত কবিবল্লভের, যদিও বিদ্যাপতির নামে চলে গিয়েছে—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন ন গেল।

দেহকে না ছাড়িয়েও এখানে বিভাপতির (?) প্রেম দেহাতীত হয়ে উঠেছে—চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদের মতোই।

কিন্তু বিভাপতি অতুলনীয় তাঁর ছন্দ ও সঙ্গীতের জন্যই; ব্রজবুলির কবিদের ছন্দঝংকৃত মধুর পদাবলীও তাই তাঁর বলেই চলে যায়। যেমন, বিভাপতির বলে পরিচিত এই সুপরিচিত পদটি রায়শেখরের :

এ সখি হমরি দুখক নাহিক ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর।
ঝম্পা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্‌ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণয়ে শেখর কৈছে বঞ্চব হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

প্রচলিত পাঠান্তরে ভণিতা পাওয়া যায়—

বিভাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

বাক্যের এই বিদ্যুচ্ছটা আর ছন্দের এই মেঘগর্জনেই যে সেদিন থেকে বাঙলাদেশে কবিতা বর্ষানুরাগিণী আর প্রিয়-অভিসারিণী বিরহিণী হয়ে গিয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পূর্বেই বলেছি এই ধারারই কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ—শ্রীজীব গোস্বামী যাকে কবীন্দ্র বা কবিরাজ উপাধি দেন। কয়েকটি পদে গোবিন্দদাস বিভাপতির নামও নিজের ভণিতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

বর্ষা তাঁরও কাব্যে তেমনি কীর্তিত, বিশেষত বর্ষাভিসার। কিন্তু তিনি জানেন—

সুন্দর কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ আরও অগ্রসর হয়ে যান ছন্দে, অলঙ্কারে, উপমায়।

অঞ্জন-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণ;
তরুণারুণ থলকমলদলারুণ মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ॥

কিন্তু শত উৎপ্রেক্ষার মধ্যেও কবিত্বহীন নয় তাঁর পদ:

যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
হাম অঙ্গ-জ্যোতি হইয়ে তহু মাহ॥

সন্দেহ মাত্র নেই, গোবিন্দদাস কবিরাজই ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবি—আর তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাও প্রচুর।

প্রসিদ্ধ গৌর-বন্দনা:

চম্পক শোণ কুসুম কণকাচল জিতল গৌরতনু লাবণিয়ে।
উন্নত গীম সীম নহি অনুভব জগমনমোহন ভাঙনিয়ে॥

অবশ্য জ্ঞানদাসের দু'একটি পদ অতুলনীয়, আগেই আমরা তা দেখেছি ('রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' ইত্যাদি)। অথবা

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥

এই জন্যই বলরামদাসের গোষ্ঠলীলার পদ কিংবা লোচনদাসের পদও আদরণীয় (বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যা উদ্ধৃত করেছেন অন্য অর্থে):

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আজি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূয়ার ছলনা করি কাঁদি।

পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত ভাব ও রূপ এসব পদ থেকেই আমরা বুঝতে পারি। কেবল চণ্ডীদাস-রামীর পদ ও 'রাগাত্মিকা পদে'র ভাব ও অর্থ

স্বতন্ত্র। পদাবলীরই অন্ত একটি প্রান্তে এই সব পদ ; যে মহাভাবের বশে চণ্ডীদাস গাইতে পারেন :

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা সাধন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

তা একান্তভাবে বৈষ্ণব জগতের নয় ; রূপ বৈষ্ণব জগতের, ভাব স্পষ্ট সহজিয়া সাধনার জগতের। পুরাতন সেই সহজিয়া সাধনাই হয়তো বৈষ্ণব এবং সুফী প্রেরণারও (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ও ডঃ সেনের : বাঃ সাঃ ইতিহাস ৩৭৭।৫ দ্রষ্টব্য)। রসকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

এ শুধু কবিতা নয়, এ আর এক রহস্য এবং এখান থেকে আমরা তাই রাগাত্মিকা পদাবলীর প্রদেশে প্রবেশ করেছি :

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায় বাহিরে রহুক তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড়া হইয়া আয়রে সজনী আঁধার পেরিয়ে আলা॥

এ জগতের যাত্রাপথে প্রথম একটি কথা পাই 'পিরীতি'। বৈষ্ণব পদাবলীরও কথা তাই ;—তারপরে এল 'রসিকে'র ব্যাখ্যা আর শেষে 'সহজে'র। নরহরির (সরকারের ?) ভণিতায়ও সহজিয়া পদ আছে (সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস), কিন্তু চণ্ডীদাসের নামেই চলে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সহজিয়া পদ।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে ইহা বই নাহি আর॥

তারপর—

পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব এ বিনু সকল পর॥

আর—

রসিক রসিক সবাই কহয়ে কেহও রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গোটিক হয়॥

অথবা—

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে ত রসিকরাজ ॥

• • • • •

কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি এলায়ে মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি সম দুঃখসুখক্লেশ ॥

এ সব সহজিয়া পদের কোনো কোনোটি নরোত্তমদাসের রচিত বলেও কথিত হয়; যথা—

'সখি, পিরীতি আখর তিন'।

আর—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ জানিবে কে?
তিমির আঁধার যে হইয়াছে পার সহজ জেনেছে সে।
চান্দের কাছে অবলা আছে সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে কে বুঝিবে মরম তার।

তারপরে এই পরম সুমহৎ ঘোষণা সহজিয়া চণ্ডীদাসের—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।—

মধ্যযুগের কোনো সাহিত্যে মানবতার স্বপক্ষে এতবড় বাণী আর নেই। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে আমরা যে ভাবে-রসে পৌঁছেছি তা খাঁটি সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনার রাজ্য—যার সামাজিক মূল সরল লোক-জীবন। লিখন হিসাবে বা কাল হিসাবেও এসব পদের ঠিকানা নেই;—শুধু পদাবলীর ধারায় এসেছে বলেই এখানে এর উল্লেখ করা হল।

সাহিত্য-রসিক মাত্রই তথাপি জানেন—পদাবলীর অধিকাংশ পদ নৈরাশ্যজনক। প্রথম কারণ, কাব্য এখানেও ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মপ্রচারের ছায়াতেই বর্ধিত। কাব্য তাই আপন দাবীতে বৈষ্ণব কবিদের নিকটও প্রাপ্ত হয় নি—'কবিতার স্বরাজ লাভ' তখনো সুদূর। তাছাড়া কবিরা হয় প্রকাশ করতে চাইছেন বিদ্যাপতির মতো স্বচ্ছন্দানুরাগে প্রেমের দৈহিক সংবেদন-কথা, নয় চণ্ডীদাসের অনুসরণে আর্তি ও আন্তরিক আকুলতার কথা। দুইই কাব্যের উপকরণ; কিন্তু কাব্য হতে হলে দু'এরই চাই

নৈর্ব্যক্তিক রূপান্তর লাভ, নিরাসক্ত কবিচিত্তের রসাভিষেক। তা বৈষ্ণব কবিতায় দুর্লভ, কারণ বৈষ্ণব আর্তির সঙ্গে কবিকর্মের নিরাসক্তি সহজে খাপ খায় না। তাছাড়া, একই রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনীর অতি সুচিহ্নিত কয়েকটি ঘটনা ও ভাবকে নিয়েই এই অজস্র পদ রচিত—তাই পদাবলীতে একঘেয়েমী অবশ্যম্ভাবী। সে একঘেয়েমি আরও বেড়ে যায় রসতত্ত্বের নিয়মে-বাঁধা নির্দেশের জন্য, এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মে-বাঁধা কাব্যরীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতির আতিশয্যে। সেই চোখ বললেই কমল, অঞ্জন, আর মেঘ বললেই কৃষ্ণ, তমালের ডাল, আর ময়ূর, কদম্ব, যমুনার জল—এসব বাঁধাবুলি, আর তার সঙ্গে প্রেম নিয়ে উৎকট বাড়াবাড়ি ও মাতামাতি—স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই ক্লান্তিকর ও হাস্যকর।

পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ : অবশ্য ধর্মবিষয়ক বলেই বোধহয় পদাবলী সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয়েছে। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের জন্যই পদাবলী সহজলভ্যও হয়েছে। পদাবলীর সংকলন-সমূহে রসতত্ত্বের বিভাব অনুযায়ী পদাবলী সাধারণত গ্রথিত হয়েছে। এসব সংকলন অবশ্য পরবর্তী কালের, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর। এ প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধ কয়েকখানা সংগ্রহ-গ্রন্থের কথাও তাই স্মরণীয়। এর মধ্যে প্রথম সংগ্রহ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর (তিনিই কি পদ-কর্তা 'হরিবল্লভ'?)। ৪৬জন কবি ও প্রায় ৩০০ পদ সংগৃহীত হয়েছে বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'তে (খ্রীঃ ১৭০৫এর কিছু পূর্বে)। দ্বিতীয় গ্রন্থ সম্ভবত নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়', তাতে ৩৪০টি পদ আছে। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র'ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সংকলন। কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গোকুলানন্দ সেনের (বা 'বৈষ্ণবদাস' স্বাক্ষরের) সংকলন 'পদকল্পতরু'—'পদামৃতসমুদ্রে'র পরেকার এ সংকলন। বৈষ্ণব সাহিত্যের পক্ষে 'পদকল্পতরু' অমূল্য সংগ্রহ। ১৩০ জন কবির মোট ৩ হাজারের উপর পদ এই গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। গৌরসুন্দর দাসের 'সংকীর্তনানন্দে' প্রায় ৬৮১টি পদ রয়েছে। তার পরেও সংগ্রহের অভাব নেই, পদেরও অভাব নেই।

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

বৈষ্ণব সাধন-শাস্ত্রের ছোট বড় যে-সব রচনা ষোড়শ শতকে পাওয়া যায় তার মধ্যে পদকর্তা ও চৈতন্যের জীবনীকার লোচনদাসের 'দুর্লভসার'

একখানা। কবিবল্লভের 'রসকদম্ব' (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) কাব্যহিসাবেও গ্রাহ্য। সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাত 'রসকদম্বে' প্রবল—'প্রকৃতিভজন', শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের 'সহজ' অনুরাগ, গুরু-মাহাত্ম্য, যোগক্রিয়া প্রভৃতির উল্লেখ থেকে তা স্পষ্ট (এ সব বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ইংরেজিতে লেখা—Obscure Religious Cults, etc., দ্রষ্টব্য)। কবিবল্লভ ছিলেন উত্তরবঙ্গের মহাস্থানের নিকটস্থ অরোড়া গ্রামের লোক। বন্ধু মুকুট রায়ের উৎসাহে ২২টি অধ্যায়ে ২২ রসের বর্ণনা করে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তিসাধনার জগতে অবশ্য প্রধান গ্রন্থ নরোত্তমদাস ঠাকুরের 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা', 'স্বরূপ-কল্পতরু'। নরোত্তমদাস বৈষ্ণব সাহিত্যে এক ভক্তিসিক্ত মাধুরীর আধার। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের গুহ্য-কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রার্থনা, ভজন ও কিছু রাগাত্মিকা পদেরও কবি। ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা তখন ক্রমেই সহজিয়া সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। 'স্বরূপকল্পতরু'র নারীমহিমার শ্লোক কয়টি না হলে এত সুলভ হত না (দ্রঃ সেন : বাঃ সাঃ ইতিহাস, ৪।১৬।১)।

নারী বিনে কোথা আছে জুড়াবার স্থান
সর্বভাবে নারী হতে জুড়াই পরাণ।
পতিভাবে পুত্রভাবে ভ্রাতৃ পিতৃভাবে
স্নেহ-মোহ-সমতা-মমতা-ভাবে সেবে॥

সহজিয়া-প্রভাবিত ছোট-খাট নিবন্ধ ও গ্রন্থের অভাব নেই। মনে রাখা প্রয়োজন, জয়দেব-চণ্ডীদাসেও প্রাক্-চৈতন্য সহজিয়া বৈষ্ণব ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী বৈষ্ণব সাধনায় তাই সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ নানা গুহ্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার, যৌনাশ্রিত যৌগিক সাধনার আকর হয়ে উঠল। সাহিত্যে অবশ্য তারই দান 'রাগাত্মিকা পদাবলী'।

কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ ছিল সংস্কৃতে লেখা। বিশেষ করে রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র তত্ত্ব বাঙলায় অনেকেই সপ্তদশ শতকে পরিবেশন করেন। সে সব অবলম্বন করে বাঙলাতেও ক্রমে গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। 'অনুবাদ' বললে এরূপ অনুবাদের অভাব নেই। যেমন, নন্দকিশোর দাসের 'রসপুষ্পকলিকা', রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' প্রভৃতি। এ সব রসব্যাখ্যা ঠিক কাব্যপদবাচ্য নয়। তবে মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে এ সব গ্রন্থেও খণ্ডপদের উদ্ধৃতি দেখা যায়।

এসব গ্রন্থ অপেক্ষা কাব্য হিসাবে নরোত্তমের প্রার্থনা-মূলক ভজনসমূহ অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের।

কৃষ্ণমঙ্গলের বা ভাগবতের আখ্যান নিয়ে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যধারার যে এই যুগে প্রসার ঘটবে তা সহজেই প্রত্যাশা করা যায়। সত্যিই সেরূপ প্রসার ঘটেছিল। 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল', আর পরে 'গোকুল-মঙ্গল', 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য আসলে যথার্থ মঙ্গল-কাব্য নয়, অনেক সময়েই তা অলৌকিক জীবনীকাব্য মাত্র। এসব কাব্য লৌকিক বা পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্যসূচক আখ্যান নয়। কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্য মাত্র—বাঙ্‌লার কোনো জাতীয় আখ্যানবস্তুর কাব্য নয়; সমসাময়িক মঙ্গল-কাব্যগুলির প্রভাব-বশত এগুলিকেও 'মঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তা ছাড়া, এই ষোড়শ শতকের কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতারা কেউই মালাধর বসুর কীর্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। ষোড়শ শতাব্দীর এসব লেখকের মধ্যে ছিলেন মাধবাচার্য ('কৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা), দেবকীনন্দন সিংহ ('কবিশেখর' উপাধি-ধারী ; কবিশেখরের 'গোপালবিজয় পাঁচালী' 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র অনুরূপ), দুঃখী শ্যামাদাস ('গোবিন্দমঙ্গলের' লেখক)। বাঙ্‌লা দেশের নৌকাখণ্ড প্রভৃতি জিনিস এসব কৃষ্ণমঙ্গলেও সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকেরা সংখ্যায় আরও অধিক, যেমন, কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ 'শ্রীকৃষ্ণদাস' ('শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র কবি), ভবানন্দ বিপ্র পরশুরাম, 'গোবিন্দমঙ্গলে'র যশচন্দ্র, ইত্যাদি। কিন্তু কাব্যপ্রাণ মন্দীভূত হয়ে এসেছিল, বোঝা যায়। ভবানন্দের 'হরিবংশ' শ্রীহট্ট অঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল। আরও খান সাত-আট এমন ধারা গ্রন্থও সেই শতাব্দীতেই রচিত হয়। কাব্য-সম্পদ না থাক, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যথানিয়মে এরূপ কৃষ্ণমঙ্গল-ধারার কাব্য রচিত হয়ে চলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-পর্বের মঙ্গল-কাব্য

মঙ্গল-কাব্যেই বাঙলার জনসাধারণের নিজস্ব কাহিনী ও জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছিল ; চৈতন্য-পর্বে এসে তাতেও কিছু নূতন লক্ষণ দেখা দিল— আর তা শুধু চৈতন্যমঙ্গল বা কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

দেব-সংমিশ্রণ ঃ ষোড়শ শতকের পূর্বেই মঙ্গল-কাব্যের প্রধান দুই ধারা একটা মিশ্রিত রূপ লাভ করছিল। এই দুই ধারাকে মোটের উপর বলতে পারি, লৌকিক ধারা ('বাঙলার বিষয়বস্তু') ও পৌরাণিক ধারা ('সংস্কৃতের বিষয়বস্তু')। লৌকিক ধারাই প্রথম ও প্রধান, এমন কি 'মঙ্গল' কথাটাও হয়তো মূলত অন্-আর্য ভাষা থেকে আগত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, এসব হল তার নানা শাখা,—সেই Matter of Bengal নিয়ে যা গঠিত। পৌরাণিক ধারা হল পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের আখ্যান, অর্থাৎ সেই Matter of Sanskrit World যার অবলম্বন। এ ধারার শাখা হল দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি। এ ধারা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী ; সংস্কৃত চর্চা ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সূত্রে তার বিস্তার ক্রমেই বাড়ে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই এ সব আখ্যান মিশে দানা বেঁধে উঠছিল ; সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পরস্পরের যোগাযোগের ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। দুই বর্গের দেবদেবীর চরিত্র মিলে মিশে গিয়ে শিব, চণ্ডী, প্রভৃতি এক-একটি মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীও মিশ্রিত রূপ লাভ করছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, এই মিশ্রণকে অনেকে সমন্বয় (সিন্থেসিস্) বলে চালাতে চান ; কিন্তু মিশ্রণ মাত্রই সমন্বয় নয়। সমন্বয়ে দুটি পৃথক জিনিস সংঘর্ষের শেষে অখণ্ড হয়ে নূতন আর-একটি জিনিস হয়ে ওঠে। কিন্তু মিশ্রণে দুই জিনিস পাশাপাশিও থাকতে পারে ; কখনো তাদের সামঞ্জস্য ঘটে, কখনো সামঞ্জস্য ঘটে না,—দুই বস্তু একেবারে একত্বলাভ করে না, নূতন-কিছু হয়ে ওঠে না। বাঙালী হিন্দু সমাজেও যা তখন ঘটেছিল তা হচ্ছে বাঁচবার দায়ে এবম্বিধর বর্গে বর্গে মিশ্রণ, সমন্বয় হলে তখন ঐক্যবদ্ধ জাতীয়শক্তিরই জন্ম

হত। কিন্তু ছোট-বড় উচ্চ-নীচে বিভক্ত হিন্দু সমাজ সে পথে অগ্রসর হতে পায় নি। তাদের সাহিত্য-প্রয়াসেও তাই তখন যা ঘটেছে তা হচ্ছে একটা আপোষ-রক্ষা, মিশ্রণমাত্র—সমন্বয় নয়। তাই লৌকিক শিব চাষী, নেশাখোর, কুচুনি-পাড়ায় ঘুরে বেড়ান; পৌরাণিক দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে তাঁকে মিশিয়ে আমরা নিয়েছি। কিন্তু অসামঞ্জস্য কোথাও কোথাও থেকে গিয়েছে বাঙালীর সম্মিলিত দেবতাদের মধ্যেও। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পৌরাণিক শিবের আশ্চর্য মহৎ ধারণা ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হয়ে লৌকিক চাষী-শিবের কাহিনীটিকে আজ কৌতুক ও কৌতূহলের বস্তু করে দিয়েছে। তেমনি লৌকিক চণ্ডীও পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন হতে গিয়েও একাত্ম হয়ে যেতে পারেন নি। সেক্ষেত্রেও দেখছি কালক্রমে পৌরাণিক চণ্ডীরই প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দু-কর্তাদের নেতৃত্বই ক্রমে সমাজে ও সাহিত্যে প্রবল হয়েছে—আপোষ-রক্ষার ফলে।

সকল কাব্যের মতোই মঙ্গল-কাব্যও গাওয়া হত। মঙ্গল-কাব্যের 'মঙ্গল' নাম কেন হল, এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলবার উপায় নেই। কেউ মনে করেন, 'মঙ্গল রাগে' প্রথমে তা গাওয়া হত। 'মঙ্গল-গীতি' শব্দটা জয়দেবেও আছে, কিন্তু মঙ্গল রাগের সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। কেহ অনুমান করেন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হত, তাহারই সাধারণ নাম ছিল 'মঙ্গল'। এখনো মালয়ালাম ভাষায় বিবাহ অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর, 'মঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষার নয়, এ হল অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত। মঙ্গল নামক দৈত্যকে চণ্ডী বধ করেন, তাই চণ্ডীমঙ্গল কথার উৎপত্তি,—এ কথা সম্ভবত পরবতী উদ্ভাবনা। এক মঙ্গলবার থেকে আর-এক মঙ্গলবার এই আট দিন ধরে গাওয়া হয় বলে 'অষ্টমঙ্গলা' নাম, এটিও হয়তো আর একটি পরবতী উদ্ভাবনা। অন্য দিকে, 'জাগরণ' নামে একটি কথাও আছে; চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের পালা-সমূহের মধ্যে এক একটি অংশ আছে যার নাম 'জাগরণ'। সাধারণ ভাবে অনুমান করা চলে যে, সে অংশটি রাত্রি জেগে গাওয়া হত। হয়তো সেই পালাটিরই গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক; তাই সমগ্র ভাবেও মঙ্গলকাব্যকে কখনো কখনো 'জাগরণ' বলা হয়।

চৈতন্যদেবের পূর্বে শুধু নয়, তাঁর পরেও মঙ্গল-কাব্যের নিজস্ব ধারা অব্যাহত চলেছে। সাহিত্যে সেই রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী বা মধুর-সখ্য-বাৎসল্য

প্রভৃতি রসের প্লাবন যত তুলুক, পদাবলী ও জীবনী কাব্য বাঙালীকে যত ঐশ্বর্য যোগাক; সুচিরবহমান মঙ্গলকাব্যের ধারাও সমতাবেই চৈতন্ত ও চৈতন্যোত্তর যুগেও প্রবাহিত হয়েছে। আজ আমরা যতই চৈতন্যদেবকে বাঙালী রিনায়সেন্সের উৎসক্ষেত্র বলে প্রচার করি না কেন, নবদ্বীপের ও বাঙলার বৃহৎ হিন্দুসমাজের কাছে সেই প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসীর তত্ত্ব ও সাধনা সে যুগে সর্বগ্রাহ্য হয় নি, তারপরেও হয় নি,—ডঃ সুশীলকুমার দে'র এই কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (ডঃ দে'র ইংরেজিতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০০-১৮২৫, পৃঃ ৪৪৮।৪৪৯ ও প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম ও আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য দ্রষ্টব্য)। সেই সমাজ চলত স্মার্ত পণ্ডিতদের পরিচালনায় এবং মুসলমান সুলতানদের রাজনৈতিক শাসন মাথা পেতে মেনে নিয়ে, আর তার উচ্চবর্গেরা কেউ কেউ ফার্সি লিখত, সংস্কৃত চর্চা করত, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙলা মঙ্গল-কাব্যই ছিল সমাজের উচ্চ-নীচের গ্রাহ্য কাব্য। বাস্তবচিত্রের ঐতিহ্য তাতে তাই কতকটা রক্ষিত হয়েছে।

চৈতন্য-প্রভাব: তবে চৈতন্য-পর্বে এসে প্রথমাবধিই মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর কাব্যেও নূতন লক্ষণ দেখা দিল। এসব কাব্যে ভক্তি পূর্বযুগেও ছিল, কিন্তু সে ছিল আতঙ্কগ্রস্ত ভক্তি, স্বৈরাচারী ভাগ্য-বিধাতার নিকটে মানুষের ভয়-মিশ্রিত ভক্তি। স্বেচ্ছাচারী প্রভুশক্তির মতোই স্বেচ্ছাচারী দেবদেবী, অধিকার-হীন শাসিতের মতোই উপায়-হীন উপাসক,—সহজেই তারা তাই মেনে নেয় 'বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি', এবং সামন্ত প্রভুর মতোই দেবতাও তুষ্ট হলে শাসিতের ভাগ্যও খোলে। এই ভাবেই ভয় প্রথমে পরিণত হয় এক জাতীয় সকাম ভক্তিতে। ব্রতকথায় মেয়েরা নানা লৌকিক দেবদেবীর এই সকাম এবং স্বাভাবিক পূজা বরাবরই করতেন। সেই ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গল-কাব্যের একটা সম্পর্কও তাই থেকে গিয়েছে। পূর্বাগত কাহিনীর সেই বিভীষিকাময় স্বেচ্ছাচারের কাঠামো পরেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেই ভয়ভক্তির মধ্যে চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগে দেখা দিল দাস্যরসের একটা স্থির নম্রতা। তাতে আর হীনতাবোধ নেই; বরং আছে আচার, বিনয়, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সখ্য, প্রভৃতি মানবী গুণগ্রামের একটু নূতন স্পর্শ। এইটিই চৈতন্য-পর্বের বাঙলা সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ, বলতে পারি চৈতন্য-পরবর্তী কালের মূল লক্ষণ;—রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকেও এই ভক্তি-বাহুল্য আচ্ছাদিত

করে। কিন্তু কথা হিসাবে আমরা সেই একই আখ্যায়িকা নিয়ে রচিত মঙ্গল-কাব্য পাই—মূলত সেই বেহুলা-লখাইয়ের কথা, সেই কালকেতু-ফুল্লরার কথা, ইত্যাদি। তাতে বিশেষ নূতন কিছু কেউ যোগ করে না; যা নূতন জোটে তাও বৈশিষ্ট্য-হীন। কবিত্বের দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য কোথায়? আখ্যায়িকা বৈচিত্র্য-হীন, কবি-কলা গতানুগতিক, এমন কি, বাস্তব গৃহ-চিত্রও বৈশিষ্ট্যহীন।

পুঁথির অবশ্য এ কালে আর তত অভাব নেই। লৌকিক ও পৌরাণিক দুই ধারার মঙ্গল-কাব্যই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যথেষ্ট মিলে। প্রথম দিকে মিলে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি; হয়তো শিবায়নও ছিল। তবে ধর্মমঙ্গল সপ্তদশ শতকে যথেষ্ট রচিত হলেও ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবিরা অষ্টাদশ শতকের মানুষ। এসব পুঁথির মধ্যে যেগুলি সত্যকারের সাহিত্য পর্যায়ে উঠেছে সেগুলিরই সঙ্গে শুধু পরিচয় করা প্রয়োজন। ভাগ্যক্রমে, এই পর্বে তেমন কাব্যও আছে। আর মঙ্গল-কাব্যেও সেরূপ একটি প্রতিভার পরিচয় অন্তত এখনও অম্লান, তা আমরা দেখতে পাব।

মনসা-মঙ্গল

একালের মনসামঙ্গলের রচয়িতাদের মধ্যে নানা কারণেই প্রথমে উল্লেখযোগ্য (ষোড়শ শতকের) বংশীবদন (বা বংশীদাস) চক্রবর্তী। ইনি পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার অধিবাসী। গ্রন্থ রচনায় তিনি কন্যা চন্দ্রাবতীর সাহায্য পেয়ে থাকবেন। অন্য কোন কারণে না হোক, অন্তত এই মেয়ের নামেই বংশীদাস চিরজীবী। কারণ, চন্দ্রাবতী প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারী, তাঁর করুণ ও শ্রীময় জীবনের কথা আমরা এখনও পড়তে পারি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সংগৃহীত পল্লীকাহিনীতে। বাল্যে তিনি বাগদত্তা হন জয়চন্দ্র নামে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ-কুমারের সঙ্গে। বাল্যের সেই সখ্য কৈশোরের অনুরাগে পরিণত হতেই জয়চন্দ্র এক মুসলমান-কন্যার প্রণয়াসক্ত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন, তাঁকে বিবাহ করলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী রইলেন চিরকুমারী, তাঁর জীবন গেল রামায়ণ ও রূপকথার অনুরূপ গাথা রচনায়। মৈমনসিংহের পল্লীগাথায় চন্দ্রাবতীর এই কাহিনীটি সুপরিচিত। আর চন্দ্রাবতীই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি বলে প্রসিদ্ধ।

এ পর্বে মনসামঙ্গল কাব্যেরই আর একজন কবি ছিলেন মৈমনসিংহ অঞ্চলের নারায়ণ দেব। তাঁর গ্রন্থ কিন্তু পশ্চিম বঙ্গেও প্রচলিত। যে কারণেই

হোক, দেখতে পাই—বরাবরই মনসামঙ্গল ও মনসার ভাসান গান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই অধিক প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তাই চট্টগ্রামে, শ্রীহট্টে ও উত্তর বঙ্গেই বেশিসংখ্যক মনসামঙ্গলের কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গলের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন 'কেতকাদাস'-ক্ষেমানন্দ (কেতকাদাস বলেও তিনি আপনার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল সযত্নে সম্পাদিত করেছেন, তা দ্রষ্টব্য)। কেতকাদাস সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক; তাঁর কাব্যই এখন পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। দক্ষিণ-রাঢ়ে দামোদর তীরে ছিল ক্ষেমানন্দের বাড়ী। কিন্তু গ্রামে অরাজকতা হলে তাঁকে গ্রামত্যাগ করতে হয়। মধ্য যুগের অনেক কবিরই মুখে এ ধরণের কথা শুনি। যাই হোক, পথে মুচির মেয়ের বেশে কবির সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন মনসা দেবী। কবিকে তিনি বললেন মনসামঙ্গল রচনা করতে। স্থানীয় অরাজকতা (অনেক সময়ে মুসলমানের অত্যাচার) আর তারপরে দেব-দেবীর নির্দেশ-মতো তাঁদের মাহাত্ম্য রচনা—এটি প্রায় নানা মঙ্গল-কাব্যের কবিরই একটি সুপরিচিত 'জবান'। হয়তো এসব অত্যাচারের কথা খানিকটা সত্য, এবং খানিকটা একটা প্রথা-মতো মামুলী 'সাফাই'; কিন্তু এসব জবানীর মধ্যে দিয়ে আমরা কবির পরিচয় ও কতকটা তাঁর কালের পরিচয় সমস্ত মামুলী কথার আড়ালেও সময়ে সময়ে পাই। অন্তত ধর্মমঙ্গলের বেলায় দেখতে পাই—ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর থেকে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মমঙ্গলের কবিদের আত্মকাহিনীই বেশি চিত্তাকর্ষক।

চণ্ডীমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের দিক থেকে দেখলে ষোড়শ শতাব্দী আসলে মনসামঙ্গলের যুগ নয়, চণ্ডীমঙ্গলের যুগ। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী একালে সর্বাধিক প্রসার লাভ করেছে, আর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা লাভ করেছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'কবিকঙ্কণে'র শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গলকাব্যে'।

'মঙ্গলচণ্ডী' দেবীঠাকুরাণীর জন্মকথা অবশ্য সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় নয়, আখ্যানগুলিই আলোচ্য; কিন্তু বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এ দেবীর জন্মকথার গুরুত্ব আছে। এ বিষয়ে ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ভাণ্ডারকর মহাশয় সাধারণ ভাবে শক্তি-দেবতাদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তাই প্রযোজ্য: বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থায় বিভিন্ন দেবদেবী কল্পিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী

কালে হিন্দু মনের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সে-সব দেবীকে বিশেষ একজন দেবীর সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে। কালকেতু-কাহিনীর চণ্ডী হচ্ছেন শিকারী ও পশুদের দেবী। এ দেবী যে রাঁচি পাহাড়ের ওরাওঁদের চাণ্ডীটাঁড়ের যুদ্ধ ও শিকারের চাণ্ডীদেবী, অথবা তাঁরই সগোত্রা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের লেখা ওরাওঁদের বিবরণ থেকে তাই মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গের ওরাওঁ-গোষ্ঠীর শিকারোপজীবী মানুষেরা আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন, তাঁদের দেবতাকেও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। ধনপতি-শ্রীমন্ত কাহিনীর 'চণ্ডী' প্রথমে ছিলেন এ চণ্ডীর থেকে স্বতন্ত্র; তিনিই হয়তো 'মঙ্গলচণ্ডী'—অমঙ্গলের দেবতাকে বিপরীত নামে অভিহিত করাও হিন্দুদের আর একটা রীতি। মঙ্গল নামে অসুর বধ করার জন্য তাঁর এ নাম, এবং মঙ্গলবারে তাঁর পূজা ও ব্রত হত, ইত্যাদি কাহিনী হয়তো পরবর্তী কালের (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের) সংযোগ। যাই হোক, এ মঙ্গলচণ্ডী ইতিহাসের আর এক স্তরের দেবী,—তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশ-যাত্রা অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তার আগে হয়তো তিনিও ছিলেন এক লৌকিক দেবতা—একদিকে লৌকিক বৌদ্ধধর্মে তিনি 'আদ্যা' হয়ে উঠলেন—নিম্নবর্গের মধ্যেও স্ত্রী-সমাজে মন্ত্রতন্ত্রের জন্য ডাকিনীদের প্রতি ভীতিভক্তি কম ছিল না (খুল্লনা তাই নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা); কিন্তু উচ্চস্তরের পুরুষ সমাজে সহজে তিনি শ্রদ্ধালাভ করেন নি (ধনপতি তাই তাঁর ঘট ঠেলে বাম পায়, 'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি')। অন্য দিকে তান্ত্রিক হিন্দু দেবীরাও, শক্তি-দেবীরাও, এসে সেই চণ্ডীদু'টির সঙ্গে মিলতে লাগলেন। এই দুই কাহিনীর দুই চণ্ডী তবু একেবারে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেন নি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি নানা কালের পুরাণ উপপুরাণ দুই দেবীকে তৃতীয় দেবী—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহিষমর্দিনী, শিবশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে দিতে চেষ্টা করে মাত্র দেবীদের একত্র করেছে, তাই দুই লৌকিক চণ্ডী একত্র রয়েছেন; কালকেতু-কাহিনী ও শ্রীমন্তের কাহিনী একসঙ্গে চলেছে। অন্তত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্বেই যে এই প্রক্রিয়া সমাজে সাধিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র একাধিক উক্তিই তার প্রমাণ; শ্রীধরকে চৈতন্যদেবও বলছেন:

দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥

অনেক পূর্বেই হয়তো চণ্ডী উচ্চবর্গের জগতেও পূজার অধিকার লাভ করেছিলেন। তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন তাই এক মঙ্গলবার থেকে আর এক মঙ্গলবার পর্যন্ত মঙ্গলচণ্ডীর পূজার ব্যবস্থা না দিয়ে পারেন নি (দ্রঃ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত', ভূমিকা ১।•)।

দুই কালের দুই স্তরের দুই দেবী ও দেবী-কাহিনী একসঙ্গে মিশে গিয়ে আবার উচ্চতর শ্রেণীর দ্বারা তাদের প্রসিদ্ধা আরাধ্যা পৌরাণিকী দেবী দুর্গা ও চণ্ডীর সঙ্গে যখন একীভূত হল, তখনি 'চণ্ডী' নামে দেবীরা গ্রাহ্যা ও ভূষিতা হয়েছেন। অমন মহিষমর্দিনী দুর্গাও যখন বাঙালীর কল্পনায় কন্যা হয়ে গেছেন, তখন এই ভয়ঙ্করীর মধ্যেও শান্তা, কল্যাণী দেবীরা যদি মিলে যায়—লক্ষ্মী ও সরস্বতীও এসে মিশে,—তাতে আর আশ্চর্য কি ? (দ্রঃ— সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত', ভূমিকা।) কিন্তু লৌকিক দেবীদ্বয় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেও কাহিনী দুটি সর্বাংশে এক হয়ে যায় নি ;—দুই কাহিনীর ঠিকমতো সঙ্গতি ঘটে নি, এ-কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ঘরের ব্রতকথা হিসাবেই বোধহয় প্রথমত চলত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র এই লৌকিক দেবী চণ্ডীর আখ্যায়িকা, এখনো 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' সুপ্রচলিত। এই ব্রতের কথাবস্তুই ক্রমে যথেষ্ট গৌরব অর্জন করে ;—অবশ্য সে যুগটা ইতিহাসেই অন্ধকার। পালা গানের আকারে তারপর তা দেখা দিল, প্রাচীন পুঁথি-সমূহ লেখা হল। প্রথমত আট রাত্রি ব্যাপী চলত সেই গীত। উত্তর বঙ্গের মালদহে প্রচলিত পাঁচালী গান থেকে এখনও সেই সব পালার কাঠামো কতকটা অনুমান করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী

মনসামঙ্গলের কাহিনীর তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দীর্ঘ, তাতে বৈচিত্র্য অধিক, আর এ দেবী মনসার মত তেমন ক্রোধ-বিদ্বেষ-বিরোধে দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানহীনা ক্রূরচরিত্রা নন। আসলে চণ্ডী ভয়ঙ্করী না থেকে ক্রমেই ক্ষেমঙ্করী হয়ে উঠেছেন,—ভক্তদের তিনি পরীক্ষা করেন কৌতুকে, কিন্তু রক্ষা করেন আপনার দয়ামায়ার বশে। কাজেই তাঁর ভক্ত সাধারণ মানুষেরও চাঁদ বেণের ও বেহুলার মতো তেমন অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। তাঁরা সাধারণ মানুষ—যদিও তাঁদের চারিদিকে দেবী-মাহাত্ম্যের অলৌকিক জগৎ।

কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরা রাজপুত্র-রাজকন্যা নয়—সামান্য ব্যাধ, মাংস বিক্রয় করে তারা খায়। এরা হল দেবীর মাহাত্ম্যের বাহন। দেবীও যে সমাজের কোন্ স্তরের মানুষের আরাধ্যা, তা হয়তো এ থেকেই বোঝা যায়। অবশ্য সমস্ত কাহিনীর মতোই কালকেতু ও ফুল্লরা আবার শাপভ্রষ্ট দেব-দম্পতি বা তাঁদের অনুচর বলে কল্পিত, তা বলাই বাহুল্য। স্বর্ণগোধা রূপে দেবী ধরা দিলেন কালকেতুর নিকটে। কালকেতু চলে গেলে, একা ঘরে তিনি অপরূপা তরুণী হয়ে বসে রইলেন। ফুল্লরা এসে দেখে অবাক। কোথা থেকে এল এ মেয়ে, কার স্ত্রী? দেবী বলেন, ঘরে তাঁর বড় অশান্তি; আর কালকেতু তাঁকে বন থেকে নিজগুণে বেঁধে এনেছে—তিনি এখানেই থাকবেন। বুদ্ধিমতী ও পতিপ্রাণা স্ত্রীর মতোই ফুল্লরা বিষম বিপদ গণলেন। সুন্দরীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন; কিন্তু সুন্দরী নড়েন না। এলো তখন কালকেতু—সৎপ্রকৃতির মানুষ; সেও সুন্দরীকে দেখে অবাক। যত সে সুন্দরীকে বলে চলে যেতে, মেয়েটা কিছুতেই নড়ে না। শেষে তাদের সাধুতায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বরূপ প্রকাশ করলেন দেবী। একটি মূল্যবান অঙ্গুরী তাদের আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন। অঙ্গুরী বিক্রয় করতে কালকেতু হাটে গেল। সহজে কি দাম দেয় বেণেরা! তবু বিক্রয় করে দাম নিয়ে কালকেতু নূতন রাজ্য পত্তন করলে। নানা জাতির লোক এল বসতি করতে সেখানে। এল ধূর্ত কায়স্থ ভাঁড়ু দত্ত। কালকেতুব নিকটে আসর জমিয়ে বসে প্রজাদের উপর সে করে অত্যাচার। কিছুদিন পর কালকেতু তা বুঝতে পেরে ভাঁড়ু দত্তকে নির্বাসিত করলে। ভাঁড়ু তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাজাকে উত্তেজিত করে যুদ্ধ বাধাল। কালকেতু যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়ে এক স্থানে লুকিয়ে রয়েছে—সে খবর ফুল্লরার কাছ থেকে ছলনা করে সংগ্রহ করে ভাঁড়ু দত্তই কালকেতুকে আবার ধরিয়ে দিলে। শত্রুর কারাগারে কালকেতুর উপর অশেষ নির্যাতন চলল। কালকেতু স্মরণ করলে দেবীকে। দেবীও দেরী করলেন না। রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। তারপর সকল বিপদ থেকে মুক্ত ব্যাধরাজ কালকেতুর নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন আর শান্তিতে রাজত্ব করা। এই হল প্রথম উপাখ্যান—এর থেকে বাস্তব চিত্রের ও চরিত্র-চিত্রণের উপাদান সংগ্রহ করেছেন কবিরা।

দ্বিতীয় উপাখ্যান এ তুলনায় ছক-কাটা। সেই বেণে, বাণিজ্য-যাত্রা আর সুয়ো-দুয়োর মত সপত্নীব গঞ্জনার কাহিনী। উজানীর বণিক ধনপতির

প্রথমা স্ত্রী লহনা,—লহনা নিঃসন্তানা। পরিণত বয়সে খুল্লনাকে দেখে ধনপতি তাই যখন বিমুগ্ধ হলেন, অমনি বিবাহও করলেন, কারণ তাঁর পুত্র নেই। কিন্তু রাজার আদেশে যেতে হল তাঁকে বাণিজ্য-যাত্রায়। এদিকে সপত্নী লহনা দাসী দুর্বলার পরামর্শে খুল্লনার উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে। তাই মাঠে ছাগল চরাতে পাঠাল সে খুল্লনাকে। খুল্লনা সেখানে বনের মধ্যে অন্য মেয়েদের দেখল মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে। সেও সে পূজা শিখল। এদিকে ধনপতিও ফিরে এলেন। কিন্তু শীঘ্রই আবার যেতে হল তাঁকে সিংহলে বাণিজ্যে। তখন খুল্লনার সন্তান-সম্ভাবনা। ধনপতি সিংহলের পথে দেখলেন 'কমলেকামিনী'—পদ্মের উপর বসে এক ষোড়শী তরুণী একটি আস্ত হাতীকে গ্রাস করছেন আবার উদ্গীরণ করছেন। এ কাহিনী সিংহলের রাজাকে তিনি বললেন। কিন্তু রাজা তা দেখতে চাইলে তিনি আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারলেন না। রাজা তাঁকে নিক্ষেপ করলেন সিংহলের কারাগারে। এদিকে খুল্লনার পুত্র হয়েছে; তার নাম শ্রীমন্ত। সে বড় হয়ে উঠল, শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে উপযুক্ত হল। সে তখন চলল পিতার সন্ধানে সিংহলে। পথে সেও দেখল সেই 'কমলেকামিনী'। আর সেও আবার রাজাকে দেখাতে নিয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে পারল না সেই অদ্ভুত দৃশ্য। সবই দেবীর মায়া। শ্রীমন্তও আবার কারারুদ্ধ হল। কিন্তু এবার ভাগ্য-বিবর্তন—উজানীতে খুল্লনা পতিপুত্রের মঙ্গলার্থে দেবীকে স্মরণ করেছেন। অতএব, দেবী চললেন বৃদ্ধাবেশে সিংহলের রাজার নিকটে তাঁদের প্রাণভিক্ষা করতে; তাতে ফল হল না। এদিকে রাজা শ্রীমন্তকে মশানে শূলে চড়াচ্ছেন। তখন দেবী ভূত, প্রেত, পিশাচ নিয়ে আবির্ভূতা হলেন রাজার বিরুদ্ধে। রাজা পরাজিত হলেন, বুঝলেন দেবীর মাহাত্ম্য। তারপরে জানা কথাই—রাজকন্যাকে বিবাহ করে শ্রীমন্ত পিতা ধনপতিকে নিয়ে ফিরল খুল্লনার কাছে উজানীতে। এই হল দ্বিতীয় উপাখ্যান।

কবি-পরিচয়—চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম রচয়িতা ছিলেন মাণিক দত্ত;—সম্ভবত মধ্য যুগেরই প্রাক্চৈতন্য পর্বের লোক। তার পরেকার কবি হলেন মাধবাচার্য—সপ্তগ্রামের (হুগলী) লোক; ইনি আকবরের সমকালবর্তী, খ্রীঃ ১৫৭০-এর লোক। চণ্ডীমঙ্গল ছাড়াও মাধবাচার্যের নামে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' এবং 'গঙ্গামঙ্গলও' পাওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় এক মাণিক দত্তের নামে মাত্র একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি আছে; উত্তরবঙ্গেই তা পাওয়া যায়। সেই পুঁথিতেই আবার অন্য (প্রথম) মাণিক দত্তেরও উল্লেখ আছে। পুঁথিতে শ্রীচৈতন্যের বন্দনাও আছে; সম্ভবত এ রচনা অনেক পরেকার। এই মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম পুঁথি নয়, তবু উল্লেখযোগ্য। এ পুঁথিতে জন-সমাজে প্রচলিত মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথার ছাপই বেশি। মাঝে মাঝে ছন্দেও একটা ছড়ার ধরণ দেখা যায়। তা ছাড়া মাণিক দত্তকে দিয়ে দেবী কি করে মর্ত্যে নৃত্যগীতে নিজের পূজা প্রচলিত করলেন মামুলী হলেও সেই কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক। স্বপ্নে মাণিক-দত্তকে 'পোথা' দিয়ে ব্রতকথা প্রচার করতে দেবী আদেশ দিলেন। মাণিক দত্তের কিন্তু সেই সংস্কৃত পুঁথি পড়ার মত বিদ্যা ছিল না। যাই হোক, 'তিন শত ষাট নাচাড়ি করিয়া প্রবন্ধ' সে দলবল নিয়ে কলিঙ্গে গেল— 'নাটগীত গায় প্রতি ঘরে ঘরে'। রাজার পাত্রমিত্র সব মেতে গেল। মামুলী গল্পের মতোই তখন কলিঙ্গ-রাজ কুপিত হয়ে মাণিক দত্তকে বন্দী করলেন। দেবীও স্বপ্নে রাজার সম্মুখে উগ্রমূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। আর কথা নেই। রাজা উঠে প্রভাতে মাণিক দত্তকে নিয়ে গিয়ে দেবীর পূজা দিলেন। এই হল আসল কাহিনীর ভূমিকাংশ। তারপরে কালকেতু-কাহিনী আরম্ভ হয়— নীলাম্বরের অভিশাপ থেকে। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য-কলহ ও দ্বন্দ্বেই সেই কাহিনীরও গোড়াপত্তন। এ পুঁথি হচ্ছে গ্রাম্য জীবনের সাধারণ পালা গান। উত্তরবঙ্গে দুর্গা পূজার সময় চার দিন এইরকম চণ্ডীমঙ্গল গাওয়া হত। ষষ্ঠীতে উদ্বোধন হত—সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সেদিন গাওয়া হয়ে যেত। সপ্তমীর দিন আরম্ভ হত মূল পালা। নবমীতে শ্রীমন্তের মশান-কাহিনীর গান চলত সারা রাত্রি, এই অংশ 'জাগরণ পালা'; আর দশমীতে 'বহিত' (নৌকা?) তুলে পালার সমাপ্তি। মালদহের এই 'বহিত' তোলার বিবরণ হয়তো বাণিজ্যযাত্রার একটা অস্পষ্ট অনুকৃতি (ডঃ সেনের বাঃ সাঃ ইঃ-এ উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অন্তত আট রাত্রি ধরেই গাওয়া হয়, তা স্মরণীয়। সাধারণত মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার।

দ্বিজ মাধব—আসলে চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতর পুঁথি হল দ্বিজ মাধবের 'সারদা-চরিত' বা 'সারদা-মঙ্গল'। মুকুন্দরামের পূর্বে যাঁদের কাব্য পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম। পুঁথির উল্লেখিত কাল সত্য হলে তা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের রচনা, তখন আকবর গৌড়ের বাদশাহ—'একাব্বর নামে

রাজা অর্জুন-অবতার।' কবির ভাষায় 'কলিযুগে তাঁর তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি।' কবির পরিচয় যা আছে তাতে জানি তিনি পরাশরের পুত্র, দ্বিজ মাধব; তাঁরা সপ্তগ্রামের অধিবাসী (অথবা নদীয়ার?)। কিন্তু এই পরিচয়ের দ্বিজ মাধবই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের'ও রচয়িতা, তিনি বাঙলার বৈষ্ণব সমাজেও সুপরিচিত;—তাঁর বংশীয়দের পর্যন্ত পরিচয় জানা যায় (দ্রঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'); কিন্তু কোথাও কেউ বলে না সেই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'সারদামঙ্গল'ও লিখেছিলেন। মনে হয়, নাম-সাদৃশ্যেই এই বিভ্রম ঘটেছে, এবং একজনের পরিচয়ই দুই দ্বিজ মাধবের স্কন্ধে চেপে বসেছে বহুকাল যাবৎ। এরূপ অনুমানের একটা কারণ—সারদামঙ্গল বা সারদা-চরিতে এই পরিচয়-অংশে কবি সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, নদীয়ারই নাম করেছেন, অথচ সারদামঙ্গল বা সারদা-চরিতের একখানা পুঁথিও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না। দু-একখানি পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গে, আর অধিকাংশ পাওয়া যায় চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা অঞ্চলে। বাঙলার সেই দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি বলতেই দ্বিজ মাধব; মুকুন্দরামও সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। মনে হয় এই দ্বিজ মাধব হয়তো আসলে ঐ অঞ্চলেরই কবি।

'দ্বিজ মাধব' কে, তিনি মাধব আচার্য কিনা, না মাধবানন্দ, আর মাধব আচার্য হলে কি গ্রহবিপ্র বলেই 'আচার্য'—এসব প্রশ্ন উঠেছে; কিন্তু সে-সবের মীমাংসা আপাতত হবে না। একটা জিনিস সত্য—'সারদা-চরিতে'র লেখক দ্বিজ মাধব কবি ছিলেন, এবং পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল। মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে লাভ নেই। কিন্তু মুকুন্দরামের কিছু কিছু গুণের আভাস দ্বিজ মাধবেও পাই। যেমন, দ্বিজ মাধবও আখ্যান বলতে গিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তা অস্পষ্ট হলেও স্বতন্ত্র। তাঁর ভাঁড়ু দত্ত অনেকটা ভাঁড়; তাঁর কালকেতু ভীরু নয়, বীরই; খুল্লনা, ফুল্লরাও শুধু ছায়ামাত্র নয়। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টির থেকে দ্বিজ মাধবের সৃষ্টিতে স্পষ্ট বাস্তব বর্ণনা—মামুলী গার্হস্থ্য চিত্র, যেমন, সতীনের প্রতি সতীনের গঞ্জনা, দরিদ্র গৃহবধূর দুঃখ বেদনা—এসব বর্ণনায় দ্বিজ মাধব যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠা জানিয়েছেন—বাঙলা সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠার ঐতিহ্য সামান্য নয়। আর তাঁর রচনায় এমন একটা সহজ সাবলীলতা আছে যা সেদিন খুব বেশি কবির মধ্যে লাভ করা যায় না।

এ ছাড়াও 'সারদা-চরিতে' এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা পরবর্তী কালে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন সারদা-চরিত 'চতুর্দশ' পালায় বিভক্ত, মুকুন্দরামে এ পালা গানের চিহ্ন নেই। সারদা-চরিতে প্রথমেই পাওয়া যায় সূর্য বন্দনা (তার থেকেই অনুমান করা হয় লেখক ছিলেন গ্রহাচার্য), 'সারদা-চরিতে' শিবায়ন বা শিব-উমার আখ্যানাবলী নেই, মুকুন্দরামের পর থেকে চণ্ডীমঙ্গলে সেই পৌরাণিক কাহিনীর প্রাধান্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কিন্তু তন্ত্রের আব্‌হাওয়া দেখা যায়। (এ প্রসঙ্গে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র ভূমিকাভাগ দ্রষ্টব্য। অবশ্য মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যেকার লৌকিক মূলকে খর্ব করে তান্ত্রিক, পৌরাণিক প্রভৃতি প্রভাবের উপর তিনি যেভাবে জোর দিতে চান, তা বিশেষ সুস্থির বা সুদৃঢ় নয়)। তান্ত্রিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত, যেমন, কালকেতুর কাহিনীর শেষে শাপমুক্ত কালকেতুকে শিব মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞানশিক্ষার উপদেশ দিচ্ছেন :

সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা বৈসে দুই পাশে ॥ ইত্যাদি।

কলিঙ্গ-রাজার পূজা-বিধির উপরেও তান্ত্রিক প্রভাব দেখতে পাই। সর্ব দেবদেবীর পূজা, গুরুপূজা এ সবও তন্ত্র-সম্মত। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায়—এসব তান্ত্রিক কথাবার্তা তৎপূর্বেই সমাজে সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। না হলে 'সারদা-চরিতে' সব চেয়ে স্পষ্ট—'বিষ্ণুপদ'গুলিতে বৈষ্ণব প্রভাব, চৈতন্য-লীলার সানন্দ স্বীকৃতি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই সবই—এই বৈষ্ণব-ধারণা বা ভাবনাও সাধারণ সম্পত্তি। শ্রীমন্ত মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও সিংহল যাত্রা করলে। দুশ্চিন্তাগ্রস্তা মাতা খুল্লনার ব্যাকুলতা কবি ব্যক্ত করেছেন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী চৈতন্যের জন্য শচী মায়ের আকুলতার পদ দিয়ে—'আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়।' দুষ্ট, পাঠশালা-পালানো ছেলে শ্রীমন্ত লুকিয়ে আছে। খুল্লনার ব্যাকুলতা দ্বিজ মাধব ব্যক্ত করেছেন মা যশোদার পদ সংযোজিত করে : 'তোমরা কি কেউ মোর যাদব দেখিয়াছ।'

এ কবি তান্ত্রিকই হউন, বা হউন কৃষ্ণমঙ্গলের দ্বিজ মাধব,—চৈতন্য-লীলা ও কৃষ্ণ-লীলা যোড়শ শতক শেষ না হতেই এসব কবিকে জয় করেছে।

মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ'

কাব্য-প্রারম্ভে মুকুন্দরাম দু'টি পদে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাতে

পিতামাতা ও পুত্র-পুত্রবধূ সুদ্ধ কবি আপনার জীবনের ও কালের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। তা থেকে মনে হয় তিনিও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিককার লোক, কারণ তিনি মানসিংহের সুবাদারীর (খ্রীঃ ১৫৯৪) উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্য যখন রচিত হয় (খ্রীঃ ১৫৭৪-১৬০৪) তখন সে শতাব্দী প্রায় শেষ হচ্ছে। দক্ষিণ রাঢ়ের দামুন্যার (বর্ধমান) 'মহামিশ্র' জগন্নাথের তিনি পৌত্র, গুণীরাজ মিশ্রের তিনি পুত্র। 'দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত', আর তেমনি তাঁর আপন বংশ বিদ্বান, পণ্ডিত। কিন্তু হলে হবে কি?

"অধর্ম্ম রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ্।"

পাঠান-মোগলের দ্বন্দ্ব-কালের অরাজকতায় কবি স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পথে দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভোগের একশেষ হল। কিন্তু প্রত্যেকটি সামান্যতম উপকারও মুকুন্দরাম পরবর্তী কালে উল্লেখ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাই ভাল্যায়ার যদুকুণ্ডু 'তেলি' তাঁর কাব্যে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে:

'দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।'

পথে গোচড়্যায় কবি স্বপ্নে পার্বতীর কৃপা পান। তারপর এগিয়ে গিয়ে আরড়ায় (মেদিনীপুর) বাঁকুড়া রায়ের রাজ্যে পেলেন স্থান। বাঁকুড়া রায় তাঁকে পুত্রের শিক্ষার জন্য গুরুরূপে নিযুক্ত করলেন। অনেককাল পরে যখন রঘুনাথ রায় রাজা, তখন পুত্র-বিয়োগে কবির মনে পড়ল আবার চণ্ডীর আদেশ। আর তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনায় ব্রতী হলেন। রঘুনাথ তাঁকে উৎসাহ দেন, পুরস্কৃত করেন, আর তাঁকে উপাধি দেন 'কবিকঙ্কণ'।

কবিকঙ্কণ? হাঁ কবিকঙ্কণ নিশ্চয়ই। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে মানব-রসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা, মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে তা একটা আকস্মিক বিস্ময়। তার নাম ও স্বরূপ তখনো রস-শাস্ত্র স্থির করে উঠতে পারে নি। না হলে মুকুন্দরামের পরিচয় হত কথা-শিল্পে প্রথম বাঙালী কবি হিসাবে, কথা-শিল্পী বলে, বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে। কিন্তু উপন্যাস সে সময়ে জন্মে যখন সামন্ত যুগ শেষ হয়—এবং আগেকার যুগের ছাঁচে-গড়া মানুষ বিশিষ্ট-চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে থাকে। সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ তখনো আসে নি। তথাপি মুকুন্দরামের কবিচিত্ত আপনার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় ও সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছে তার মূল সত্য—

মানুষের চরিত্র, আর মানব-রস। দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও তিনি বুঝেছেন সাহিত্যের আসল কথাই এই—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

আর এ মানুষ সহজিয়া সাধনার 'সহজ মানুষ' নয়, সমাজবন্ধনাতীত পরমাত্মার বিগ্রহ নয়, সমাজের ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ-কামনা-বাসনা-মাখা বাস্তব মানুষ। দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসেও তাই মুকুন্দরাম মানব-মাহাত্ম্যই কীর্তন করেছেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তিনি তাই স্ফুটনোন্মুখ মানবতার প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি—যখন আধুনিক কাল অনাগত, যখন মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা অনাবিষ্কৃত।

আধুনিক কাল তখনো অনেক দূরে, কাব্যও হচ্ছে মঙ্গল-কাব্য, অলৌকিকতার রাজ্য সর্বত্র। মুকুন্দরামেরও সেই অলৌকিক রসে বিরাগ নেই। সিংহলে বাণিজ্য-পথে কল্পনার কত সমুদ্র পেরিয়ে যায় বণিকের ডিঙা। কিন্তু যাত্রা তার অজয় থেকে ভাগীরথী দিয়ে। আদি-গঙ্গার মরা খাতের ধারে দক্ষিণ বাঙ্‌লার আজও যেসব পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও নগর বাঙ্‌লাদেশের ঘরা স্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে, একটি একটি করে কবিকঙ্কণ তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। উল্লেখ করেছেন তিনি বাঙাল মাঝিদের ঝড়ের ভয়ে খেদ; উল্লেখ করেছেন তিনি পর্তুগীজ 'হার্মাদ্'দের কথা; বাঙালীর চিরপ্রিয় আহার্যাদির কথা। বাস্তব জীবনরসেই তাঁর সত্যকার আনন্দ। কালকেতু ব্যাধ পত্তন করেছে গুজরাতে নূতন রাজ্য ও রাজধানী; কবিকঙ্কণের বিশ্বস্ত বর্ণনায় মনে হয় দেখছি যেন বাঙালীর ইতিহাসের একটি সজীব পাতা। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর এমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আর নেই। কিছুই কবির চোখ এড়ায় নি; অরাজকতার দিনে জুলুম করে জমির 'পণের কাঠায় কুড়া' মাপা হয়, 'খিল ভূমি করে লাল'; জোতদার 'তঙ্কায় আড়াই আনা কম' দেয়; মহাজনের অত্যাচারের শেষ নেই; কোটাল 'কড়ির কারণে বহু মারে', প্রজা যখন সব বিক্রি করছে 'ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে'—টাকার জিনিস তখন আবার দশ আনায় বিকোয়; অথচ গ্রাম ত্যাগ করে পালাবারও পথ সহজে পায় না মানুষ। পথ অবশ্য তবু পায়, তাই বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয় না।

এ শুধু তথ্যনিষ্ঠা নয়, ভাবে ও ভাষায় এ কাব্যে আছে একটা অসাধারণ

স্পষ্টতা—যে স্পষ্টতা ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকদের রচনারীতিতে একটা দুর্লভ বস্তু; যাকে বলা যায় ক্লাসিক-ধর্ম, তথ্যনিষ্ঠা, ভাব ও ভাষায় সংযম, আত্মস্থতা।

তথাপি কবিকঙ্কণের প্রধান কীর্তি হল চরিত্রাঙ্কনে। বাস্তবনিষ্ঠা না থাকলে কেউ এ কর্মে সার্থক হতে পারে না, হয়তো হস্তার্পণও করে না। মুকুন্দরামের বেণে মুরারি শীল, মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত, তাঁর দাসী দুর্বলা—বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত চরিত্র, এমন জীবন্ত চিত্র আর নেই। মূলকাব্য থেকে উদ্ধৃতি না করলে হয়তো তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না—বোঝা যায় না মুরারি শীলের সঙ্গে কেনা-বেচায় কেমন একটি কৌতুক-রসপ্রধান আর নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপন করা হয়েছে; ভাঁড়ুদত্ত কতকটা কুচক্রী আর বেহেড্-বেহেয়া; দুর্বলা কেমন একটি পাকা সেয়ানা দাসী; ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধের সভায় বেণেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মর্যাদা নিয়ে কিরূপ কলহ করছে; কলিঙ্গের সেনাপতি বাক্যবীর কেমন যুদ্ধের ভয়ে মনে মনে কম্পমান; পুরোহিতেরা কেমন মধুলোভী মক্ষিকার মত দক্ষিণার সন্ধানী; গুজরাতের বৈদ্য কবিরাজরা কেমন রোগ না সারলেও রোজগারে ওস্তাদ; খুল্লনাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে ধনপতি কেমন করে বোঝান প্রথম পত্নী লহনাকে যে একা একা গৃহকর্মের ভারে লহনার শ্রী কালি হয়ে যাচ্ছে;—মুকুন্দরাম সত্যিকারের কৌতুকরসিকের চোখ দিয়ে এরূপ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জিনিসও দেখছেন,—নিশ্চয়ই দ্রষ্টার মত তাঁর ভাবখানা, কিন্তু চোখে মুখে তাঁর গোপন হাসি। স্বভাবতই এর সঙ্গে তুলনা হয় ইংরেজ কবি চসারের। কিন্তু চসার ইউরোপীয় 'রিনায়সেন্সের' বিদগ্ধ, সুরসিক কবি; আর মুকুন্দরাম মধ্যযুগের কবি, বাঙালীর পল্লী-সভ্যতার কবি। যতটুকু বাস্তব-নিষ্ঠা, মানব-চরিত্র-বোধ, মানবতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে আমরা পাই, সে যুগের তুলনায় তা একটা অপরিমিত বিস্ময়।

সত্য বটে, মুকুন্দরামও সমসাময়িক কাল ও ভারতীয় পল্লীসমাজের জীবনযাত্রা ও কাব্যদর্শনের দ্বারা চালিত। অরাজকতাকে তিনি মনে করেন প্রজার পাপের ফল; বিনা অপরাধে স্বচ্ছন্দে খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষা করিয়ে ছাড়েন; তার পরে রচনা করেন 'বারমাস্যা', বসন্ত বর্ণনা, 'চৌতিশা' প্রভৃতি ধরাবাঁধা বিষয়। তাতেও কবির শক্তি ও কৃতিত্ব একেবারে আচ্ছন্ন হয় নি, এইটুকু বলাই যথেষ্ট।

অন্যান্য কবি—আশ্চর্য নয় যে, চণ্ডীমঙ্গলের পরবর্তী রচয়িতারা আর কবিকঙ্কণের প্রভাব অতিক্রম করতে পারলেন না। সপ্তদশ শতকে চণ্ডী কাহিনী-রচয়িতার অভাব হয় নি, অভাব ছিল কাব্যশক্তির। জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন প্রভৃতিও মঙ্গল-কাব্য লিখলেন। কিন্তু তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী বা দুর্গা বাঙালী কবিদের হৃদয় দখল করেছেন। অবশ্য তার রচয়িতারা,—সপ্তদশ শতকের ভবানীপ্রসাদ রায়, দ্বিজ কমললোচন প্রভৃতি— কবি হিসাবে কেউ তেমন কৃতী নন।

ধর্মমঙ্গল

মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কাব্যগুলির সাহিত্যিক মূল্য সামান্য, যাঁরা প্রধান রচয়িতা তাঁরাও আবার অষ্টাদশ শতকের, অর্থাৎ 'নবাবী আমলে'র। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে লেখা ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তার অনেক পূর্বেই ধর্মঠাকুরের ছড়া চলিত ছিল। আর ধর্মপূজা ও তার আখ্যান বাঙ্‌লার লোক-সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত এক পূজা ও আখ্যান হয়ে উটেছে নিশ্চয়ই আরও অনেক-অনেক কাল পূর্বে। এক সময়ে হয়তো উত্তরবঙ্গেও ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু বর্তমান-কালে ধর্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ হয়েছে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ে, অজয়-দামোদর নদের মধ্যবর্তী ভূভাগে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা নিয়ে একটা বিরাট অঞ্চলে। এখানেই হাখণ্ড নামে গ্রামও ছিল, ধর্ম-পূজার তাই ছিল এক প্রধান পীঠস্থান। কিন্তু সর্বত্রই ধর্মঠাকুর ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষদের দেবতা, বিশেষ করে ডোমদেরই ঠাকুর। উচ্চবর্গের মানুষেরা ধর্মপূজা ও ধর্মের গান ঘৃণার চক্ষেই আগে দেখত, অবশ্য সে ঘৃণা কালক্রমে খানিকটা কর্মেও এসেছিল। তবে ডোমদের দেবতা ধর্মঠাকুর চণ্ডী ও মনসার মতো পুরোপুরি জাতে উঠতে পারেন নি। ধর্মমঙ্গলের অষ্টাদশ শতকের কবি মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম ঠাকুরের আদেশ পেয়েও তাই ভয়ে ভয়ে বলছেন, 'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।' কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ব্রাহ্মণ বংশের কবি সে গান করছেন, তখন বোঝা যায় জাতিও আর যাবে না এর পরে। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিরাও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তিন জন, কৈবর্ত ও শুঁড়ি পাওয়া যায় একজন করে। আসলে নিম্নবর্গের পক্ষে লেখা-পড়া শেখা অসম্ভব ছিল; যদিইবা তাদের গান রচনার শক্তি থাকত, সাধারণত সে গান মুখে মুখে চলে মুখে মুখেই নিঃশেষ হয়ে যেত। পুঁথিতে তা লিখবে কে? তাই তাদের গ্রন্থ নেই।

ধর্মমঙ্গলের কবি ও কাব্য দুয়েরই থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব ধর্মপূজার ও ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর। কারণ তা হচ্ছে বাঙালীর রহস্যাবৃত জীবনেতিহাসের একটি বিচিত্র উপাদান। এদেশের নৃবিজ্ঞানের ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষকরা এ সমস্যার নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথমত তার সূচনা করেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৯৪-এর প্রোসিডিংস্ অব্ এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এ), আর বিংশ শতকের এই মধ্যভাগেও সে আলোচনা শেষ হয় নি। এ আলোচনার প্রয়োজন এখনো পুরোপুরিই রয়েছে। কোন্ দেবতার কি ভাবে উদ্ভব হল, কি ভাবে পরে তার বিবর্তন হল, কোথা থেকে কার পূজাপদ্ধতিতে এসে মিশেছে অপর কার পূজার বিধি, এমনিতর নানা জটিল প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে। এ সব প্রশ্নকে একেবারে উপেক্ষা করে বাঙালী সংস্কৃতির কোনো হিসাবই নেওয়া যায় না; বাঙলা সাহিত্যেরই কি হিসাব নেওয়া সম্ভব হয়? অবশ্য এই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের তথ্যে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস অযথা ভারাক্রান্ত করলেও সে সব প্রশ্নের মীমাংসা হবে না, এ প্রসঙ্গে তাও বোঝা উচিত। সাধারণভাবে ধর্ম-ঠাকুরের ও ধর্ম-পূজার সমস্যাগুলি জানাই যথেষ্ট।

ধর্ম ঠাকুর কে?—যা সাধারণত এখন দেখা যায় তা হচ্ছে—যেমন শালগ্রাম শিলা, তেমনি ধর্মঠাকুরও হচ্ছেন একখণ্ড পাথর। কোথাও সে পবিত্র পাথরটি কূর্মাকৃতি, কোথাও ডিম্বাকৃতি, বা এই দুইয়ের কাছাকাছি; কখনো আবার লাল কাপড় দিয়ে তা ঢাকা থাকে, আর তার গায়ে থাকে পিতলের পেরেক বসানো চক্ষু—ভক্তদের দান। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে, বা কুষ্ঠরোগের আরোগ্য কামনায় ভক্তরা ঠাকুরের কাছে নানা মানৎ করে। ধর্মঠাকুরের 'থান' (স্থান) নির্জন গাছতলায়, কিম্বা কখনো চালা ঘরের, মাটির বা ইটের মন্দিরে। 'ধর্মরায়' ছাড়াও এক এক স্থানে তাঁর এক-এক নাম—যথা, বুড়া রায়, কালু রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়। অনেক জায়গায় ধর্মঠাকুরের কাছে পাঁঠা, হাঁস, পায়রা, মুরগী এবং শূকরও বলি দেওয়া হয়। সাধারণত যাঁরা পূজা করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ নন, ডোম জাতির লোকেরাই হন পূজারী। এই পূজারীরা তাম্র-উপবীত ধারণ করেন। তাঁরা উপাধি নেন 'পণ্ডিত', 'দেবাংশী' নামেও তাঁরা পরিচিত। পূজা হয় কোথাও নিত্যপূজা, কোথাও বাৎসরিক পূজা,—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, বারোয়ারি পূজার মতো। আর কোথাও এ পূজানুষ্ঠান মানসিক শোধ করবার জন্য। প্রধান অংশের নাম 'ঘর-ভরা'। সে পূজা বিচিত্র। খুব জাঁকজমক করে পূজা হয়—বারটি

ধর্মশিলা একত্র করা হয়, ঘট স্থাপন করে বারদিন পূজা চলে, একটি ছাগকে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়, শিবের গাজনের মতো ধর্মের গাজনে এ পূজা শেষ হয়। এই ধর্মঠাকুরের নামেই গ্রামের লোক ঘট বসিয়ে সংকল্প করত, তার থেকে 'ধর্মঘট' কথাটির উদ্ভব।

এ 'ধর্মরায়' মূলত হিন্দুর ধর্মরাজ বা যমরাজ নন, তা স্পষ্ট। পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি হলেন বুদ্ধেরই শেষ পরিণতি—বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মধ্যে ধর্ম এভাবে টিকে আছে। বাঙলার বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতি বহন করছেন এই ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও তাঁর অব্রাহ্মণ পূজারীরা, এই মত গ্রহণ করে বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের এই চিহ্নান্বেষণের একটা উৎসাহ জাগে তারপর পণ্ডিত মহলে। তাই ধর্মমঙ্গলের ধর্মপূজা-পদ্ধতির নানা পুঁথির অংশকে 'শূন্যপুরাণ' নাম দিয়ে একেবারে বৌদ্ধযুগের বাঙলা সাহিত্য রূপে পর্যন্ত ঘোষণা করা হয় [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ১৩১৪ সালে প্রকাশিত 'শূন্যপুরাণে' এ চেষ্টাই দেখা যায়। তাতেই তখনকার দিনে শূন্যপুরাণকে বলা হত প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্য—১১শ-১২শ শতকের (?)]। অবশ্য তখনই দেখা গিয়েছিল ধর্মঠাকুর কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা দুয়ের সংমিশ্রিত এক দেবতাও হয়ে উঠেছেন। তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি ? ঐ পরিণাম তো বৌদ্ধ দেবদেবীর পরবর্তা কালে ঘটেই। পরে আরও একটু লক্ষ্য করে দেখা গেল—ধর্ম যেন সূর্যদেবতারও প্রতীক। কিন্তু সূর্যও শুধু হিন্দু বা পারসিকের দেবতা নন। দ্রাবিড়-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর নানা আদিবাসীরাও বাঙলার চারদিকে সূর্য দেবতার উপাসনা করছেন—বাঙলার মেয়েদের ব্রতকথায় তো সূর্য মস্ত বড় দেবতা। আদিবাসীদের সূর্য দেবতাকে গ্রহণ করে সূর্য দেবতা ধর্মও তার মধ্যে মিশেছেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি ? এর পরে দেখা গেল—শুধু তাই নয়, ধর্মরায় রাজাও, ধর্মমঙ্গল গানে শ্বেত-অশ্ব-আরোহী সিপাহীরূপেও এই ধর্মরায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিকে 'ঘর-ভরা'র কাহিনীর গাজনের শেষে 'ঘর-ভাঙা' নামে একটি অনুষ্ঠানও আছে, তাতেই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ও জাজপুর ধ্বংসের কথা পাওয়া যায়। এর নাম জালালি কলমা। তাতে মুসলমান বিজয়ের ও ধ্বংসের কথা দেখা যায়। অর্থাৎ মনে হয় ডোমের মতো দেশীয় যোদ্ধজাতির এই যুদ্ধ-দেবতা ধর্ম তুর্ক-বিজয়ের দিনে ভক্তদের চোখে বিজয়ী তুর্ক-সিপাহীও হয়ে উঠেছেন, এবং শ্বেত-অশ্বারূঢ় সূর্যের সঙ্গে এই সিপাহী পরিকল্পনাও এসে মিশেছে। এখানেও

তবু শেষ হয় নি ধর্মঠাকুরের ঠিকুজী। কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড কেন তাঁর প্রতীক হল? অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা এবার বৌদ্ধযুগ ও ডোমদের বনদেবতাকে ছাড়িয়ে আরও পিছনে গিয়ে বললেন—আসলে এ হচ্ছে কূর্মদেবতা। এ দেশের আদিম (অষ্ট্রিক?) অধিবাসীদের তা টোটেম কিংবা বিগ্রহ,—যার সঙ্গে হিন্দু কূর্মাবতারেরও সম্পর্ক রয়েছে। আর 'ধর্ম' নামটি আসলে 'ধর্ম' নয়, অষ্ট্রিক 'ধুম্' (= কূর্ম), কচ্ছপ অর্থে ধুন শব্দ পূর্ববাঙলায় সুপ্রচলিত। অবশ্য এই কূর্ম'বাদের' বিরুদ্ধে তর্ক আছে (শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', ২য় সং, পৃ ৪৬৯-৫১০এ সে সব বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে)। কিন্তু তর্ক চলুক, ততক্ষণ ডঃ সুকুমার সেনের মতো সাধারণ বুদ্ধিতে আমরাও মেনে নিতে পারি—এ বর্ণনায় দুটি পৃথক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়: একটি প্রস্তর পূজা ও কূর্ম পূজা, আর দ্বিতীয়টি সূর্য পূজা, যার সঙ্গে মিশেছিল মুসলমান যোদ্ধৃ-শক্তির পূজা। কিন্তু মৌলিক না হলেও এই মিশ্রিত দেবতার মধ্যে লৌকিক বৌদ্ধধর্মের ও লৌকিক হিন্দুধর্মের (শিবের) ছাপও কি মুসলমান আমলের পূর্বেই পড়তে আরম্ভ করে নি? তা-ও পড়তে আরম্ভ করেছিল। ধর্ম-কাহিনীর সেই শিবটি হচ্ছেন বাঙালী চাষী শিব,—শিবায়নে তিনিই ক্রমে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকেন।

ধর্মঠাকুরের গানে কি আছে?—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা আশ্রয় করে ধর্মঠাকুরের ছড়া ও গান। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা চলে প্রধানত লাউসেনের আখ্যান অবলম্বন করে, সেই অংশকেই বলা চলে খাঁটি ধর্মমঙ্গল। কিন্তু ঠাকুরের পূজা ও শাস্ত্রের সঙ্গে আরও নানা কাহিনী এসে জমেছে। সে সব পূজার সময় গাওয়া হত। এ সবের নাম দেওয়া যায় (ডঃ সুকুমার সেনের মতে) 'ধর্মপুরাণ'। ধর্মের এসব গানে ছড়ায় প্রথম থাকে 'শূন্যশাস্ত্র' বা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথা। এই সৃষ্টি-কাহিনীর মূল অনেক দূরে, হিন্দু পুরাণাদির সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ এ নয়। 'শূন্যপুরাণ' বলতে এই সৃষ্টি খণ্ডই বিশেষ করে বোঝায়। তারপরে রয়েছে ধর্মপূজা প্রবর্তনের কথা। এর দুটি অংশ। একটি 'সদা-খণ্ড' সদা ডোমের কাহিনী; অন্যটি 'সংজাত খণ্ড' (সাংবাত্রিক) —রামাই পণ্ডিতের কাহিনী। এসব ধর্মপুরাণের অন্তর্গত। কিন্তু তৃতীয় একটি ভাগও ধর্মপুরাণের আছে, তা হচ্ছে ধর্মপূজা-পদ্ধতি—এই ভাগে বর্ণিত হয়েছে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজার বিষয় ও 'ঘর-ভাঙা' গাজনের কথা (যাতে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'জালালি কলমা' প্রভৃতি স্থান পায়), আর সে ভাগও

তাই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। যা'ই হোক্‌, যে পুঁথিতে যে বিষয় যতটাই পাওয়া যাক, বলা যেতে পারে এদিকে সৃষ্টি-তত্ত্ব, সদাখণ্ড সাংজাত-খণ্ড, ধর্মপূজা বিধান, 'ঘর-ভাঙ্গা' গাজনের গান, অন্যদিকে লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান—এসব মিলিয়ে ধর্মঠাকুরের গান; 'শূন্যপুরাণ', 'ধর্মপূজা-বিধান', 'ধর্মমঙ্গল'—অর্থাৎ ধর্মের 'স্যাগা'। আর এ সবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-মঙ্গলে পাওয়া যাবে রামায়ণের বা নাথ-সিদ্ধান্তের প্রচলিত নানা কাহিনীরও ছাপ। যে সম্প্রদায়ের বা জনতার মনে যা ভালো লাগে তাই ঢুকে পড়েছে ধর্মের গানে। তার আখ্যানে লাউসেনকে দেখে রমণীদের মামুলী পতি-নিন্দাও আসে আবার পাতিব্রত্যের চিরদিনকার জয়-ঘোষণাও আসে; নায়কের প্রণয়-প্রার্থিনী করে (গোরখ বিজয়ে যেমন দেখা যায়, তেমনি) দেবী পার্বতীকেও এই আখ্যানে আনতে কবির বাধে না, আবার হনুমানের মতো কর্মপটু বীরকে এসব আখ্যানে না স্থান দিলেও তাঁর নয়। সাধারণে যা শোনে, যা চায়, সবই আসে এক সূত্রে না এক সূত্রে। সকল মঙ্গল-কাব্যেই এ লক্ষণ দেখা যায়; লৌকিক কাব্যের এইরূপ নিয়ম।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া: শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বও তাই অনেক মনসামঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া বায়। এই সৃষ্টি-কাহিনীও জনসাধারণের নিশ্চয় অপরিচিত ছিল না। সহজিয়া নিবন্ধেও তাই তা লাভ করা যায়। যেমম, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, সবই ছিল শূন্য, এ তত্ত্ব সুপরিচিত। তারপপর নূতন কাহিনী—এই শূন্যরূপী ধর্মের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা জাগল, হলেন তিনি দুই রূপ'অনিল' (পবন) ও নীল (মন)। ফুটল এক বিরাট বিম্ব বা বুদ্বুদ, ধর্ম তাতে আসন নিলেন। তার ভিতরে ধর্ম ভ্রূণ হয়ে বিম্বভেদ করে আকার ধারণ করে বের হলেন। কিন্তু 'আকার হইতে ধর্ম হইল ফাঁফর'। তাঁর নিশ্বাসে জন্ম নিল 'উলুক'—ধর্মের বাহন। তারপরে মুখামৃত থেকে জল, অঙ্গমল থেকে মেদিনী এবং ঘাম থেকে আদ্যাশক্তিকে তিনি সৃষ্টি করলেন, এই আদ্যাকে বিবাহ করলেন। আর বিবাহের পরেই তপস্যা করতে তাঁর ইচ্ছা হল—বিবাহের মজাটা হয়তো টের পেলেন যথেষ্ট। ধর্ম গিয়ে বাল্লুকানদীর তীরে তপস্যায় বসলেন, অমনি তাঁর বাহন উলুকওগিয়েবসল যোগে। এদিকে আদ্যাদেবীর চিত্ত চঞ্চল হল, জন্মালেন কামদেব। ফলে ধর্মের অকালে ধ্যানভঙ্গ হল—যেমন হয়েছিল শিবের। এই ধ্যানভঙ্গে বিষ উদ্ভূত হল। হতাশ আদ্যা সে বিষ পান করেও মরলেন না। তাঁর উদরে জন্মাল ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন—যথাক্রমে তা আসলে

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁরা তিন ভাই খুঁজতে চললেন পিতাকে। ধর্ম অমনি নিরাকার হয়ে গেলেন। তখন তাঁরা তপস্যা করতে লাগলেন। বার বৎসর তপস্যা। তখন ধর্মেরও দয়া হল, মড়া হয়ে তিনি ভেসে এলেন। শিব তাঁকে পিতা বলে চিনে ফেললেন। অন্য ভাইরা মানে না—শিবটার চিরদিনই বুদ্ধি কম। কিন্তু উলুক উড়ে এসে সেই মড়াকেই বলল ধর্ম। তখন মড়ার সৎকারের আয়োজন হল—শিবের জানুর উপরে। জেনে আদ্যা ছুটে এসে সহমৃতা হলেন—ইত্যাদি। তিন দেবতার পরীক্ষায় এই সৃষ্টি-কাহিনী সমাপ্ত, যদিও পাঠকের পক্ষে অর্থ বোঝা ভার—কেনই বা কি হল।

সদা-খণ্ড : এর চেয়ে 'সদা-খণ্ড' সহজ-বোধ্য ; কারণ সে মানুষের কাহিনী। ঘোর কলিযুগে ধর্মপূজা প্রচার করতে আদিত্য, জন্ম নিলেন রামাই পণ্ডিত রূপে। তার আগে ধর্ম চললেন তাঁর ভক্ত সদা ডোমের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে—ছাতা মাথায়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ছাতাটি মেরামত করতে হবে সদার। মেরামত শেষ হতেই সদা ডোমের তিনি অতিথি হতে চান। কিন্তু সদার ত 'বেটাবেটী নেই'। ঠাকুর আঁটকুড়োর ঘরে পারণ করেন কি করে? দুঃখে সদা প্রায় আত্মহত্যা করে। ঠাকুর রক্ষা করলেন, আর তাঁরই বরে পুত্রও হল—লুইধর। এ হল সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চিরকেলে গল্প। এর পরে যোগ হল হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান। হরিশ্চন্দ্র রাজা জোয়ান ডোম লুইধরকে বাগানে রক্ষক নিযুক্ত করলেন। আবার ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ-বেশে গেলেন অতিথি হতে। সদা ডোম ডোমনীর পরামর্শে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায়, ডাক শুনেও সাড়া দেয় না। কেন?

সন্ন্যাসী মহন্ত যায় এই পথ সোজা।
ধর্যা নিয়া আমার ঘাড়েতে দেই বোঝা॥

কারণ, সবাই তাকে বেগার খাটায়।

হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর মতই পুত্রমাংসে অতিথি সৎকারে আদিষ্ট হয় এর পরে সদা। সদা ডোম বা হরিশ্চন্দ্র রাজা রামাইকে পুরোহিত করে ধর্মপূজা করেন। কাহিনী তো এই। সদা ডোম ও তার স্ত্রীকে মন্দ লাগে না—সাধারণ ডোম জাতীয় সরল মানুষ, ছলনা করতেও ভালো করে জানে না।

সাংজাত খণ্ড : সাংজাত খণ্ডে রামাই পণ্ডিতের কথাও এ গুণে বর্জিত নয়। রামাই (আদিত্য) জন্মেছে বিষ্ণুনাথ বা বিশ্বনাথ মুনির বংশে। বাক্-সিদ্ধ পুরুষ বিশ্বনাথ। তিনি মারা যেতেই মার্কণ্ডেয় মুনির পরামর্শে মুনিরা

'ঘোট' করলে—রামাইকে পিতার দেহ-সৎকারে তারা কেউ সাহায্য করবে না। রীতিমতো ব্রাহ্মণদের ঘোট। রামাইকে একেবারে একঘরে করা ঠিক হল—'মুনির নন্দন রামে শূদ্র কর্যা রাখ।' রামাইয়ের উপনয়নের সময় যায়। কিন্তু কেউ তাকে পৈতে দেবে না। রামাই কাঁদতে কাঁদতে ধর্মকে ডাকতেই তিনি আবির্ভূত হলেন, রামাইকে তাম্রসূত্র ধারণ করিয়ে ধর্মপূজার পদ্ধতি বলে দিলেন। রামাই ধর্মপূজা করে বাক্‌সিদ্ধ হয়। এদিকে মার্কণ্ডেয় তখনো ধর্মের প্রতি গাল-মন্দ করে; বলে, ধর্মপূজা হল নীচ-জাতির পূজা। কিছু-দিন যেতে না যেতেই ধর্মনিন্দার ফলে মার্কণ্ডেয়ের হল ধবল; তখন রামাইয়ের শরণ না নিলে নয়। রামাইয়ের দয়ায় তখন মার্কণ্ডেয়ের রোগ দূর হল, মুনিরা রামাইকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেন, হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজার পুরোহিত হলেন রামাই।

অবশ্য ব্রাহ্মণরা রামাইকে স্বীকার করল না; ধর্মও রইলেন এই অবজ্ঞাতদেরই নিজস্ব দেবতা হয়ে। তারপর যা ঘটল তা, বোঝা যায়, তুর্ক-বিজয়। ধর্ম-পূজাপদ্ধতির শেষ অংশে তাই দেখি ভাষার ও ভাবের খিচুড়ি পাকানো একটা অংশ (এর অন্তর্ভুক্ত 'ছোট জালালি', 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'র বা 'বড় জালালি'র পরিচয় আগেই আমরা গ্রহণ করেছি; দ্রষ্টব্য—ধর্মপূজা-বিধান, সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত, পৃঃ ২২০-২২৩)। মনে হয় ধর্মঠাকুর এখানে রাজশক্তির প্রতীক—অশ্বারোহী তীর-কামানধারী খোন্দকার; অর্থাৎ ঠাকুরের নিম্ন জাতীয় ভক্তরা গৌড়ের সুলতানকেই তখন ধর্মরায়ের প্রতিনিধি বলে মেনে নিয়েছে (ডাঃ সেন—বাঃ সাঃ ইঃ, ২০।২)।

ধর্মপূজা-পদ্ধতির এই সব আখ্যানে একালে কৌতুক বোধ হয়। সে কৌতুক কাব্যের জন্য নয়, গ্রাম্য-উদ্ভটতা ও সামাজিক আবর্তন-বিবর্তনের জন্য।

ধর্মপূজার এই পুরাণ, গীত ও ছড়াগুলির চেয়ে ধর্মমঙ্গল অংশের কাব্যগত রূপ অনেক বেশি সংহত। একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে তা রচিত হয়েছে—লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী।

ধর্মমঙ্গল: 'ধর্মমঙ্গলে'র লাউসেন-রঞ্জাবতীর এই আখ্যানে কাব্যরস কিছুটা আছে, সে আখ্যান বিশেষ গ্রাম্যও নয়। তাই বলে তাও কম উদ্ভট নয়। অলৌকিক ঘটনার উদ্ভাবনা তার পদে পদে।

গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা ময়নাগড়ের কর্ণ সেন। ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষের হাতে এই কর্ণ সেনের ছয় পুত্র নিহত হয়; তখন বৃদ্ধ

কর্ণ সেন বিবাহ করেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে। এই বিবাহে বিরোধী ছিলেন রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মন্ত্রী মহামদ। রঞ্জাবতী হলেন ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাসিকা। তার তপস্যাও অদ্ভুত—গৌরীও বুঝি এত পারতেন না। এই তপশ্চর্যার ফলে তিনি পেলেন পুত্র লাউসেনকে—পুত্রলাভ ও পুত্রকামনা ধর্মমঙ্গলের একটি মূল তথ্য। মন্ত্রী মহামদ এই লাউসেনের প্রাণনাশের জন্য মাতুল কংসের মতোই চক্রান্ত করতে লাগলেন। ধর্মের অনুগ্রহে তা সব ব্যর্থ হয়ে যায়, শিশু লাউসেন যৌবন প্রাপ্ত হলেন। লাউসেন তখন গৌড়ে চললেন। পথে তিনি বীরত্বের অনেক পরিচয় দিলেন—বাঘকে দমন করলেন, কুমীরকে পরাজিত করলেন, অসতী নারীর ছলাকলা চরিত্রবলে প্রতিহত করলেন, গণিকা নারীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, ইত্যাদি। গৌড়ে কিছুদিন যাপন করে অনেক পুরস্কার পেয়ে লাউসেন দেশে ফিরলেন; নিজের অনুচর কালু ডোম ও তার পত্নী লখ্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য পত্তন করলেন ময়নাগড়ে। তখনো কিন্তু মহামদের চক্রান্ত ফুরোল না। তাঁর মন্ত্রণায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পাঠালেন—কামরূপ-রাজকে পরাস্ত করতে। কিন্তু তাতে বিজয়ী হয়ে পত্নীলাভ হল লাউসেনের। তারপর গৌড়েশ্বর হরিপালের রাজকন্যা কানড়াকে বিবাহ করতে চান। কিন্তু কানড়াও একান্তভাবে লাউসেনের অনুরাগিণী, ধর্মরায়ের আশ্রিতা। লোহার গণ্ডার খড়্গে না কাটতে পারলে কেউ তাকে বিবাহ করতে পারবে না। সে পরীক্ষায় জয়ী হলেন লাউসেন। লাউসেনই কানড়াকে তখন পত্নীরূপে প্রাপ্ত হলেন—কানড়ার প্রেম ও সাহসেরই হল জয়। এর পরে আবার লাউসেনের ডাক পড়ল—এবার ইছাই ঘোষকে দমন করতে হবে। মা-বাপের ভয়ের সীমা নেই। কিন্তু অনেক যুদ্ধের পরে ধর্মের কৃপায় লাউসেনই জয়ী হলেন। আরো পরীক্ষা চলল তারপর—এবার মানুষের রাজ্য ছাড়িয়ে অসম্ভবের রাজ্যে পরীক্ষা হল। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে তুলতে হবে লাউসেনকে। লাউসেন হাখণ্ডে গিয়ে তখন তপস্যায় বসলেন, ধর্মঠাকুরও তুষ্ট হয়ে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখালেন। এ অসম্ভব কাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী রইল লাউসেনের ভক্ত হরিহর বাইতি। এদিকে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেছেন; কালু ডোম তা রক্ষা করছে। মহামদের নানা প্রলোভন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথায় কালু ডোম রাজ্যরক্ষা করতে পণ করলে। সপুত্রক প্রাণ দিলে কালু ডোম, অন্তঃপুর রক্ষায় প্রাণ দিলে তার বীর-পত্নী। মহামদ রাজ্য অপহরণ করে

গৌড়েও লাউসেনকে বিনষ্ট করবার চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয় দর্শন তিনি মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাইলেন—সাক্ষীকে মিথ্যা করে শূলে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তাঁর ষড়যন্ত্র সফল হল না। লাউসেন পশ্চিমে সূর্য উঠতে দেখেছেন—তা প্রমাণিত হল। এদিকে লাউসেন দেশে ফিরে এসে দেখলেন—রাজ্য বিধ্বস্ত। তিনি তখন ধর্মের স্তব করতে লাগলেন। ধর্মের অনুগ্রহে সবাই আবার বেঁচে উঠল—ধর্মরায়ের কৃপায় ময়নাগড়ের রাজা লাউসেন আবার রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই নানা অসম্ভব উপাখ্যানের পিছনে কোনো ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা—গৌড়েশ্বর পাল রাজাদের কোনো সেনবংশীয় সামন্ত সত্যই ইছাই ঘোষ নামে কোনো সামন্তরাজকে দমন করে ময়নাগড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিনা,—এ হল ইতিহাসের দুঃসাধ্য এক সমস্যা। কাব্য হিসাবে এ হচ্ছে প্রধানত এক সামন্ত রাজত্বের কাহিনী। বাঙলা দেশের নিজস্ব রাজা-রাজড়াদের বীরত্ব-শূরত্বের কাহিনী বড় নেই। এ সাহিত্যে 'হিরোইক এজ' কোথায়? 'ধর্মমঙ্গলে'র অন্তর্গত লাউসেনের কাহিনীই হল বাঙালীর বীর রসের কাব্য, অবশ্য তা ভক্তবীরের কথা। নানা কাহিনীর মধ্যে লাউসেনের এই বীরত্ব ও বীর-চরিত্র একটি সূত্রই শুধু যোগায় নি, তাকে অনেকটা একত্রিত ও গ্রথিত করেও তুলেছে। একে 'রাঢ়ের জাতীয় কাব্য' না বলে রাঢ়ের বীরকাব্য বলা যেতে পারে,—জাতি বা নেশন শুধু রাঢ় নিয়ে নয়, গৌড়-বাঙলা নিয়ে, আর সেরূপ 'জাতীয়' সম্পদ এই রাঢ়ীয় কাব্য নয়। তবে লাউসেন অলৌকিকের আশীর্বাদভাজন হলেও ধীর, স্থির, বীর পুরুষ। রামচন্দ্রের ছায়াও তাঁর চরিত্রে ক্ষীণভাবে দেখা যায়। কিন্তু সে রাম অযোধ্যার রাম নয়, রাঢ়ীয় রাম—ভক্তি তাঁর শক্তি। আর অত্যুক্তি থাকলেও, মনে হয় রাজকন্যা কানড়া সত্যই বীরাঙ্গনা। এই সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কোন চরিত্রকে যদি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র বলতে হয় তা হলে তা বলা উচিত কালু ডোম ও তার পত্নীকে, এবং হরিহর বাইতিকে। এই অসাধারণ সাহসী ডোম চরিত্রের উপর বীরত্বের রঙ্ ফলানো হলেও তা মাত্রাতিরিক্ত হয় নি। তার লোভ আছে, কিন্তু সত্যবোধও আছে। তাই ডোম ও ডোমের স্ত্রী মানুষ এবং সাহসী মানুষ রয়ে গিয়েছে। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে বাঙালী ভাবালুতার পরিবর্তে একটা সহজ লৌকিক বাস্তব-বোধের প্রমাণ দেখতে পাই এই জাতীয় লৌকিক চরিত্রের চিত্রণে। না হলে মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যের

সব আখ্যানই অলৌকিকের আতিশয্যে আকীর্ণ। লৌকিক দেবকাহিনী সর্বদাই অলৌকিক, বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষই কি অলৌকিক ছাড়া ধর্মের কথা ভাবতে পারে? এই অলৌকিকের কল্পনায় মঙ্গল-কাব্যেও যেখানে মানবীয় জীবনের আভাস আসে, মানব-সম্পর্কের ছায়া পড়ে, সেখানেই মানব-রসের প্রসাদে সেই সব আজগুবি উদ্ভট কাহিনী কোনো রূপে কাব্য-গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। না হলে সে-সব কাহিনী ইতিহাসের বা সমাজতত্ত্বের গবেষণার বিষয়, বড় জোর শিক্ষিত মানুষের শুধু কৌতূহলের বিষয়, আর তাই সাহিত্য-সন্ধানীর পক্ষে ক্লান্তিকর। ধর্মঠাকুরের গানের মধ্যে এই মানব-রস ভাগ্যক্রমে ভালো করে এসে জুটেছে আরও একটি কারণে—ধর্ম-মঙ্গলের রচয়িতারা প্রত্যেকে নিজেদের কাহিনীও রেখে গিয়েছেন।

হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালী কবির পক্ষে এরূপ দাবি করা একটা মামুলী প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি বিশেষ দেবতার আদেশেই তাঁর মাহাত্ম্য গান রচনা করেছেন; এবং সেই উপলক্ষে শুধু বংশ-পরিচয় নয়, ব্যক্তিজীবন, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য-লাভের বর্ণনা, এসবও তখন থেকে একটা মামুলী কবি-প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যতই তা মামুলী হোক, মানুষের কথা বলতে গেলে কবিকেও কিছু-না-কিছু মানুষই হয়ে যেতে হয়। তাই মঙ্গল-কাব্যের কবি-কাহিনীতেই আমাদেরও মানবীয় আগ্রহ অধিক জাগ্রত হয়, মানব-রসের তৃপ্তি মেলে, এবং সমসাময়িক কালের সমাজ-বিষয়েও কৌতূহল কতকটা নিবৃত্ত হয়। ধর্মমঙ্গলের প্রধানতম সম্পদ তাই বিভিন্ন লেখকের এই আত্মকাহিনী, বাঙলার তা 'আত্মজীবনী'-সাহিত্য।

ধর্মমঙ্গলের কবি-পরিচয় :—ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর আদিকবি বলে প্রসিদ্ধি ময়ূরভট্টের। তাঁর কাব্য অবশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর এ খ্যাতির একটা কারণ উদ্ধার করা যায়। বাণভট্টের ভগ্নীপতি ময়ূরভট্ট সংস্কৃতে 'সূর্য-শতকে'র রচয়িতা; কিংবদন্তী আছে ময়ূরভট্ট সে কাব্য লিখে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন (দ্রঃ—ডঃ সেন, বাঃ সাঃ ইঃ ২১।৪)। এ থেকে অনুমান করা যায়—কি করে 'ধর্মমঙ্গলে'র আদিকবি বলে প্রসিদ্ধি হয়েছিল ময়ূরভট্টের। তারপরেই ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি বলে খ্যাতি আছে খেলারাম চক্রবর্তীর। তাঁর কাব্যের নাম 'গৌড়কাব্য'; কিন্তু তাও পাওয়া যায় নি। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের পুঁথির নাম ছিল 'নিরঞ্জন-মঙ্গল'; তা হয়তো পরে রূপরাম চক্রবর্তীর

কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছিল ; কিন্তু তাঁরও পুঁথি অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে প্রথম কবি এখন রূপরাম চক্রবর্তী। এই কবি রাজমহলে শাহ্ শুজার নাম করেছেন ; তাঁর কাব্য হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে অথবা দ্বিতীয়ার্ধে রচিত (খ্রীঃ ১৬৪৯-৫৯)। রূপরামের পুঁথির অভাব নেই। তা সযত্নে মুদ্রিত ও সম্পাদিত হয়েছে (বর্ধমান সাহিত্য সভা থেকে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদকতায়), আর রূপরাম এই সম্মান ও সমাদরের যোগ্য। তাঁর কাব্যে সরলতা আছে, বাহুল্য নেই ; তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ মুছে গিয়ে শুধু ভক্তই অবশিষ্ট থাকে নি। অবশ্য রূপ-রামের আত্ম-পরিচয়েই এ পরিণতিরও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে সহৃদয়তাও আছে, কৌতুকবোধও আছে। এই চরিত্রের জন্যও এই কাব্য পাঠ্য ; রূপরাম নিজেও একটি ছোটখাটো গল্প-উপন্যাসের নায়ক হতে পারতেন।

রূপরাম : বর্ধমানের দক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের নিকটে শ্রীরামপুরে রূপরামের জন্ম। ভালো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মেছিলেন রূপরাম : পিতা ছিলেন শ্রীরাম চক্রবর্তী (?), মাতা দৈমন্তী (দময়ন্তী) ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর, ছোট ভাই রামেশ্বর, 'প্রাণের সমান', ছোট দুই ভগ্নী সোনা ও হীরা। রূপরামের পিতার চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্র ছিল। রূপরামও সেখানে ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করেছিলেন। কিন্তু পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ রত্নেশ্বর তাঁর প্রতি বিষম বিরূপও হয়ে ওঠে, কেন তা জানা যায় না। 'খাইতে-শুইতে বলে বাক্য জলন্ত আগুন।' রাগ করে তাই সহৃদয় প্রতিবেশীদের দেওয়া ধুতি আর নিজের খুঙ্গি-পুঁথি নিয়ে কবি বেরিয়ে পড়লেন পথে। ক্রোশ আড়াই দূরে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে গিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র হলেন। রূপরাম গুরুগৃহে আছেন, পণ্ডিত অধ্যাপকের ও মেধাবী শিষ্যের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে,—সুন্দর এ অংশেরও রচনা। কিন্তু শিষ্যের তর্কে শেষে গুরুও ক্রুদ্ধ হলেন। 'সূর্যের সমান গুরু পরম সুন্দর', রাগে তিনি খুব জলে উঠেছেন—এ চিত্রও যেন জীবন্ত (শিষ্যটি একটি হাড়ি মেয়ের প্রেমে মেতে উঠেছিলেন, এরূপও একটা কাহিনী আছে)। যাক্, রূপরাম আবার বেরুলেন নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে। পথে হঠাৎ মায়ের মুখ তাঁর মনে পড়ল। রূপরাম বাড়ির দিকে চললেন। পলাশ বনের বিলের

কাছে ঠিক দুপুরে পথশ্রান্ত কবির দৃষ্টিভ্রম হল, দেখলেন দুটি শঙ্খচিল উড়ছে বিষ্ণুপদতলে। অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দৌড়ুতে গিয়ে আছাড় খেলেন। পুঁথিপত্র পড়ল ছড়িয়ে। এমন সময়

একে শনিবার তায় দুপুর বেলা।
সম্মুখে দণ্ডাইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা॥

তাঁর গলায় সুবর্ণ উপবীত, ব্রাহ্মণের রূপ। ধর্মঠাকুর (যথা-প্রয়োজন) আদেশ দিলেন—আর পুঁথিপত্রে কাজ নেই, ধর্মের গীত বারমতি গাও, 'বারদিন গাইবে গীত আসর ভিতর।'

যে বোল বলিবে তুমি সে হবে গীত।
সদাই গাহিবে গুণ আমার চরিত॥

রূপরাম কিন্তু ভয়ে গৃহের দিকে ছুটলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এক পেট জল খেলেন শাখারি-পুকুরে নেমে। তারপরে গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন, আশা—দাদা না দেখতেই 'প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণে'। ছোট দুই বোন আনন্দ-কোলাহল জুড়ে দিল, 'রূপরাম দাদা আইল খুজি-পুঁথি লয়্যা'। কিন্তু সেই কলরব শুনে রত্নেশ্বর এসে উপস্থিত হল—রূপরামকে দেখে সে আগুন। পড়তে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে রূপরাম! রূপরাম তক্ষুনি ভয়ে পালালেন—'জননী সহিত নাঞি হল দরশন।' দিন তিন অনাহারে চলে তিনি গিয়ে পৌছলেন শনিঘাটে, ধর্মঠাকুরের মায়ায় কিন্তু ভাজা চিঁড়ে উড়ে গেল। আবার জল পান করেই কবি পেট ভরালেন। তারপর দীঘনগরে তাঁতীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের সংবাদ শুনে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেখানে গেলেন। ফলার করলেন—কিন্তু ধর্মঠাকুর খৈ দিলেন না। ঘুরে ঘুরে শেষে রূপরাম এড়াইল গ্রামে গিয়ে উঠলেন। সেখানকার ভূম্যধিকারী ছিলেন গণেশ। ধর্মঠাকুর ইতিপূর্বে তাঁকেও স্বপ্নে দর্শন দিয়ে কবির বিষয়ে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তাই রাজা গণেশ রূপরামকে সম্বর্ধনাও করলেন, ধর্মের গান রচনা করবারও অবকাশ কবিকে করে দিলেন।

রূপরামের এই আত্মবিবরণী নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কারণ নেই, কিন্তু খুশী হতে হয়। কি এই বিবরণীতে, কি লাউসেনের কাহিনীতে, রূপরাম আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছন্দ বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে মানব-কাহিনী বলেছেন। যে কালে ভক্তির আর ঠাকুরের নামে মানুষকে ভাসিয়ে নেওয়াই নিয়ম, সেকালে রূপ-রাম এই দেবমাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও মানুষকে বিস্মৃত হন নি, রসবোধও

হারান নি। "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে রূপরামের কাব্য বাস্তবতার জন্ম অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।" (ডঃ সেন—বাঃ সাঃ কঃ)

রামদাস আদক : রূপরামের পরে ধর্মমঙ্গলের কবি রামদাস আদকের জন্ম হয়ে থাকবে। তাঁর কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় খ্রীঃ ১৬৬২। তিনিও আত্মপরিচয় লিখছেন, আর সে পরিচয়-কথায় রূপরামের কাহিনীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অথবা, আত্ম-পরিচয় দান ও কাব্য-রচনার কারণ হিসাবে দেবদেবীর আদেশ বা স্বপ্নাদেশ লাভ করা একটা গতানুগতিক কৌশল বা কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথাও এই সঙ্গে বুঝতে পারি—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের এই ধর্মমঙ্গলের রচয়িতা জীবনের সহজ কথাগুলি সহজভাবে বলতে কোনোই বাধা দেখছেন না।

রামদাসের এই আত্ম-জীবনীও উল্লেখযোগ্য। রামদাস জাতে কৈবর্ত, পিতার নাম রঘুনন্দন। তাদের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে। পৌষের কিস্তি দিতে না পারায় পরগণার জমিদারের কর্মচারী রামদাসকে কয়েদ করে। কোনো রকমে একবার মুক্তি পেয়েই রামদাস গ্রাম ছেড়ে পালালেন মামার বাড়ী। পথে দেখলেন মাথার উপরে শঙ্খচিল ; বিনিসুতোয় ফুল মালার আকারে গাঁথা হয়ে গেল ; বিস্ময়-বিমূঢ় কবি আবার দেখলেন, ঘোড়ায় চড়ে সিপাহী আসছে সম্মুখে। ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে যায়,—

দেশে খাজনার ডরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই ॥

দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থাটা এসব কথা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না। রামদাসের অবশ্য সৌভাগ্য। সিপাহী তাঁকে পাকড়াল, মাথায় মোট চাপিয়ে দিল, তম্বি করতে লাগল। তিনি ভয়ে চোখ বুজলেন একবার ; চোখ খুলতেই দেখলেন কেউ কোথাও নেই—সিপাহী-বেশী ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের এল জ্বর। দুঃখে কষ্টে পথের পাশে বসে যখন তিনি কাঁদছেন তখন অবশেষে ধর্ম এসে দেখা দিলেন ব্রাহ্মণের বেশে, আর যথা-নিয়মে তাঁকে আদেশ করলেন ধর্মের গান লিখতে ! রামদাস কৈবর্তের ছেলে, সরল ভাবে বলছেন,—

পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥

তাতে অবশ্য যায় আসে না। ধর্মঠাকুর বলে যান—'আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।'

সীতারাম দাস : ধর্মমঙ্গলের তৃতীয় বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস—তিনি 'মনসামঙ্গল'ও লিখেছেন। তাঁরও এ ধারার অনুসরণে আত্ম-পরিচয় আছে। জাতিতে তাঁরা কায়স্থ; বর্ধমানের খণ্ডঘোষের সুখসাগর গ্রামে ছিল বাড়ি। প্রথম গৃহদেবতা গজলক্ষ্মী সীতারামকে ধর্মের কীর্তন করতে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। কিছুকাল গেল। ইতিমধ্যে মহাসিংহ এসে সাহাপুর গ্রাম লুঠ করে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। সাধারণ মানুষের সর্বনাশ হল। কবিদেরও ঘর-দুয়ার গেল। কবির খুল্লতাত ভাই তাঁকে প্যাওড়া বনে পাঠাল কাঠ আনতে। সীতারাম প্রভাতে বের হতে না হতেই নানা লক্ষণ দেখা দিতে লাগল—"শঙ্খচিল মাথায় উড়িছে ঘনেঘন", তাও দেখতে পেলেন। বনের মুখে গ্রামে বসে তিনি তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে বললে—ওপথে যেয়ো না, বেগার ধরে নিচ্ছে সিপাহীরা। ভয় পেলেও সীতারাম বনে গেলেন—কাঠ কাটতে হবে যে। বৈশাখ মাস, বন কুরচির ফুলে ভরা; বড় সুন্দর। কিন্তু পরক্ষণেই ত্রাস এল কবির প্রাণে—সামনেই দেখলেন ঘোড়া! নিশ্চয়ই নিকটে সিপাহী আছে, কবিকে বেগার ধরবে। সীতারাম অমনি ছুটলেন—পিছনে ঝড়ের শব্দে মনে করলেন বুঝি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ছুটে ছুটে দেখা পেলেন এক সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী আশ্বাস দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। একটু পরেই সীতারামের নিকট 'জটিল ঠাকুর' নিজের পরিচয়ও দিলেন। তিনি 'নিরঞ্জন নিরাকার'। ইন্দাস গ্রামের 'নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে আমার বিশ্রাম'—এখন 'আমার মঙ্গল গীত কর গিয়া তুমি।' সীতারাম অত সহজে তাতে স্বীকৃত হলেন না। তিনি আপত্তি করলেন—আমি ছেলেমানুষ, কিই বা আমার বুদ্ধি। ঠাকুর ভরসা দিলে সীতারাম তখন আবার আপত্তি করলেন,—হয়তো জাত যাবার ভয়ে,—পরকালে তাঁর কি হবে। ধর্মঠাকুর ভরসা দিলেন 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে।' এভাবে 'ডাবলি ইনশিওরড্' হলেন সীতারাম। কাঠ না নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে চণ্ডীমণ্ডপে শুলেন, গায়ে জ্বর। আবার মা গজলক্ষ্মী স্বপ্নে বললেন—গীত লেখো গিয়ে। সীতারাম কিছুদিন বাউলের মতো হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। ইন্দাসে গিয়ে উঠলেন নারায়ণ পণ্ডিতের গৃহে। বাঁকুড়া রায় ধর্মঠাকুরের তিনি সেবায়েত। সেখানেই প্রথম আরম্ভ হল সীতারামের গীত-

রচনা। এদিকে খবর পেয়ে খুল্লতাতও তাঁকে নিয়ে এল নিজেদের বাড়ি—সেখানেই 'বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিনে।' সীতারাম মানুষটি সরল হলেও সৌন্দর্যবোধও আছে—বৈশাখের বন ও ফুল দেখে মুগ্ধ হন, আর সে বর্ণনা মামুলী কবি-বর্ণনা নয়।

সীতারাম দাস যখন ধর্মমঙ্গল লেখেন তখন খ্রীঃ ১৬৯৮; অব্দের গণনায় সপ্তদশ শতাব্দ শেষ হচ্ছে। অবিচ্ছেদ্য ভাবেই অবশ্য অষ্টাদশ শতকে চলবে ধর্মমঙ্গল রচনা। তখন আমরা ধর্মমঙ্গলের আরও বিখ্যাত কবিদের সাক্ষাৎ পাব—ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি। কিন্তু সপ্তদশ শতকের সেই কবিদের কাব্য ও আত্মকাহিনী বলবার ভঙ্গী থেকে যা বুঝতে পারি এখন তা হচ্ছে এই—কবিদেব কবি-দৃষ্টিতে একটা পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। দেবমাহাত্ম্য নিয়েই তখনো কাব্য রচনা হচ্ছে বটে, ধর্মমঙ্গলের এই কবিরাও ভক্তি ও অলৌকিকত্বের দোহাই দিচ্ছেন সত্য, কিন্তু আর-একটা জিনিসও এসে যাচ্ছে—মানুষের সহজ সরল জীবনের কথা, তা বলবার আগ্রহ, মানুষকে সেই মানুষ হিসাবেও দেখবার মতো দৃষ্টির উন্মেষ। বৈষ্ণব ভক্ত-জীবনী গ্রন্থের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের ভক্ত এসব কবির আত্ম-কাহিনীর অংশ তুলনা করলে মনে হয়—এদের জগৎটা শুধু প্রাকৃত-জনের জগৎ নয়, অনেক সহজ ও বাস্তব জগৎ। হয়তো প্রাকৃত জীবন ও প্রাকৃত দেবতার কাহিনী বলেই এত বাস্তব চেতনা সম্ভব হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ও দেব-কাহিনী—অনেক সময়ে স্থূল হলেও—আবার অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। আমরা তা দেখি—ধর্মের আখ্যানে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিব-বিষয়ক গীত, ছড়া ও কাহিনী থেকে।

শিবমঙ্গল

বেদের ঝড়ঝঞ্ঝার দেবতা ছিলেন রুদ্র, আর উপনিষদের দেবতা ছিলেন উমা হৈমবতী; অনেক আগেই তাঁরা মঙ্গলের দেবতা শিবে ও দেব-গৃহিণী ও দেব-জননী পার্বতীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রাবিড়ভাষীদের কোন্ তাম্রবর্ণ (শম্ভু) ও রক্তবর্ণ (শিবন্) ধ্বংসের দেবতা; মোহেন্-জো-দড়োর প্রাগ্-বৈদিক লিঙ্গেশ্বর ও যোগীশ্বর দেবতা, বৌদ্ধদের ধ্যানী বুদ্ধের শান্ত স্থির আদর্শ এবং প্রাচীন জাতি-উপজাতি ও জন-সমাজের আরও কত দেবতার কল্পনা ও কাহিনী যে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনায় এসে মিশেছিল, সে আলোচনা অনাবশ্যক; কারণ তা বাঙ্‌লা সাহিত্যের জন্মের পূর্ববর্তী কথা।

সঙ্গত-অসঙ্গত,অসামঞ্জস্য-ভরা কথা ও কাহিনীকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করতে সক্ষম বলেই যেন এ দেবতা নীলকণ্ঠ। দ্বন্দ্বময় জগৎ ও জীবনের নানা দ্বন্দ্বের প্রতিফলন তাই দেখা যায় এই দেব-চরিত্রে। অথচ সেই সঙ্গেই এই ইঙ্গিতও আছে যে, তিনি দ্বন্দ্বের অতীত, দেবাদিদেব, যোগী মহেশ্বর। শিব সংসার-ত্যাগী মহাবোধি নন, সংসারী হয়েও পরম জ্ঞানী! বাঙালী উচ্চস্তরের মনে এই কৈলাসের শিব—গৃহস্থ দেবতার ও কল্যাণের দেবতার আদর্শ—যতই প্রভাব বিস্তার করুন, বাঙালী সাধারণ মানুষের কাছে এই আশুতোষ দেবতা আরও নানাভাবে তাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর সে প্রকাশের ইতিহাস আছে বাঙলার লোক-গীতে এবং ধর্মমঙ্গল ও নানা মঙ্গল-কাব্যের শিব ঠাকুরের ছড়ায়।

দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ কৃষক, তাদের উৎপাদন-বৃদ্ধির আদি দেবতাও ছিলেন কৃষকরূপে কল্পিত। সামাজিক আপোষ-রক্ষার সূত্রে পৌরাণিক হিন্দুর সেই দেবাদিদেব এই কৃষক-দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। কৃষকের বাস্তব জীবন-যাত্রার অনুরূপেই গড়ে ওঠে কৃষকের সংস্কার ও কল্পনা। কৃষক-শিবের চরিত্রও তাই রচিত হতে থাকে বাঙলার প্রাকৃত-জনের জীবনাদর্শে; সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর চরিত্র ও আচরণও ঢালাই হতে থাকে এই কৃষক-দেবতার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। এই শিথিল চরিত্রাদর্শ নাথশৈব সম্প্রদায়ের শিব-পার্বতীর চরিত্রকেও প্রভাবিত করেছে কিনা কে জানে। বাঙলা দেশের অনেক প্রাচীন সংস্কার ও কল্পনা কিন্তু আশ্রয় পেয়ে গেল নিম্নতম স্তরের এই বাঙালী শিবের কল্পনায় ও চরিত্রে। পৌরাণিক শিব-গৌরীর মর্যাদা হয়তো তাতে বাড়ল না, কিন্তু উপায় কি? লোক-জীবনের শিবের ছড়ায় কথায় রয়েছে জন-সমাজের শিবের প্রধান পরিচয়।

'শিবের গীতে'র এই শিব কৃষক। একটু অলস কৃষক, কৃষিকার্যে উদাসীন, তাঁর সংসারে অভাব লেগেই আছে। নিম্নশ্রেণীকে পরোক্ষে অযোগ্য প্রমাণ করার এও একটা উচ্চবর্গীয় ধূর্ত প্রয়াস কিনা কে জানে? ভিক্ষাবৃত্তিতে এই শিবঠাকুরের লজ্জা নেই—ভিক্ষা তো বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী যোগীদের একটা ব্রত; কৃষক হলেই কি তার ভিক্ষা করতে নেই? অকিঞ্চন, অনাসক্ত পৌরাণিক শিবকে ভিক্ষুক শিবে পরিণত করতে তাই বাঙালী জনসমাজের তখন একটুও বাধে নি। কিন্তু তাদের শিব কোচ-পাড়ায়

কোচনীর সঙ্গে প্রণয় করতেও ব্যস্ত। তাদের পার্বতীও কম নন; মোহিনী বাগ্‌দিনী বেশে ঠাকুরটিকে ঘাট মানিয়ে তবে তিনি ছাড়েন। এই হল শিবের এক রূপ।

কালক্রমে বাঙালী শিব নিম্নতম স্তর থেকে মধ্যস্তরে প্রোমোশন পেলেন। পূর্বযুগের উচ্চবর্ণের একটি অংশ ছিল ব্রাহ্মণ, করণ রাজপুরুষ, বৈশ্য। উচ্চবর্ণের হলেও তারা সবাই উচ্চবর্গের নয়। তুর্ক বিজয়ের পরে এই বৃত্তিজীবী উচ্চবর্ণ এবং ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু উচ্চস্তরের অন্য একটা অংশ, এই নিয়ে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন হচ্ছিল—তা বোঝা যায়। তারাই ছিল বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান ভিত্তি, লেখক ও শ্রোতা। পৌরাণিক ভাবের পালিশ পঞ্চদশ শতক থেকে বাড়তে থাকে, কৃষক শিবও ততই এই মধ্যবিত্ত সংসারের ভালমানুষ কর্তাটি হয়ে ওঠেন। পার্বতী হয়ে ওঠেন আবার অভাবের সংসারের গৃহিণী—রেঁধে-বেড়ে স্বামীপুত্রকে খাইয়ে পরিতৃপ্ত। অথচ অভাবের সংসারে কোথা থেকে আসে খাদ্যব্যঞ্জন, স্বামীটি তার খোঁজও রাখেন না। কোঁদল বাধে তাই হর-পার্বতীতে। কখনো সে কোঁদল বাধে নারদের চক্রান্তে—স্বামীর কাছে এক জোড়া শাঁখা চান গৌরী সাধ করে, শিব ঠাকুরের যোগ্যতা নেই, তা যোগাবেন কি করে? তাই চটে যান উল্টে দেবতাটি। দেবীও অমনি রাগ করেন, চলেন বাপের বাড়ী। তারপরে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারে যা ঘটে সেই ভাবেই মীমাংসা হয় দরিদ্র মধ্যবিত্তের সেই দেব-দম্পতির এই অতি-পরিচিত ও অতি-সহজ কলহ। সত্যই মানতে হয় এও পার্বতী-পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য গান নয়। এ হচ্ছে আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অভাবে-ঘেরা সুখ-দুঃখভরা সংসারের কথা। তাই মহিষমর্দিনী পার্বতী হয়ে ওঠেন আমাদের কন্যা—যিনি বৎসরে তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন।—সব দেবতার কথাই আসলে মানুষের কথা। তবে কোন্ স্তরের মানুষের আর মানুষের কোন্ জীবনাংশের কথা, তার উপরই নির্ভর করে সেই দেব-কাহিনীর মূল্য।

নিম্নস্তর, মধ্যস্তর ছাড়া সমাজের বাহিরের কোঠায় শৈব নাথ গুরুদের শিবও আছেন, পাবতীও আছেন। লৌকিক শিবেরই আর এক রূপ তাতে দেখি। সেখানে শিব হলেন মহাগুরু, সাক্ষাৎ দিগম্বর, দুই নারী নিয়ে তিনি কেলি করেন। সেখানে গোরখনাথের পরীক্ষা করতে গিয়ে পার্বতী নিজেই মীননাথের মত সিদ্ধার শক্তিতে বাঁধা পড়েন, রাক্ষসী হয়ে থাকেন। তখন শিব তাঁকে খুঁজতে বের হন, উদ্ধার করেন, গোরখনাথকেও শিব পরীক্ষা

করতে এগিয়ে যান ;—এ ধরনের অজস্র কাহিনীও এসেছে এই তন্ত্রের গুরু শিবের মধ্যে। ধর্মঠাকুরের গানেও শিবের নামের এসব লৌকিক কথা ও কাহিনী এসে মিশেছে। আবার পশুপতি শিব আদিম ব্যাধ-নিষাদের দেবতারূপেও দেখা দেন মাঝে মাঝে। এরূপে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এবং জাতি-উপজাতি ও তান্ত্রিক, নাথসিদ্ধা প্রভৃতি নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ধারণানুযায়ী বাঙালী শিব আরও নতুন নতুন সত্তাও লাভ করেছেন ; পৌরাণিক হর-গৌরী, দুর্গা, ভগবতী প্রভৃতি মধুর ও মহৎ পরিকল্পনাও তার পাশে সামঞ্জস্যহীন ভাবেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখানেও সমন্বয় হয় নি, হয়েছে নানা স্তরের দেব-কল্পনার সংমিশ্রণ।

মঙ্গল-কাব্যের শিবের গীতে পাওয়া যায় শিব-পার্বতীর সেই লৌকিক ও সাধারণ সত্তার পরিচয়। গাজনে এই লৌকিক শিব-পার্বতীকেই দেখা যায়, ধর্মপুরাণেও এই রূপই বর্ণিত। কিন্তু শিবায়নে বা শিবমঙ্গলে এই শিবের থেকে অধিকতর দেখা যায় পৌরাণিক হর-গৌরীর প্রভাব। শিবের গান সুপ্রাচীন—'চৈতন্য-ভাগবতে' দেখি মহাপ্রভু তা শুনে শঙ্কর-ভাবাপন্ন হয়েছেন। গাজনের গানও নিশ্চয়ই ধারাবাহিক ভাবে অনেকদিন থেকে চলে এসেছে। কিন্তু এসব গান লোক-সাহিত্যের সীমা পার হয়ে সাহিত্যের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারে নি—পারলেও তার প্রমাণ বড় কম। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিন্তু দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মপুরাণ বা শৈব নাথদের (গোরখ-নাথের কাহিনী) থেকে পৃথক করে শুধু শিবকে নিয়ে শিবায়ন রচনা আরম্ভ হয়েছে।

কাব্য-পরিচয় : শিবমঙ্গলের প্রথম কাব্য হল দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' —১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। এ কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে, রতিদেব নিজ পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নি :

পিতা গোপীনাথ মাতা মধুমতী (বসুমতী ?)
জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।

সুচক্রদণ্ডী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সংলগ্ন একটি গ্রাম। চট্টগ্রামেই শৈব মহাতীর্থ রয়েছে চন্দ্রনাথ ও স্বয়ম্ভূনাথ। আর একটিমাত্র চট্টগ্রামেই বৌদ্ধধর্ম জীবন্ত। 'মৃগলুব্ধে'র কাহিনী হচ্ছে মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী, সে প্রসঙ্গে শিব-চতুর্দশীর মাহাত্ম্যকীর্তন। প্রসঙ্গক্রমে হরিনামের মাহাত্ম্য, রামের মহিমা সবই উপদিষ্ট হয়েছে।

চট্টগ্রামেই প্রায় অনুরূপ আর একখানা কাব্যও পাওয়া গিয়েছিল, রাম-রাজার 'মৃগলুব্ধ'-সংবাদ। এ কবি কিন্তু নিজের পরিচয় রেখে যান নি। মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ তাঁকে মগ বলেই অনুমান করতেন। রতিদেবের ও এই রামরাজার লেখার তুলনা করে তিনি বলেন: "রতিদেবের রচনা প্রায় সরল ও বিশুদ্ধ, রামরাজার রচনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট।" কিন্তু উপভোগ করবার মত জিনিস রতিদেবের প্রায় ৮ শত পয়ার লাচাড়ি শ্লোকের মধ্যেই বা কি আছে?

সপ্তদশ শতাব্দীর এই শেষ দিকে পশ্চিম বাঙ্‌লায়ও 'শিবায়ন' রচনা করছিলেন কবিচন্দ্র নাম বা উপাধির এক কবি। রামকৃষ্ণ রায় বা দাসের 'শিবায়ন' সুবৃহৎ কাব্য—১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। এ কাব্য মুদ্রিত হয় নি। প্রায় ৮০০০ পদে তা সম্পূর্ণ। কবি নিজ পরিচয় রেখে গিয়েছেন। হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। তিনি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ, নিজেকে তিনিও 'কবিচন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছেন। এ কাব্যে পঁচিশ পালায় সৃষ্টি-পত্তন থেকে আরম্ভ করে আছে দক্ষযজ্ঞ, উমার সম্পূর্ণ উপাখ্যান, গঙ্গা-ত্রিপুর কাহিনী, দুর্গার কোন্দল, উষা-অনিরুদ্ধ কথা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী। বিষয়বুদ্ধিহীন, স্বামীর হাতে পড়লে বাঙালী স্ত্রীর যে দুঃখে ভুগতে হয়, তা বেশ ফুটেছে 'দুর্গার কোন্দলে'। কবির ভাষাও 'মঙ্গল-কাব্যের গৌরব যুগের ভাষা'।

'শিবায়নে'র পাঠযোগ্য শ্রেষ্ঠ কাহিনী রচনা করেন রামেশ্বর চক্রবর্তী—কিন্তু সে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যদিও তা সে-শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৭১০-১১) রচিত। এ কাব্য আট পালার কাহিনী, 'অষ্টমঙ্গলা'। আর তাতে পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও শিবের চাষ-কাহিনী পাওয়া যায়, অবশ্য তা ধর্মপুরাণাদি থেকেই সংগৃহীত। রামেশ্বরের কাব্যের আসল নাম 'শিব-সংকীর্তন'। মেদিনীপুরে তা প্রচলিত, সেখানে 'শিবায়ন' বলেই এ গ্রন্থ পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থেকে এসে কবি কর্ণগড়ের ভৌমিক, মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান, যশোবন্ত সিংএর দয়ায় কর্ণগড় অঞ্চলে এসে বাস করেন। রামেশ্বরের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট, গর্বও কম নয়:

যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হর-বধূ!
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ঝরে মধু।

এ মধু বটতলার ছাপানো পুঁথি থেকে গৌড়জন পান করেছে। কিন্তু

সে পৌরাণিক অংশের বর্ণনায় জন্য নয়, বরং দেবত্ববর্জিত সেই দরিদ্র শিব ঠাকুরের পারিবারিক চিত্রের জন্য, বিশেষ করে সে সব অংশের জন্য যেখানে গৌরী ভিক্ষালব্ধ অন্ন রন্ধন করে স্বামীপুত্রকে পরিবেশন করছেন, আর 'তুই সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি' সেই অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে না দিতে শেষ করছেন।

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নেই হাঁড়ি পানে চায়॥

শুধু দারিদ্র্যের বর্ণনা নয় (আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য), কারণ,

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥

এ কালে পাঠকও সঙ্গে সঙ্গে তাই হাসে—সহজ কৌতুকে। এ কাব্যেরই অন্য অংশে আছে পার্বতীর শূন্য হাতে সেই শঙ্খপরার সাধ, আর তাতে স্বামী-স্ত্রীর কলহ। সে জিনিসটিও দারিদ্র্যেরই ছবি, কিন্তু কমেডির হাস্যচ্ছটা তার মধ্যেও উঁকি দিচ্ছে না কি? আমরা অষ্টাদশ শতকে এসেছি, দেবতাদের নিয়ে এখন কৌতুকও বোধ করতে চাই। একারণেই নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের শিব-ঠাকুরটির জন্য রামেশ্বরের 'শিবায়ন' এখনো অংশবিশেষে মধুক্ষরা। না হলে সাধারণ ভাবে শিবায়ন-কাব্যসমূহ নীরস এবং কাব্য হিসাবে তুচ্ছ। বাঙালীর সমাজতত্ত্বের দিক থেকে শিব-কাহিনী যত গুরুতর, বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে শিবায়ন বা শিবমঙ্গলের ধারা তেমনি বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

অন্যান্য মঙ্গল-কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বে আরও অনেক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য রচিত হতে আরম্ভ হচ্ছিল, তা 'মঙ্গলকাব্যে'র ছাঁচেই ঢালাই করা। এর মধ্যে নিমতা গ্রামের (২৪ পরগণার) কবি কৃষ্ণরাম দাসের একখানা কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস 'শীতলামঙ্গল' 'ষষ্ঠীমঙ্গল'ও লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচিত 'রায়মঙ্গল'কে গুরুত্ব দিতে হয় বেশি।

'রায়মঙ্গল' হচ্ছে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের কথা। সুন্দর বনের সান্নিধ্যে তখনকার দিনে ব্যাঘ্র যদি দেবতার বাহন না হত ও দেব-মাহাত্ম্য না লাভ করত, তা হলে আশ্চর্য হবার কথা ছিল। দক্ষিণরায় সেই বাঘের দেবতা।

দক্ষিণরায়ের কথা আগেই চলিত ছিল। অনেক কাহিনীর মতোই এ কাহিনী-তেও সদাগর আছে আর সাগর মধ্যে পরীক্ষার্থ দেবীর মায়া-প্রদর্শনও আছে। সদাগর দেবদত্তের বিদেশে কারাবাসও হল। তার অন্বেষণে পুত্র পুষ্পদত্ত গেল বনে কাঠ চিরে তার নৌকা গঠন করাবে। দক্ষিণরায়ের গাছে হাত দিতেই রায়ের বাঘরা কাঠুরেদের মেরে ফেলল। অবশ্য দক্ষিণরায়ের পুজা দিতে সব ঠিক হয়ে গেল। সদাগর-পুত্র তারপর ডিঙা ভাসাল। ডিঙা এসে পৌছল মুসলমান পীর বড় খাঁ গাজীর মোকামে ; বড় খাঁ গাজীকে পুজা না দিয়েই যাচ্ছিল পুষ্পদত্ত। আর যায় কোথায়? গাজীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল দক্ষিণরায়ের ; দুই দলেরই সৈন্য বাঘ। বিষম যুদ্ধ! সৃষ্টি বুঝি শেষে রসাতলে যায়! তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর রূপে আবির্ভূত হয়ে একটা আপোষ রফা করে দিলেন। টিকি আর টুপি তাঁর মাথায়—আর 'কোরাণ পুরাণ দুই হাতে'। ভগবান্ এই স্থির করে দিলেন, এই পথে যারা যাবে বড় খাঁ গাজীর মোকামেও তাদের পুজা দিতে হবে। তাছাড়া এদিকে বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের এলাকা থাকবে, কিন্তু কুমীরের দেবতা কালুরায়েরও থান হবে হিজলীতে। বেশ বোঝা যায় নিম্নস্তরের হিন্দু ও মুসলমান অত্যন্ত সহজ-ভাবে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে (ধর্মমঙ্গলের 'বড় জালালি'তেও তা মনে হয়)। উভয়েই উভয়ের দেবতা ও পীরদের মেনে নিয়েছে, উভয়কেই তারা পুজা দেয়।

সাধারণ মানুষের এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সূত্রে এই জাতীয় মিলনের পথ অনেক আগে সহজ হয়ে উঠেছিল—উপরতলার শাসক-সমাজেও এ মিলন সহজ হয়ে আসছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে নানা বাধা সত্ত্বেও,—হুসেন শাহ, নুসরৎ শাহ বা তাঁদের লস্কর পরাগল খাঁর মতো মুসলমান শাসক-গোষ্ঠী তা সহজতর করে তোলেন। শাসিত উচ্চবর্গের হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রয়াস, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও বর্জন-নীতি অনেকাংশে নিরর্থক হয়ে উঠতে থাকে। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীও শুধু মাত্র আশ্রিত-জন-প্রতিপালক রইলেন দাহলী থেকে আরম্ভ করে কাব্য-রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন—রেসাঙ্গ বা আরাকানের রাজসভা তো বাঙলা সরস্বতীর প্রধান-তম এক পীঠস্থান হয়ে উঠল—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই। উচ্চ ও মধ্যবর্গের এরূপ জাতীয় সাহিত্য রচনার চেষ্টায় জাতীয় মিলনের এই জন-বনিয়াদ আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে, মনে হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক অনুবাদ শাখা

(খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০)

এই চৈতন্যপর্বকে কেউ কেউ বলেছেন পৌরাণিক প্রাবল্যের যুগ। তাও মিথ্যা নয়। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটা প্রধান উপায়ই ছিল জন-সমাজকে পুরাণের আখ্যায়িকা শুনিয়ে অনুগত ও ভক্তিমান করে রাখা। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেও লৌকিক ধারার থেকে পৌরাণিক ধারা ক্রমেই প্রবলতর হয়। অনুবাদ শাখার মধ্যে ভাগবত অবলম্বন করে কৃষ্ণমঙ্গলের ধারা রচিত হচ্ছিল, অন্য দিকে পরিবেশন চলছিল রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর।

রামায়ণ-মহাভারত : ফুলিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস বাঙ্‌লা রামায়ণের আদি কবি ; তিনি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। বাঙলা মহাভারতের আদি-রচয়িতা "কবীন্দ্র" পরমেশ্বরও প্রাক্-চৈতন্য না হোক, শ্রীচৈতন্যের সমকালীন কবি,—হয়তো বা বয়সে অগ্রজও। বাঙ্‌লার এই প্রথম মহাভারত রচিত হয় পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম নোয়াখালী জেলার সীমান্তস্থিত ফেণী-নদীর উপকূলে। তখনো হুসেন শাহ গৌড়েশ্বর (খ্রীঃ ১৪৯৩-খ্রীঃ ১৫১৯)। "আর্যাবর্তের অন্য কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে মহাভারত অবলম্বনে লেখা এত পুরানো কাব্য আর পাওয়া যায় নাই"—এ কথা বাঙ্‌লা-ভাষীদের স্মরণীয় এবং সে হিসাবে এ গ্রন্থও পরম আদরণীয়।

নানা কারণে অবশ্য পরবর্তী কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত (খ্রীঃ ১৬০২-১০) বাঙালীর মনকে জয় করেছে। তার মধ্যে একটি কারণ কাশী-রামের কৃতিত্ব ; অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মহাভারত হিসাবে তাঁর গ্রন্থের শ্রীরামপুরের ছাপাখানার সহায়তা লাভ। পূর্ববঙ্গে কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমাদর তখনো কম ছিল না, তাঁর হাতেলেখা পুঁথিও সর্বত্রই সু-প্রচলিত ছিল, এই বিংশ শতকে পর্যন্ত চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-নোয়াখালী অঞ্চলে তা সুলভ।

'পরাগলী মহাভারত' : কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের সাধারণ পরিচয় 'পরাগলী মহাভারত' বলে। গ্রন্থে বারবার উল্লেখ আছে হুসেন

শাহের ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের মহানুভবতার কথা। হুসেন শাহের লস্কর পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ এই মহাভারতের কাহিনী বাঙ্‌লায় শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরাগল খাঁ সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি রূপে ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, সুলতানের 'লস্কর' বা প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি সে অঞ্চলেই বসবাস করেন—চট্টগ্রামের জনশ্রুতিতে তিনি চট্টগ্রাম-বিজেতা বলেও বিখ্যাত। ফেনী নদীর তীরে পরাগলপুরে এখনো তাঁর বংশধরগণ পদস্থ পরিবার। পুরাণ মহাভারতের এবং নিশ্চয়ই রামায়ণের উপাখ্যানসমূহ শ্রবণ ইতিপূর্বেই এই শাসকবর্গের মুসলমানদের পক্ষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে কাহিনী তাঁদের হৃদয়-মন স্পর্শ করত। পরাগল খাঁর মনেও নেশা লাগে। তিনি সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ভারত-কথা বাঙ্‌লায় বলবার জন্য অনুরোধ করলেন:

তাঁহার আদেশে মাল্য মস্তকে ধরিল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল॥

পরমেশ্বর কোথাও এইরূপে কোথাও 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বলে, কোথাও শুধু 'কবীন্দ্র' বলে নিজের উল্লেখ করেছেন। মুক্তকণ্ঠে কবি প্রশংসা করেছেন হুসেন শাহের ও পরাগল খাঁর।

লস্কর পরাগল খাঁন গুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান॥
দানে কল্পতরু সে যে মহা গুণশালী।
কুতূহলে করাইল ভারথ পাঁচালী॥

কবিতা হিসাবে এ রচনা সামান্য জিনিস, তত বিরাট নয়। কিন্তু মোটের উপর আঠারো পর্বেই সরল ভাষায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের কাহিনী বলে উঠতে পেরেছেন—এইটাই যথেষ্ট। কাহিনীর গুণেই তা সে যুগে আকর্ষণীয় হয়েছিল, এখনো অপাঠ্য নয়।

'ছুটিখানী মহাভারত': কবীন্দ্র পরমেশ্বর যখন মহাভারত রচনা করেন তখন পরাগল খান পরিণতবয়স্ক:

পুত্র পৌত্র রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি॥

ত্রিপুরা-অভিযানে পিতার সহকারী ছিলেন তাঁর পুত্র। পিতার আমলে

এঁর পরিচয় ছিল 'ছুটি খান' বলে। আর ইনিও ছিলেন পরাগলের মতোই মহাভারতের অনুরক্ত। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হল অশ্বমেধ-পর্বকথা বিস্তৃতাকারে শোনবার। কবীন্দ্রের মহাভারতে তা ছিল সংক্ষিপ্ত। ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরনন্দী জৈমিনি-সংহিতার অশ্বমেধ-পর্ব অবলম্বনে রচনা করলেন এক নূতন অশ্বমেধ-পর্ব কথা—মনে হয় তখনো পরাগল খান জীবিত।

শ্রীকর নন্দীর এই লেখা 'পরাগলী মহাভারতের' পরিশিষ্ট-বিশেষ। অনেক পুঁথিতে তা একত্র মিশে গিয়েছে। ছুটি খান পিতারই অনুরূপ দান ধ্যানে যশস্বী।

চিরকাল জীবন্ত লস্কর ছুটি খান।
যাহার লভিয়া সে প্রেম সন্নিধান॥
শ্রীকর নন্দী যে পয়ার রচিল।
জৈমিনি কহিলেক যে হেন দেখিল॥

এ কাহিনীর ভূমিকাভাগে আমরা ত্রিপুরা অভিযানেরও উল্লেখ পাই,

ত্রিপুরা নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥

যৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ-জনা, সুধন্বা, প্রমিলা-অর্জুন, বভ্রুবাহন প্রভৃতি নয়-দশটি উপাখ্যানও এই অশ্বমেধ পর্বে বর্ণিত হয়েছে। অশ্বমেধ পর্বে অভিযান বর্ণনার সুযোগ বেশি, সেনাপতির তা শোনবার আগ্রহ হবেই। তাই সম্ভবত শ্রীকর নন্দীকে ছুটি খাঁ এ পর্ব বিশদ করবার আদেশ দিয়েছিলেন।

অন্যান্য রচয়িতা : নানা কবির লেখা মহাভারতের নানা উপাখ্যান এসে মিশেছে 'সঞ্জয়ের মহাভারতে'। সঞ্জয়ের পরিচয় নিশ্চিত করে জানা যায় না। জৈমিনির মতো অশ্বমেধ পর্ব সবিস্তারে বর্ণনা করবার চেষ্টাও সেদিনে আরও হয়েছিল। রামচন্দ্র খান তারই মধ্যে একজন। তাঁর পরিচয় অনিশ্চিত (বাঃ সাঃ পরিচয় ৭৩৫)। এক পুঁথিতে তিনি ব্রাহ্মণ, আর পুঁথিতে কায়স্থ, তবে তিনি যখন 'খান' তখন পদস্থ রাজপুরুষ হবেন, আর তিনি বৈষ্ণব ছিলেন,—হয়তো বা সেই জমিদার রামচন্দ্র খাঁও হতে পারেন যিনি পুরীর পথে শ্রীচৈতন্যকে নির্বিঘ্নে ছত্রভোগে গৌড় উৎকল সীমা উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন (১৫০৯ ? দ্রষ্টব্য—ডঃ সেন, বাঃ সাঃ ইঃ ১২।৩, ইংরেজিতে লেখা, 'বাঙলার ইতিহাস' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)। রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ পর্ব খ্রীঃ ১৫৩২-'৩৩এ চৈতন্যের তিরোধান কালে রচিত।

আরও কিছুকাল পরে (১৫৬৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে?) দ্বিজ রঘুরাম উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের জন্ম রচনা করেন আর একখানি 'অশ্বমেধ-পাঞ্চালী'—তখন সুলেমান কররাণীর হাতে মুকুন্দদেব নির্জিত।

কোচবিহারের ভারত-কাব্য : চৈতন্ত-পর্বে ষোড়শ শতাব্দীর ভারত-পাঁচালীর কবিদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন 'নলদময়ন্তী কাহিনী'র (খ্রীঃ ১৫৪৪-৪৫) রচয়িতা পীতাম্বর। হয়তো তিনিই কোচবিহারের রাজা সমরসিংহের আদেশে লিখেছিলেন 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' ও ভাগবতের দশম স্কন্ধ। কিন্তু কোচ-বিহারের কবি অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতীর 'মহাভারত পাঁচালী' আরও উল্লেখ-যোগ্য। কোচবিহারের রাজা নর-নারায়ণ (খ্রীঃ ১৫৩৮-১৫৮৭ ?) ও রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়) আশ্রয়ে একটি কবি ও পণ্ডিতের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার বিশেষ তাৎপর্য বোঝবার মত (পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সম্ভবত অনিরুদ্ধের অগ্রজ কবিচন্দ্র ছিলেন রাজার সভাকবি। কিন্তু অনিরুদ্ধ যে কবি ও ভক্ত তাতে সন্দেহ নেই। তিনি কামরূপের ব্রাহ্মণ; কোচবিহারের রাজসভায় তখন 'গৌড়ে কামরূপে যত পণ্ডিত আছিল' তাঁরা সমবেত হয়েছেন; কামরূপীয় সাহিত্যের শঙ্করদেবও সেখানে এসেছিলেন। অনিরুদ্ধ সেখানে শুক্লধ্বজের নির্দেশে লিখলেন 'ভারত-পয়ার'—বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব; এবং শেষে শুক্লধ্বজের কৃত ব্যাখ্যা মত 'জয়দেব' নামক কাব্যও। অনিরুদ্ধের ভারত-পাঁচালী উত্তরবঙ্গে প্রচলিত হয়।

সপ্তদশ শতকে মহাভারত-রামায়ণের প্রধান এক রচনা-ক্ষেত্র ছিল উত্তর-বঙ্গে, কোচবিহার রাজাদের উৎসাহে, পৃষ্ঠপোষকতায় তার প্রথম পত্তন হয়। ষোড়শ শতকেই অনিরুদ্ধ 'রাম সরস্বতী' থেকে এ রচনা-ধারার প্রারম্ভ। তারপর সপ্তদশ শতকে কিরাত পর্বের কবি কবিশেখর ও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ভারত-পাঁচালীর নাম করা যায়; আরও অনেকে দু'এক পর্ব করে রচনা করে-ছিলেন। এসব লেখায় সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক্, কোচবিহারের রাজাদের বিষয়ে তথ্য কিছু কিছু তাতে পাওয়া যায়।

কাশীদাসী মহাভারত : বাঙ্‌লা মহাভারতের প্রধান কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত-সপ্তদশ শতকের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে (খ্রীঃ ১৬০২ ১৬১০-এর) লিখিত বলে অনুমান করা হয়। কাশীদাসএখন কৃত্তিবাসের মতোই একছত্র কবি। তাঁর পরিচয় সুবিদিত, তাঁর কাব্যেও তা রয়েছে। বর্ধমানের 'ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গি (সিদ্ধি ?) গ্রামে'। তাঁর পিতার নাম

কমলাকান্ত (দেব ?), জাতিতে তাঁরা কায়স্থ এবং সাধনায় কবি পরিবার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ; কনিষ্ঠ গদাধর 'জগন্নাথ মঙ্গল' বা 'জগৎ মঙ্গলে'র কবি, আর কাশীদাস 'মহাভারত'-কার। গোটা পরিবারই বৈষ্ণবভাবাপন্ন, তাতে সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে, কাশীরাম 'আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর' লিখেই স্বর্গপুরে যান এবং অষ্টাদশ পর্ব সমাপ্ত করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, তাতে ক্ষতি নেই। 'কাশীদাসী মহাভারতে' আমরা একাধিক কবির লেখা পাই— বাঙালীর এই ভারত-পাঁচালী স্রোতেও এসে মিশেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির কাব্যপ্রবাহ, তাতে বৈষ্ণব ভক্তিরসের মাত্রাটা বেড়েছে। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য দুইই কাশীদাসের ছিল।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুদীর্ঘকাল মানুষ পান করেছে এই কাশীদাসী অমৃত। শুধু শ্রীরামপুরের [illegible]য়ের কৌশলে তা ঘটে নি। মূল মহাভারতের বিরাট ব্যাপ্তি ও [illegible] ঐশ্বর্য কোথা থেকে আসবে বাঙলায় ? কিন্তু কাশীদাসে একটা [illegible] ও স্নিগ্ধতা আছে ; তা ভক্তিমিশ্রিত সহজ ধর্মবোধ-সংযোগে জাতীয় [illegible]ত করেছে, জাতীয় মনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ মহাভারতও গঠিত হয়ে [illegible]ছে। কৃত্তিবাসের মতোই কাশীদাসকেও এই বিশেষ অর্থে লোক-কাব্য বলা চলে।

মহাভারতের আংশিক ও সম্পূর্ণ রচনা নিয়ে বাঙলা মহাভারত ৩০ খানার মতো পাওয়া যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেরও রচিত মহাভারত আরও রয়েছে, তালিকা বাড়ানো যাবে। পূর্ববঙ্গের লেখকও আছেন,—রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি ; সে সব কবিদের লেখা মিশে গিয়েছে সে অঞ্চলের 'সঞ্জয়ের মহাভারতে' (সঞ্জয় নামীয় কবিও ছিলেন)। সঞ্জয়ের মহাভারত নিয়ে তাই বাঙলা সাহিত্যে বহু আলোচনা হয়েছে এক সময়ে (বঃ সাঃ পত্রিকা, ৩৪।১)

রামায়ণ

কৃত্তিবাসের পরে রামায়ণ-কাহিনী যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন ? অনেকে কৃত্তিবাসের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছেন। হয়তো কৃত্তিবাসেরই তাঁরা অনুকারক ছিলেন। সপ্তদশ শতকে তেমন বিশিষ্ট

রামায়ণ আর পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের মনসা-মঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্তা চন্দ্রাবতীর নাম আজও আমাদের মুখে মুখে। তাঁর একটি রামায়ণ বা রামায়ণের গাথা ও-অঞ্চলে চলে, আজ সকলের তা সুপরিচিত। এ লেখা যদি চন্দ্রাবতীর বলে—বা তৎকালীন বলেও—নিঃসন্দেহ হওয়া যেত, তা হলে ষোড়শ (বা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের?) কবি বলে নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতী এখানে গণনীয়া হতেন। বাঙ্‌লার 'প্রথম স্ত্রীকবি' খ্যাতির জন্য তথাপি চন্দ্রাবতী নমস্তা। তবে রামায়ণ-গায়ক হিসাবে উত্তরবঙ্গের 'অদ্ভুত আচার্য'ই প্রধান উল্লেখযোগ্য। তাঁর আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য, 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ কথা' রচনা করেছেন-বলেই এখন তাঁর এই পরিচয়। পাবনা জিলার সোনাবাজু পরগণার বড়বাড়ি গ্রামে ছিল অদ্ভুত আচার্যের নিবাস; জীবন-কাল কেউ কেউ আকবরের কালেও অনুমান করেছেন। কবি রামায়ণ-গায়ক ছিলেন, স্বয়ং রঘুপতি তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন—'কিছু গাও শুনি।' ভুলুয়ার (নোয়াখালী) দ্বিজ ভবানী দাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী' কাব্য অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত হয়। কবি ভুলুয়ার রাজা জগৎ মাণিক্যের আদেশে এ গ্রন্থ লেখেন, দক্ষিণাটা ('দিনে দশ মুদ্রা') নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে বলেছেন—[illegible] কবিত্ব-খ্যাতি বাড়ে নি। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে রামায়ণের আরও রচ[illegible] প্রকাশিত হলেন—যেমন কোচবিহার ও বিষ্ণুপুরের কবিরা ও [illegible] চক্রবর্তী ও ফকিররাম কবিভূষণ। কিন্তু মোটের উপর সপ্তদশ শতকে [illegible] রামায়ণের কবি বেশি নেই। অবশ্য কামরূপীয়া 'শ্রীরাম পাঁচালী'র ক[illegible] মাধব কন্দলী ও উত্তরাকাণ্ডের শঙ্করদেব প্রভৃতি রামায়ণ-ধারার স্মরণীয় কবি (পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙলা সংস্কৃতির প্রসার ও বিবিধ কাব্যধারা

(খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০)

হুসেন শাহ, নুসরৎ শাহ যখন বাঙলা কাব্য সৃষ্টির উৎসাহ-দাতা হয়ে উঠলেন তখন তাঁদের দৃষ্টান্ত যে তাঁদের সামন্ত ও সেনাপতিরাও অনুসরণ করবেন, তা সহজেই বোঝা যায়। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ-এর প্রচেষ্টা তারই প্রমাণ। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য রাজসভায় জন্মে নি, রাজ-কৃপায় লালিত-পালিত হবার সুযোগও তার ভাগ্যে বিশেষ জোটে নি। প্রধানত রাঢ়ের পল্লীকেন্দ্রে, হয়তো পল্লীর 'রাজা' বা জমিদারের উৎসাহে তার অনুশীলন দেশব্যাপী হয়ে উঠেছিল বলেই গৌড়ের সুলতানরাও ক্রমে তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়ছিলেন। পল্লীর লৌকিক আসর থেকেই সে পৌঁছেছিল রাজসভার দ্বারে,—সভায় চলত ফারসিই;—পাঠান রাজত্ব শেষ হয়ে গেলে মোগল-রাজত্বে বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে আর এ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাই, এ সময়ে বাঙলার সীমান্তে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাজাদের রাজসভায় বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি সৃষ্টি-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে ছিল কামতা-কামরূপের বা কোচ রাজবংশের রাজসভা; পূর্ববঙ্গে ছিল ত্রিপুরা ও আরাকানের (রোসাঙ্গের) রাজসভা; এবং পশ্চিমবঙ্গে মল্লভূমি-ধলভূমের রাজসভা।

নৃ-বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা প্রথমেই হয়তো লক্ষ্য করতে বলবেন যে, এ সব রাজশক্তি ও শাসক-গোষ্ঠী আসলে কেউ পুরাতন বা নতুন আর্যভাষী গোষ্ঠীর নয়। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে সীমান্ত রাজ্যগুলি ছিল 'কিরাত'-জাতির দেশ ও রাজ্য, অর্থাৎ প্রধানত মঙ্গোলয়েড্-জাতির মানুষের দেশ। তাদের পূর্বে ওসব অঞ্চলে 'নিষাদ' বা অস্ট্রিকজাতির অধিবাসীরাও ছিল এবং অস্ট্রিকদের দানও কিছু কিছু স্বীকৃত করে নিয়েছিল আগন্তুক মঙ্গোল জাতির বিজেতারা। এসব জাতির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কীর্তির সুগ্রথিত বিবরণ উপস্থিত করেছেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কিরাত-জন-কৃতি' নামক তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল,

১৯৫১)। পশ্চিমবঙ্গের মল্লভূম ধলভূমের রাজশক্তি ও শাসকশক্তিও হয়তো আসলে সেই নিষাদ ও দ্রাবিড় মিশ্রিত উপজাতিদেরই থেকে উদ্ভূত। মঙ্গোল কিরাত প্রভাব যখন উত্তর উড়িষ্যা ও গোণ্ডদেরও স্পর্শ করছে বলে মনে করা হয়, তখন এদেরও স্পর্শ করে থাকবে। (তুলনীয় জে. এচ. হাটনের মত—'কিরাত-জন-কৃতি'তে উল্লেখিত, পৃঃ ৭১; এবং কোল ও কিরাত পরস্পরের সম্পর্ক, ঐ, ২৯ স্তবক।)

কিরাত-অঞ্চল

নেপালে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ বিহার-বঙ্গ-কামরূপ অঞ্চলেও কতকাংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল 'হিমালয়-প্রান্তিক মঙ্গোলয়েড্' মহাশাখার মানুষ। উত্তরবঙ্গের কোচ্‌রা ছিল বোডো-মহাশাখার মঙ্গোলয়েড্ বা কিরাত জাতি। কাছাড়ি, গারো, মেচ, রাভা, এবং টিপ্‌রা (ত্রিপুরা) প্রভৃতি জাতিরা এই বোডো মহাশাখার অন্তর্গত। হাজার বৎসর আগে প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ও আসামে বোডো জাতির নানা শাখাই বসবাস করত, এখন অবশ্য আর তারা ততটা বিস্তৃত নয়। অহোমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রধান হয়। খাসীরা জাতিতে কিরাত গোষ্ঠীর হলেও তাদের ভাষা রয়ে গিয়েছে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর, মুণ্ডারির দূর-জ্ঞাতি'—আমরা তা জানি।

কুকি-চীনা ও নাগা প্রভৃতি জাতিরা আসাম-বর্মা মহাশাখার মঙ্গোলয়েড্। এর মধ্যে কুকি-চীন গোষ্ঠীর মোঙ্গল জাতিরা মণিপুর রাজ্যের (মেইথেই) ও লুসাই পাহাড়ের প্রধান অধিবাসী। কুকি জাতি সেখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে (টিপরাইরা অবশ্য বোডো মহাশাখার) বিস্তৃত হয়েছে, আর পার্বত্য চট্টগ্রামে কুকি-চীন জাতিরই দেশ। আরাকান অবশ্য এখন বর্মী-ভাষীদের জেলা। কিন্তু মনে হয় আরাকানের মোন্-জাতীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আদিবাসীদের সঙ্গে প্রথম এসে মিশেছিল চট্টগ্রামের পথে ত্রিপুরা-নোয়াখালীর দিক্‌কার বোডো মহাশাখার মঙ্গোলয়েড্‌রা এবং তারপরে পার্বত্য-চট্টগ্রামের কুকি চীন-ভাষী মঙ্গোলয়েডরা। বর্মী-ভাষী 'ম্রান-মা' জাতি খ্রীঃ ১২৮০ পর্যন্তও এ অঞ্চলে প্রবেশ করে নি। আরাকান তাই বর্মী-জাতির সীমান্তপারের দেশ হয়ে ওঠে তার অনেক পরে (কিরাত-জন-কৃতি পৃঃ ৮৭)।

কিরাত অঞ্চলে বাঙলার প্রসার : হিন্দ্-মঙ্গোলয়েড্‌দের এই তিন মহাশাখা—যথা, হিমালয়ী মঙ্গোলয়েড্ (নেওয়ারী), ভোটচীনা বোডো ও আসামবর্মী (কুকিচীন)—বাঙলা ভাষার সম্পর্কে আসে।

বাঙলার হিন্দ্-আর্য সভ্যতার ধারা এসব প্রত্যন্ত জাতিদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টেনে অঙ্গীভূত করে নিচ্ছিল। রাঢ় থেকে সে স্রোত প্রবাহিত হয় মল্লভূমের দিকে। নেপালের পথে গৌড়-মৈথিল-নেওয়ারী নেতৃত্বে তা চলে তিব্বতে চীনে। গৌড় ও বিহারের পথে তা পূর্বাপর চলেছে কামরূপ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরে পূর্বদিকে। পট্টিকের (কুমিল্লা) চট্টগ্রাম-আরাকান থেকে তা যায় ব্রহ্মে ও বহির্ভারতে। তাই বঙ্গ ও পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি থেকে (বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এই অঞ্চল দিয়ে) এ সভ্যতার ধারা সুর্মা উপত্যকার পথে শ্রীহট্ট-কাছাড়-মণিপুরের দিকে বিস্তৃত হয়, এবং ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামেও গিয়ে পৌঁছে। এ বিস্তৃতি অবশ্য সর্বত্র সমভাবে ঘটে নি, আর একই সাংস্কৃতিক তরঙ্গ যে সর্বত্র গিয়ে পৌঁছেছিল তাও নয়। কিন্তু তুর্ক বিজয়ের পূর্ব থেকেই যে প্রসার আরম্ভ হয়েছিল (দ্রষ্টব্য : কিরাত-জ-ক, ৪৪, ৮০, ইত্যাদি) তুর্ক বিজয়ের পরে তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ইতিহাসেও এখানে-ওখানে তার চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়—দনুজমর্দন দেবের মতো রাজার মুদ্রা থেকে, কিরাত নামের সঙ্গে কিরাত রাজাদের সংস্কৃত নাম গ্রহণ থেকে, হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ থেকে। যেমন, আমরা দেখি দনুজমর্দন দেব (খ্রী: ১৪১৬-১৪১৮) 'চণ্ডী-চরণ পরায়ণ' ; কামতা-কামরূপের নরনারায়ণ 'শ্রীশ্রী শিব-চরণ-কমল-মধুকর ; কাছাড়ের যশোনারায়ণ (খ্রী: ১৮৫৩, 'হর-গৌরী-চরণ-পরায়ণ' ; জয়ন্তীপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ (খ্রী: ১৬১৯) 'শিব-চরণ-কমল-মধুকর', ইত্যাদি। অর্থাৎ কাল হিসাবে দেখি সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এই হিন্দ্-কিরাত সংস্কৃতি প্রায় সর্বত্রই উদ্ভূত হচ্ছে বা হ[illegible] অনেক সময়ে হিন্দু দেবদেবীরা এই সব জাতির নিজস্ব দেবদে[illegible] কুক্ষিগত করে নিয়েছেন, অথবা তাদের সহযোগী করে নিয়েছেন (যেমন, ত্রিপুরী ও মণিপুরীদের মধ্যে); প্রায়ই রাজারা চন্দ্রবংশের নামে আপনাদের পরিচয় স্থির করে নেন (যেমন, মণিপুরীরা, অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার বংশধর ; কাছাড়ের রাজারা ভীম-হিড়িম্বার বংশধর, ইত্যাদি); [illegible]-তান্ত্রিক ক্রিয়াদির সঙ্গে কখনো তাদের আদিম পশুবলি, [illegible] খাপ খেয়ে যায় ; কখনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পাশাপাশি সসম্মানে

টিকে আছেন তাদের আদি-দেবদেবীর পুরোহিতরাও (যেমন, ত্রিপুরার 'চণ্ডাই', 'দেওয়াই', প্রভৃতি)। এভাবে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতিধারার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয়, 'হিন্দমঙ্গোলয়েড্ কৃতি' (দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত 'কিরাত-জন-কৃতি', ৪০)। এই সংস্কৃতির প্রধান বাহন হতেন বাঙালী ব্রাহ্মণ (নেপালে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, নাথ গুরুরাও); তাদের শাস্ত্রীয় মাধ্যম হত সংস্কৃত ভাষা (নেপালে প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ) ও বাঙলা ভাষা এই সব জাতির মধ্যে তাই বাংলা ভাষা একটা প্রতিষ্ঠালাভ করে। গাড়ো, খাসী-জয়ন্তিয়া, মণিপুরী প্রভৃতি কিরাত গোষ্ঠীর জাতিরা তথাপি বাঙলা ভাষা গ্রহণ করে নি; কাছাড়ীরা (ডিমাপুর) সাহিত্য সৃষ্টি করে নি। বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্র হিসাবে এই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গণনীয় হয় প্রধানত কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান; নেপালে অবশ্য তৎপূর্বেই বাঙলা ও মৈথিলীর অনুশীলন সুদৃঢ় ছিল।

মল্লরাজারা এই কিরাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁরা বাঙালী বৈষ্ণব ধর্মের ও সাহিত্যের ক্রমশ প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। অবশ্য 'কবীন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি বিষ্ণুপুরী কবিরা অষ্টাদশ শতকের চৈতন্যদেবের পরে ওড়িষ্যায়ও বাঙলা বৈষ্ণব গ্রন্থ কিছু রচিত হয়, সে সবের যা উল্লেখযোগ্য চৈতন্য-সাহিত্যের মধ্যেই তা উল্লেখিত হয়েছে।

নেপালের রাজসভা

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল নেপালে। সপ্তদশ শতক পর্যন্তও নেপাল গোর্খাদের রাজ্য হয় নি; মঙ্গোল-গোষ্ঠীর নেওয়ারীদেরই রাজ্য ছিল, সর্বরকমে তাদেরই স্বদেশ। গোর্খারা আর্যভাষা গোষ্ঠীর রাজপুত; [illegible]দের কুমায়ুন অঞ্চল থেকে এসে গোর্খা-জাতি নেপাল জয় করে মাত্র ১৭[illegible] খ্রীষ্টাব্দে,—অর্থাৎ পলাশীরও পরে। গোর্খা শাসক-জাতির পৌনে দু'শত বৎসরের শাসন ও বিরোধিতায় পরাজিত নেওয়ারী জাতি শুধু নির্জিত হয় নি: নেওয়ারী ভাষা, নেওয়ারী সাহিত্যও প্রায় বিলুপ্তির দিকে যায়। কিন্তু নেওয়ারী সংস্কৃতি বা নেওয়ারী আমলের সংস্কৃত-তিব্বতী ও বাঙলায় লিখিত অমূল্য বৌদ্ধ ও হিন্দু পুঁথিপত্র তথাপি রক্ষা পেয়েছে 'চর্যাপদে'র আবিষ্কার সম্পর্কেই আমরা তা দেখেছি। নৃ-তত্ত্বের

নেওয়ারীরা 'হিমালয়-প্রান্তিক মঙ্গোলয়েড' মহাশাখার মানুষ। পাল যুগেই তিব্বত ও মিথিলা-গৌড়ের মধ্যস্থলে নেওয়ারীরা এক নিজস্ব সংস্কৃতির সেতু যোজনা করে; এইরূপে নেওয়ারী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। নেওয়ারী সংস্কৃতিতে দান যুগিয়েছেন তখন বাঙালী ও মৈথিল পণ্ডিতেরা। চতুর্দশ শতকে মিথিলার রাজ্য হারিয়ে মিথিলেশ্বর হরি সিংহ (হরসিংহ)-দেব নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঙালী ব্রাহ্মণরা ছিলেন ভাতগাঁওএর মল্লরাজাদের রাজগুরু, 'রাজোপাধ্যায়' নামে পরিচিত। গোর্খা বিজয়ে তাঁরাও প্রভাব প্রতিপত্তি হারান; তার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা বাঙলা দেশের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতেন। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকেরও কিছুকাল নেপালের ভাতগাঁও, কাঠমুণ্ড, পাটণ, এই তিন রাজসভাতেই বাঙলার অনুশীলন চলেছিল। নেওয়ারী রাজা ও রাজগুরুদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেপালে বাঙলা নাটক অভিনীত হত—তার গদ্যাংশ, অভিনয়-নির্দেশ প্রভৃতি থাকত নেওয়ারীতে। কাব্যাংশ বাঙলা অনেকটা মৈথিলীমিশ্রিত বাঙলা ব্রজবুলির অনুরূপ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে এ সব পুঁথি রয়েছে; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও চারখানি 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' প্রকাশিত করেছেন (অন্যান্য বিবরণ দ্রষ্টব্য—ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত প্রবন্ধ, বঃ সাঃ পত্রিকা, ৩৬এ; এবং ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সঃ ইতিহাস—প্রীঃ ৩৯৭-৯৯)। সর্বাপেক্ষা পুরনো নাটক (চতুর্দশ শতকের?) 'রামাঙ্ক নাটিকার' লেখক রাজগুরুর পুত্র ধর্মগুপ্ত 'বাল বাগীশ্বর'। নাটকটি লেখা সংস্কৃতে প্রাকৃতে; কিন্তু লৌকিক ভাষায় কথাবস্তু দেওয়া হয়েছে নাটকের শেষে। সপ্তদশ শতাব্দীর ভাতগাঁওয়ের রাজা জগজ্জ্যোতি মল্লদেব ও তাঁর পুত্র জগৎপ্রকাশ মল্লদেবের নামেও নাটক ও পদ রয়েছে। পাটনের (ললিতাপুরের) সমসাময়িক রাজা সিদ্ধি নরসিংহ দেবের সভায় (সপ্তদশ শতকে) রচিত হয় 'গোপীচন্দ্র নাটক' (পরে দ্রষ্টব্য)। কাঠমুণ্ডের রাজা 'কবীন্দ্র' প্রতাপ মল্লদেবের নামে একটি সঙ্গীত-শাস্ত্রের বই ও বৃষ্টির স্তোত্র আছে। ভাতগাঁওয়ের রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লদেব (অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে) ও শেষ রাজা রণজিৎ মল্লদেবের নামে অনেক পদ পাওয়া যায়। কাশীনাথ কৃত 'বিদ্যাবিলাপ', কৃষ্ণদেব-কৃত 'মহাভারত' ও গণেশ-কৃত 'রাম-চরিত্রে'র (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত, ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যো-পাধ্যায় সম্পাদিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' চারখানার অন্তর্ভুক্ত) ভণিতায় ভাতগাঁওয়ের এই শেষ দুই মল্লরাজা ভূপতীন্দ্র ও রণজিতের উল্লেখ রয়েছে;

অতএব তা অষ্টাদশ শত,ব্দীর রচনা। এ বাঙ্‌লা মৈথিলী-নেওয়ার প্রভাবিত, পড়া কষ্টকর, কিন্তু নাট-গীত হিসাবে এ সাহিত্য স্মরণীয়, এবং পদসমূহও কবিত্ব-বর্জিত নয়। তথাপি প্রধানত, বাঙালী সংস্কৃতির একটা বিলুপ্ত অধ্যায়ের চিহ্ন হিসাবেই এ সব মূল্যবান্।

কামরূপ-কামতা ও কোচবিহারের রাজসভা

কামরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ্য। তুর্করা এ রাজ্য বার বার আক্রমণ করেও জয় করতে পারে নি। যে রাজবংশই তখন রাজত্ব করুক, তুর্করা বলে কামরূপের সাধারণ অধিবাসীরা ছিল কোঁচ, মেছ, আঁড়ু ; অর্থাৎ মঙ্গোলয়েড্ গোষ্ঠীর মানুষ। কামরূপে ও উত্তরবঙ্গে কোঁচেরা শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছিল পালরাজত্বের শেষদিকে, হয়তো দশম শতকেই। আসামে দুর্ধর্ষ অহোম্‌জাতির অভ্যুদয়ে কামরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে (সু-কাংফার সময়ে, খ্রীঃ ১২২০-১৩৩২) আহোমদের নিকট নতি স্বীকার করে। এক শতাব্দী পরে দেখি অহোম রাজা সু-হুঙ্গ-মুঙ্গ (খ্রীঃ ১৪৯৭-১৫৩৯) নাম গ্রহণ করেছেন 'স্বর্গ-নারায়ণ'। মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত আক্রমণ ঠেকিয়ে হিন্দু-মঙ্গোলয়েড্ অহোম-শক্তি সগৌরবে রাজত্ব করেন খ্রীঃ ১৭০৫ পর্যন্ত ; তারপরে তার পতন আরম্ভ হয়। এদের রাজত্বকালেই বাঙ্‌লা থেকে অসমীয়া সাহিত্যও স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকে।

কোঁচশক্তির কামরূপে অভ্যুদয় ঘটল বিশা কোঁচ বা বিশ্বসিংহের (খ্রীঃ ১৪৯৬-১৫৩৩) রাজত্বে। কোঁচদের মধ্যে কথিত হয়—বিশা শিব ও কুচ্‌নীর পুত্র ; শিব দুর্গার তিনি ভক্ত, গৌহাটির কামাখ্যা দেবীর আরাধক। নিজ পুত্রদের তিনি কাশীতে বিদ্যালাভ করতে পাঠান। পুত্রদ্বয় নর-নারায়ণ (খ্রীঃ ১৫৩৩ বা ১৫৪০-১৫৮০) ও শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) ছিলেন প্রায় আকবরের সমসাময়িক। কাশী থেকে শিক্ষালাভ করে দু ভাই ফেরেন, উত্তর বঙ্গ থেকে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা পর্যন্ত তাঁরা রাজ্যবিস্তার করেছিলে, কামাখ্যা মন্দিরও তাঁরা পুনর্নির্মাণ করেন, বিশেষ করে পৌরাণিক অনুবাদে উৎসাহ দেন ; বৈষ্ণব আন্দোলনেরও তাঁরা ছিলেন সহায়ক। আসামের বৈষ্ণব গুরু শঙ্করদেব এই কোঁচরাজাদের রাজ্যে তাঁর ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই রাজসভায় মহাভারত রামায়ণ ভাগবতের কাহিনী নিয়ে বাঙলা কাব্য

রচনার আগ্রহ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চলে। যথাস্থানে তা উল্লিখিত হয়েছে।

কামরূপীয়া সাহিত্য ঃ এই অঞ্চলের বাঙলা কবি-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের যাঁরা আদি-কবি বলে গণ্য সেইসব ভক্ত, পুণ্যচরিত কবিরা—মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব ও মাধবদেব। তাঁদের কাব্য উত্তরবঙ্গের তৎকালীন বাঙলা ভাষা কামরূপীয়াতে রচিত ; সে কামরূপীয়া বর্তমান অসমীয়া অপেক্ষা বর্তমান বাঙলারই নিকটতর। অবশ্য তাঁদের লেখাতে মৈথিলীর প্রভাবও দেখতে পাই প্রচুর, তাঁরাও 'ব্রজবুলি'তে পদ রচনা করেন।

মাধব কন্দলীর 'শ্রীরাম পাঁচালী' (খ্রীঃ ১৫৮৬?) স্বাধীন কামতার প্রাচীনতম কাব্য-নিদর্শন। লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত তা পাওয়া যায়, উত্তরাকাণ্ড পাওয়া যায় শঙ্করদেবের লেখা।

শঙ্করদেব মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁর অগ্রজ হলেও, মনে হয় শতাধিক বৎসর জীবিত থেকে তিনি দেহত্যাগ করেন খ্রীঃ ১৫৬৮তে। তিনি শুধু বাঙলার চৈতন্যের মতোই আসামের বৈষ্ণব-আন্দোলনের প্রবর্তকমাত্র নন, তিনি কামরূপ-সাহিত্যেরও প্রবর্তক। ব্রহ্মপুত্র তীরে বড়দোয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম। তিনিও কৃষ্ণ নাম বিতরণ করে দেন আশূদ্র সকলকে। স্বভাবতই অহোম রাজ্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এই কায়স্থ বৈষ্ণব গুরুর বিরোধী হয়ে ওঠেন। কারণ, শ্রাদ্ধ-শান্তি কিছুই তিনি অনুমোদন করেন না :

> কৈবর্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
> একলগে খায় দুধ চিড়া ফল যত ॥

এতটা দুঃসাহস শ্রীচৈতন্যেরও হয়েছিল কিনা সন্দেহ। শঙ্করদেব তাই আশ্রয় গ্রহণ করলেন এসে কামতা রাজ্যের রাজা নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের কাছে। তাঁদের সুখ্যাতিও তাঁর লেখায় প্রচুর। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড ছাড়া তিনি ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করেন। আর লেখেন 'শ্রীরাম-বিজয় নাট' ও 'রুক্মিণী-হরণ নাট'—প্রথম দিককার বাঙলা গদ্যের দৃষ্টান্তও মিলে এইসব 'নাটে' (দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ সেন, ইতিহাস ১৮।৪)। তাঁর শিষ্য মাধবদেব লেখেন 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'কংসবধ যাত্রা'। মাধবদেব শেষ-জীবনে বড়পেটা ছেড়ে পশ্চিম কামতার রাজ্য লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শঙ্করদেবের ও শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে সাক্ষাৎ ঘটেছিল, এ কথা জানা যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক; কিন্তু সে পরিচয়ের কোনো উজ্জ্বল রেখা চৈতন্য-জীবনীতে অন্তত খুঁজে পাওয়া যায় না। শঙ্করদেবের শিষ্যদের মধ্যে অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পরে এ নিয়েই দুটি মতবাদ দেখা দেয়। 'দামোদরিয়া' সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণ দামোদর, তাঁরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতেন। আর 'মহাপুরুষিয়া' দলের নেতা ছিলেন কায়স্থ মাধবদেব; তাঁরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতেন না। কামরূপ থেকে যে বৈষ্ণব-ধর্ম আসাম প্রদেশে বিস্তৃতিলাভ করে তা প্রধানতঃ মহাপুরুষিয়াদেরই প্রচারিত। এ মতবাদে ভক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু মধুর রসের মাতামাতিটা ছিল কম।

আসামে বৈষ্ণব-ধর্মের গুরু হিসাবে শঙ্করদেব স্বভাবতই আজ অসমীয়া সাহিত্যেরও উৎস-মুখ; তাঁদের 'নাট্যকাব্য', তাঁদের 'নামঘোষা', 'কীর্তন-ঘোষা' প্রভৃতি এই গুরুরই দানে পরিস্ফুট। কিন্তু কামরূপীয়া কাব্যধারার কবি হিসাবে মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব ও মাধবদেব বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও প্রধান তিন কবি,—আমরা তা মনে না রাখলেও এ সত্য সত্যই থাকবে।

কোচ-সাম্রাজ্য অবশ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ পুত্রদের মধ্যে প্রথমত দুইভাগে রাজ্য বিভক্ত করলেন: উত্তরবঙ্গে পড়ে কোচবিহার, এবং গোয়ালপাড়ায় থাকে কোচ-হাজো রাজ্য। ক্রমেই কোচ রাজ্য আরও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। অনেক যুদ্ধের শেষে মোগল সাম্রাজ্যের বশ্যতাও তারা স্বীকার করে। কিন্তু এই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে উত্তরবঙ্গে কোচবিহারের রাজসভা বাঙ্‌লা সাহিত্য-সৃষ্টির একটি ধারার উদ্বোধন করেছিলেন, তাতে ভুল নেই।

ত্রিপুর রাজসভা

কোচবিহারের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যের দান বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে সামান্য। এখনো আগড়তলা প্রভৃতি বড় বড় কেন্দ্রগুলির বাইরে দূর অঞ্চলে টিপ্‌রারা তাদের বোডো ভাষা পরিত্যাগ করে নি, কিন্তু ইংরেজ আমলেও বাঙ্‌লা রাষ্ট্রভাষা ছিল মাত্র একটি রাজ্যে—সে রাজ্য 'স্বাধীন ত্রিপুরা'। প্রথম দিকে কাছাড়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারপর ত্রিপুর-রাজ রত্নফা (আনুমানিক খ্রীঃ ১৩৫০) রত্নমাণিক্য নাম গ্রহণ করেন।

বহু বাঙালী উচ্চবর্ণ পরিবারকে আনিয়ে তিনি রাজ্যে সংস্কৃত ও বাঙলা চর্চার গোড়াপত্তন করেছিলেন। এক-শতাব্দী পরে ত্রিপুরার রাজা হন ধন্য-মাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৬৩-১৫১৫) তিনি চট্টগ্রাম ও আরাকান অধিকার করাতে হুসেন শাহ্-এর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সূচনা হয় (খ্রীঃ ১৫১৩)—সেই যুদ্ধেই সম্ভবত নুসরৎ শাহ ও পরাগল খাঁ প্রেরিত হয়েছিলেন গৌড় থেকে। কিন্তু 'ছুটিখানী মহাভারত' যাই বলুক, ধন্যমাণিক্য শেষ পর্যন্তও পরাজিত হন নি। তাঁর অল্প পরেই রাজা হন বিজয়মাণিক্য (খ্রীঃ ১৫২৯-১৫৭০)—তিনিও আকবরের সমসাময়িক। পূর্ববাঙলার পাঠান শক্তি তখন বিধ্বস্ত, মোগল সাম্রাজ্যও তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি; তখন ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্য সোনারগাঁ বিক্রমপুর পর্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করেন। এর পরে টিপ্রা শক্তি ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুর-রাজ যুদ্ধে বন্দী হন; তিনি মুক্তিলাভ করে বারাণসী ও বৃন্দাবন চলে যান। কিন্তু ত্রিপুর-রাজ্য বাঙলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

বাঙলা সাহিত্যে ত্রিপুর রাজসভার প্রাচীন কীর্তি হল 'রাজমালা'—পয়ারে লেখা রাজবংশের কথা। ইতিহাসের থেকে তাতে পৌরাণিক কাল্পনিকতা অনেক বেশি; তবু তা বাঙলা সাহিত্যে মূল্যবান। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে দুই ব্রাহ্মণ ও চংতাই দুর্লভচন্দ্রের সহযোগে ধন্যমাণিক্য রাজবংশের এই কাহিনী সংকলন করান; খ্রীঃ ১৬৬০ ও শেষে খ্রীঃ ১৮৩০-এ তাতে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়। একে ত্রিপুরার পুরাণ বলা চলে। বিজয়মাণিক্য ও গোবিন্দমাণিক্যের উৎসাহে সংস্কৃত গ্রন্থেরও বাঙলায় অনুবাদ হয়েছিল। তাই বাঙলা রচনার একটা ঐতিহ্য সেখানে জন্মে; বাঙলা পুঁথিও ও-অঞ্চলে দুর্লভ নয়—(ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এসব পুঁথিপত্রের সংবাদ আমাদের যুগিয়েছেন)। পুঁথির কাল অনেক সময় অনিশ্চিত, সাহিত্যিক মূল্যও অনিশ্চিত।

মণিপুরে বাঙলা-সংস্কৃতি

মণিপুর রাজ্যের কুকি-চীনদের ইতিহাস অবশ্য কৌতূহলোদ্দীপক। তাদের নিজেদের গাথা, কাহিনী, পুরাণ খুব চিত্তাকর্ষক; কিন্তু মণিপুরে এসব লেখা হয়েছে মেইথেইদের নিজস্ব মণিপুরী ভাষায়। মণিপুরে চৈতন্য-দেবের বৈষ্ণব-ধর্ম আজ সর্বব্যাপী, তার মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতি মণিপুরী

জীবনে ও সাহিত্যে একটি ছাপ এঁকে দিয়েছে। সম্প্রতি তার উপর 'হিন্দী' রাষ্ট্রভাষাও চেপে বসছে। কিন্তু চৈতন্যধর্ম মণিপুরে বিস্তারলাভ করে অনেক পরে—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। শ্রীহট্ট থেকেই এ ধর্ম মণিপুর যায়। শ্রীহট্ট চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি,—বেশ বোঝা যায় বৈষ্ণব ঐতিহ্য শ্রীহট্টে কায়রূপে বরাবর ছিল। শ্রীহট্ট অদ্বৈত আচার্যের জন্মভূমি; শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টেরই মানুষ; চৈতন্যদেবের পরে শ্রীহট্ট চৈতন্যধর্মের অব্যাহত ঐতিহ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে—তা বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস দেখলেও আমরা বুঝি। এখান থেকেই বাঙলাও প্রসারিত হয় মণিপুরে ও ত্রিপুরায়। মণিপুরী ভাষা (মেইথেই) অষ্টাদশ শতক থেকে বাঙ্‌লা লিপিতে লিখিত হচ্ছে। আর অন্যদিকে বাঙ্‌লার বৈষ্ণব-ধর্মকে গ্রহণ করে মেইথেই শিল্প-বোধ উদ্ভাবন করেছে অপূর্ব-সুন্দর মণিপুরী 'রাস' নৃত্যকলা। কিন্তু মণিপুর বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ কোনো দান যোগায় নি, তার নিজের সাহিত্য আছে।

আরাকান বা রোসাঙ্গের রাজসভা

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যকারের যে রাজসভার নাম চির-সমুজ্জ্বল, সে হচ্ছে রোসাঙ্গের রাজসভা। রোসাঙ্গ ছিল আরাকানের রাজধানী। অস্ট্রিক, বোডো, কুকি-চীন ও বর্মাদের ক্রম-মিশ্রিত উপাদান দিয়ে আরাকানের নৃ-বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচিত। খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম থেকেই আরাকানে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, ক্ষত্রিয়, প্রভৃতি উত্তরভারতীয় ঔপ-নিবেশিকদের সমাগম শুরু হয়; বর্তমান ম্রোহউং (আকিয়াবের সন্নিকটস্থ), বা পুরাতন বেসলি বা বৈশালীনগর, ছিল তাদেরই স্থাপিত প্রথম রাজধানী। ম্রোহউং-এ রাজা আনন্দচন্দ্রের নামে সংস্কৃত ভাষায় স্তম্ভ-প্রশস্তি আছে। চট্টগ্রাম-আরাকানে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সে প্রশস্তি থেকে তা স্পষ্ট হয়। বর্মীভাষা ব্যাপ্ত হয়ে গেলেও সপ্তদশশতক পর্যন্ত আরাকান ভারতবর্ষেরই একটি অংশ ছিল। চাটিগাঁতে পাঠান রাজারাও একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সীমান্ত রক্ষা করতেন। তারপরে সে অঞ্চলে ত্রিপুরার ধন্যমাণিক্য ও পরাগল খাঁর অভিযানের কথা আমরা। জানি ছুটি খাঁর পরে অবশ্য আর সেই পরাগলী-ঐতিহ্য বা হুসেন-শাহী ঐতিহ্যের সন্ধান সে অঞ্চলে কিছুদিন পাওয়া যায় না। তখন পাঠান-মোগল ও নানা আঞ্চলিক রাজাদের ভাগ্যপরীক্ষার কাল।

হয়, গৌড়ের সুলতানদের পতন আরম্ভ হলে (১৫৩৮-১৫৭৫) গৌড়ের মুসলমান উজীর-ওমরাহরা শ্রীহট্টে ও চট্টগ্রামের দিকে পশ্চাদ্‌গমন করে থাকবেন ; হয়তো তাঁদের সঙ্গে জৌনপুরী শর্কিদের 'শরণার্থী' অভিজাতরাও ছিলেন, তাঁরাও শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের দিকে বাস করিতে যান। শ্রীহট্টের ও চট্টগ্রামের সুফী প্রভাবিত অভিজাতরাই আরাকানের আমীর-ওমরাহ্ নিযুক্ত হতেন। আরাকান রাজসভায় আরবী-ফারসি-বিদগ্ধ এবং সুফী-মতবাদে অনুরক্ত কবিদের আবির্ভাব তাই সম্ভব হয়। এই জন্য দেখি—বিদগ্ধ মুসলমান ফারসি রচনা ছেড়ে এখন বাঙ্‌লা রচনায় উৎসাহ বোধ করলেন। বাঙ্‌লার বিভিন্ন অঞ্চলে সৈয়দ মর্তুজা, নসীর মামুদ, আলী রাজা প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকার মুসলমান ভক্ত কবিদের আবির্ভাবও সম্ভবত সহজ হয়েছিল এই সুফী-মতবাদের প্রসারে। বাঙ্‌লায় সুফী সাধনার প্রভাব শুধু কাব্যক্ষেত্রে নয়, লোক-জীবনে ও সাধন-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রবেশলাভ করেছিল। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ডঃ এনামুল হকের 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' নামীয় গ্রন্থ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি প্রবন্ধ 'ইস্‌লামিক মিস্টিসিজম্' ও ডঃ সুকুমার সেনের আলোচনা, বাঃ সাঃ ইঃ)

রোসাঙ্গ-সাহিত্যের অভিনবত্ব : আরাকানের রাজারা ছিলেন 'মগ'—অর্থাৎ বর্মাজাতীয় মানুষ, তাঁরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। বর্মীগোষ্ঠীর মগী ভাষাই তাঁরা বলতেন, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষাও চলত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে মগের অত্যাচার ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের বাঙালী জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়েছিল, এ কথাও বিস্মৃত হবার নয়। 'মগের মুলুক' কথাটা তাদের সেই কুকীর্তির স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। দয়া ধর্ম সদাশয়তা, এমন কি স্থায়ী রাজনৈতিক বুদ্ধি, এসব কোনো গুণ তাঁদের বিশেষ ছিল মনে হয় না ; কিন্তু ছিল সম্ভবত একটা রাজকীয় গুণ—বর্মার বর্মীদেরও তা ছিল :—ধর্ম-সংকীর্ণতাবর্জিত অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা। অন্ততঃ কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ এ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। এ কি 'কিরাত'-কৃতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ? হয়তো মগেরা অন্যান্য মঙ্গোলয়েড্‌দের মতো অতটা হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে নি ; মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধমূলক বাঙালী পুনরভ্যুদয় মগদের তাই কবলিত করে ফেলবার মতো সময় ও সুযোগ পায়নি ; ইস্‌লামী সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তাদের তাই কোনো বিরোধিতা জন্মেনি। বিশেষত, সুফী মতবাদের ইস্‌লাম, হিন্দু প্রেমধর্মের ও যোগ-সাধনার সঙ্গে

মিশ্রিত ও মিলিত হয়ে তাদের নিকট অনুগ্রহ মনোহর রূপেই উপস্থিত হয়েছিল। কাজেই রোসাঙ্গের রাজসভায় দেখি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দায়ে বর্জন-বুদ্ধির স্থান হয়নি।

এই রোসাঙ্গের রাজসভায় আমরা বাঙ্‌লা ভাষার প্রথম শক্তিশালী মুসলমান কবির দর্শন পাই, এবং প্রথম আদরণীয় মানবীর প্রণয়-কাহিনীর পরিচয় লাভ করি;—বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুইটি বস্তুরই গভীর অর্থ আছে।

কারণ, প্রথমত বুঝেছি—মুসলমান বিদ্বজ্জন আরবী-ফারসি চর্চা সত্ত্বেও এবার বাঙ্‌লার সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। এইটা শাসকবর্গের—এই মুসলমানদের—বাঙালীত্বেরও যেমন অবিসংবাদিত প্রমাণ, বাঙ্‌লা ভাষার সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠারও তেমনি অকাট্য প্রমাণ। বুঝতে পারি—বাঙ্‌লা সাহিত্য আর শুধু হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহিত্য নেই, এই সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠছে। তখন রাজা থিরি-থু-ধম্মার (='শ্রীসুধর্মা', আনুমানিক খ্রীঃ ১৬৩২-১৬৩৮) রাজত্বকাল; সেনাপতি ('লস্কর উজীর') আশরাফ্ খানের অনুরোধে বাঙ্‌লায় কাব্য-রচনায় ব্রতী হলেন কবি দৌলত কাজী।

দ্বিতীয়ত, বাঙ্‌লা সাহিত্য এতদিন দেবদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল, প্রকাশ্যত মানবীয় প্রণয় নিয়ে কাব্য লেখা হয়নি। অথচ সংস্কৃত-সাহিত্যে মানুষের প্রণয়-কাহিনীর অভাব ছিল না; এবং লোকসমাজ চিরদিনই এসব প্রণয়-কাহিনী বলত, শুনত, গাইত। অবশ্য রোমাণ্টিক প্রণয়-লীলারই মুখপাত্র ছিল সেই সংস্কৃত সাহিত্যের নর-নারী। রোমান্সের বিস্ময়-রস পার্থিব জীবনে না খুঁজে, কবিরা তখনো তা খুঁজতেন অলৌকিকতায়, দেবদেবী, যোগী-মায়াবী অপ্সরা প্রভৃতির ক্রিয়া-কর্মে। যাকে 'মানব-চরিত্র' বলে তা তখনো কাব্যে নেই। তথাপি সংস্কৃত কবিদের সে সব কাব্যে মুখ্যত কথাবস্তু ছিল রোমাণ্টিক মানবীয় প্রণয়, এটি কম কথা নয়। অপভ্রংশ পর্যন্ত এই মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর ধারা ভারতীয় সাহিত্যে অব্যাহত ছিল। ভারতবর্ষের হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দিককার রচনায়ও সে ধারার সন্ধান পাওয়া যায় (যেমন, মাধবানল ও কামকন্দলী বিষয়ক কথা)। বাঙ্‌লায় কিন্তু ধর্মসংস্কার-মুক্ত এরূপ ঐহিক (secular) কাব্যকথা নেই; এমন কি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও বাঙ্‌লায় ধর্মের খোলসটি

পরে দেখা দেয়, সে খোলস বজায় রেখে চলে। অথচ সাহিত্য যতক্ষণ পর-লোক ও ধর্মের এই গাঁটছড়া ছেড়ে মর্ত্যলোক ও মানব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলন-সূত্র খুঁজে না পায়, ততক্ষণ সাহিত্য আত্মপ্রতিষ্ঠিত নয়। কবি দৌলত কাজীর 'লোর-চন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' এই হিসাবে বাঙ্‌লা কাব্যের আত্ম-প্রতিষ্ঠার নূতন প্রয়াস, তা ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর প্রথম একটি কাব্য।

প্রণয় কাব্যের এই ভারতীয় ধারা বাঙ্‌লায় এসময়ে এল, নিঃসন্দেহে হিন্দ্‌-ফারসি রোমান্টিক কাব্যধারার প্রবাহে মিশে বিদগ্ধ মুসলমান কবিদের সার্থক প্রয়াসে। মানবীয় প্রণয় কাব্য বাঙ্‌লায় এর পূর্বেও রচিত হয়ে থাকবে,—বিদ্যাসুন্দরের প্রথম জানা বাঙ্‌লা কাব্য লেখা হয়েছিল নুসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরুজ শাহের উৎসাহে "দ্বিজ" শ্রীধরের দ্বারা, তা বলেছি। নেপালে প্রাপ্ত বাঙ্‌লা নাটকের মধ্যেও দেখেছি—কাশীনাথের লিখিত 'বিদ্যাবিলাপ' নাটক পাওয়া গিয়েছে। হয়তো আরও এ জাতীয় লেখা যা ছিল তা টিকে নেই। আর, দৌলত কাজীর পূর্বেও হয়তো কোনো কোনো মুসলমান কবি কিছু লিখে থাক্‌বেন। যেমন কবি সাবিরিদ খান বা শাহ্ মহম্মদ সগীর প্রাচীনতর হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে তথাপি নিঃসংশয়ে বলা যায়—দৌলত কাজীই প্রথম শক্তিশালী বাঙালী মুসলমান কবি; 'লোর চন্দ্রাণী' বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় secular বা ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবীয় প্রণয় কাব্য—এবং রোসাঙ্গের রাজসভা এ ধারার উদ্ভবক্ষেত্র।*

দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রাণী': 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রাণী' দৌলত কাজী সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি; কবি

* অবশ্য দুর্ভাগ্যের কথা. সাধারণ বাঙালী পাঠকের পক্ষে দৌলত কাজীর কাব্য বা আরাকানের গৌরব আলাওলের কাব্যসমূহও দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের অমূল্য গ্রন্থখনি 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'ই ছিল অনেক দিন পর্যন্ত সাধারণ উপাদান। তারপরে ১৯৩৫এ ডঃ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্‌লা সাহিত্য' প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের সম্পাদিত 'পদ্মাবতী, ১ম খণ্ড'ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখনো তবু পাঠক-সাধারণের অনেক সময়ে এই সব গ্রন্থের রসাস্বাদন করতে হয় উদ্ধৃতি থেকে—প্রাঃ পুঃ বিঃ, ডঃ দীনেশ সেন ও ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস থেকে। হবিবি প্রেসে মুদ্রিত 'লোর চন্দ্রাণী' বা আলাওলের কাব্যও এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল, যথোচিতভাবে সম্পাদিত হয় নি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর 'সাহিত্য প্রকাশিকা' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র ঘোষালের টীকাটিপ্পনীসহ 'লোর চন্দ্রাণী' প্রকাশিত হয়েছে।

আলাওল পরে (খ্রীঃ ১৬৫৯) তা সম্পূর্ণ করেন। দৌলত কাজী এ কাব্য লেখেন রাজা 'শ্রীসুধর্মা'র 'লস্কর উজীর' আশরফ্ খানের অনুরোধে (অর্থাৎ ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ এর মধ্যে; তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিক, সাজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগ)। আশরফ্ খান ছিলেন 'চিশ্‌তি' সম্প্রদায়ের সুফী গুরুর শিষ্য। অন্তত সাতটি সুফী সম্প্রদায় বাঙ্‌লা দেশে নিজেদের মতবাদ প্রচার করেছিলেন: যথা, সুহ্‌রাবর্দি, চিশ্‌তি, কালন্দরীয়া, মাদারিয়া, আধমিয়া, নক্‌শবন্দিয়া ও কাদিরিয়া। অনুগৃহীত কবি কিছু অত্যুক্তি করতে পারেন, কিন্তু 'চিশ্‌তিয়া' খান্দান আশরফ্ খান যে অসাধারণ গুণগ্রাহী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।
দীঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর॥
নীতি-বিদ্যা কাব্য-শাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয়॥

আরবী-ফারসি উপদেশ তিনি শুনতেন, এ কাহিনীও সম্ভবত শুনেছিলেন,—অবধী (গোহারি) ভাষায় উত্তর ভারতে তা প্রচলিত ছিল,—এখনো দক্ষিণ বিহারের গ্রাম-সঙ্গীতে লোরক মল্লের লোককাহিনী গীত হয়। আশরফ্ খান কবিকে বাঙ্‌লায় এ কাহিনী রচনা করতে বললেন:

দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ॥

দৌলত কাজী পাঞ্চালীর ছন্দে যে 'ময়নার ভারতী' লিখলেন কথা-বস্তুতে তা হিন্দ-ফারসি প্রণয়-কথা; কিন্তু রূপে ও ভাবে তা বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কাব্যাদর্শে ও সংস্কৃত-বাঙ্‌লা ঐতিহ্যে রচিত, বিদগ্ধ ও বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা কবিতা। ভূমিকাংশে আছে প্রথমে আল্লা ও রসুল বন্দনা, তারপরে রাজা শ্রীসুধর্মার সুবিচারের প্রশংসা—'কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার', আশরফ্ খানের পূর্বোক্ত প্রশংসা, রাজার বিপিন বিহারের কথা, এবং আশরফ্ খানের দ্বারা কাব্য রচনার নির্দেশ। তারপরে গল্প আরম্ভ হয়:

রাজার কুমারী এক নামে ময়নামতী।
ভুবন বিজয়ী যেন জগৎ পার্বতী॥

'স্বামীর লোরক নাম নৃপতিনন্দন'। তিনি গেলেন বিপিন বিহারে (রাজা সুধর্মার মতোই), সেখানে এক যোগী এসে তাঁকে দেখালে গোহারি দেশের

রাজকন্তা চন্দ্রানীর চিত্র। চন্দ্রানী বিবাহিতা, কিন্তু চন্দ্রানীর স্বামী বামন-বীর নপুংসক। যোগীও বোঝালেন—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী তখন এতই সুবিদিত—

চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥

লোরক মুগ্ধ হয়েছিলেন, অমনি মিলনে উদ্যোগী হলেন; যোগীর সঙ্গে চললেন গোহারি রাজ্যে। রাজকন্যা চন্দ্রানীও সেখানে গবাক্ষ থেকে লোরককে দেখে আত্মহারা হলেন। ধাইয়ের মধ্যস্থতায় দুজনার দেখা হল দেবমন্দিরে, মিলন হল গোপনে চন্দ্রানীর গৃহে। তারপর স্বচ্ছন্দ মিলনের বাধা দেখে তাঁরা বনপথে নিজ দেশে পালাচ্ছিলেন, বামন তাড়া করলে। যুদ্ধে কিন্তু বামন নিহত হল। চন্দ্রানীকেও সর্পে দংশন করেছিল, কিন্তু এক সাধু তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন। গোহারির রাজা তাঁদের তখন রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। সেখানেই লোর ও চন্দ্রানী রাজ্য করেছেন।—এ হল প্রথম খণ্ড লোর-চন্দ্রানীর কথা। ময়নামতী এ খণ্ডে 'কাব্যে উপেক্ষিতা'।

দ্বিতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতীর কথা। বিরহিণী ময়নামতী একান্তে পতির মঙ্গল-চিন্তায় হরগৌরীর আরাধনা করেন। তাঁর সুযশে আকৃষ্ট হল ছাতন নামে প্রতিবেশী এক রাজপুত্র। সে রত্না মালিনীকে দূতীর কাজে নিযুক্ত করলে। দূতী কথা পাড়ে—পদ রচনা করে উত্তর দেন ময়নামতী। দূতী বলে:

হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক।
পুরুষ মিলাইয়া দিমু ভুঞ্জ সুখভোগ॥

ময়নামতী বিরক্ত হন। মালিনী তখন কৌশলী সেনাপতির মত পরোক্ষ-পথে আক্রমণ চালায়। আরম্ভ করে নববর্ষার বর্ণনা—বৈষ্ণব পদাবলীর সুচারু রীতিতে—

দেখ ময়নামতী প্রথম আষাঢ়
চৌদিকে সাজে গম্ভীর। ইত্যাদি

ময়নাও উত্তর দেন আসাবরী রাগে—আরও সুমধুর পদে:

আই ধাই কুজনী কি মোহে শুনাওনি
বেদ-উক্তি নহে পাটং। ইত্যাদি

তারপর শ্রাবণ মাস;—তেমনি রাগ-রাগিণীতে প্রস্তাব ও উত্তর। বাঙ্‌লা 'বারমাস্তার' একঘেয়ে ইতিহাসেও এ ঋতুবর্ণন অপূর্ব নূতন জিনিস। দৌলত

কাজী গীতি-কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাংশ রচনার পূর্বেই দৌলত কাজী পরলোকগত হন। বহু বৎসর পরে তা শেষ করে সৈয়দ আলাওল অসমাপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করেন; কিন্তু আলাওলের কবি-গৌরব এ কাব্যে বর্ধিত হয় নি। সেই দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়—ময়নামতী দূতীকে তাড়িয়ে দিলে। তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ আলাওলের রচনা—এক ব্রাহ্মণের হাতে শুক-সারি দিয়ে ময়না ব্রাহ্মণকে পাঠালেন লোরের নিকট। সারির কথায় লোরের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। তখন পুত্র প্রচণ্ডতপনের হাতে সেই রাজ্য দিয়ে তিনি চন্দ্রানীকে-শুদ্ধ স্বদেশে ফিরলেন,—দুই রাণীকে নিয়ে সুখে রাজ্য করতে লাগলেন।

কবি আলাওলঃ রোসাঙ্গের রাজসভায় দৌলত কাজীর পরেই উদিত হন কবি সৈয়দ আলাওল। তিনিই সে সভার শ্রেষ্ঠ কবি। 'সতী ময়না'র শেষাংশ রচনায় তিনি কবিত্বে দৌলত কাজীর সমতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি, তা সত্য। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে আলাওল তথাপি বৃহত্তর প্রতিভা। সে প্রতিভা বহুমুখী,—সঙ্গীতে, নৃত্যে, দর্শনে বহু বিষয়ে তা স্বচ্ছন্দ; ভাবৈশ্বর্যেও তাঁর কাব্য গভীর; সূফী প্রেমোন্মাদনার ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সংযোগে তা চিত্তস্পর্শী। তাঁর কবিকৃতি ও বাণীরচনাও অকৃত্রিম; বাঙ্‌লা কাব্যের সীমান্ত তিনি ক্লাসিক-ধর্ম বা শিষ্ট-বাণীরূপে মার্জিত করে যান। সর্বোপরি ধর্ম-সংকীর্ণতামুক্ত মানবিকতার এমন একটি ভাবলোক আলাওল সৃষ্টি করেছেন যা মধ্যযুগে দুর্লভ। তাই কবিকঙ্কণের মত মানব-চরিত্র-রসিক না হলেও, কিম্বা পদাবলীর কবিদের মতো সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী না হলেও, আলাওলই একমাত্র কবি যিনি সেই মধ্য-যুগের পার থেকেও তাঁর উদার মানবিকতায় কতকাংশে স্মরণ করিয়ে দেন এ যুগের রবীন্দ্রনাথকে।

কবিজীবন ও কাব্যঃ আলাওলের জীবনও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে তিনি নিজ পরিচয়ও রেখে গিয়েছেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফতোয়াবাদ পরগণার শাসনকর্তা 'মজলিস কুতুবের' অমাত্য, এবং 'গৌড় মধ্যে মুলুক ফতোয়াবাদ শ্রেষ্ঠ'। এ 'মুলুক' তবু কোথায় বলা এখন দুঃসাধ্য। ফতোয়াবাদ নিম্ন বঙ্গেরই কোথাও হবে, ফরিদপুরেও হতে পারে। কারণ, "মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুক্ষণ"। তা ছাড়া, কার্যোপলক্ষে যখন একবার পিতাপুত্রে নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন তখন সেখানে দেখা হল

'হারমাদ'দের সঙ্গে—নিম্নবঙ্গের অবস্থা তখন কিরূপ তা বুঝতে পারা যায়। পিতা যুদ্ধ করে মারা যান, আলাওল ভাগ্যবশে এলেন আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গে। সেখানে তিনি প্রথম হন রাজ-আসোয়ার। আলাওলের প্রতিভা সেখানে সর্বদিকেই বিকাশের সুযোগ লাভ করে থাকবে; তালিব-আলিম বলে তাঁর খ্যাতি শীঘ্রই রোসাঙ্গের ওমরাহ্ মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

বহু মহন্তের পুত্র মহা মহানর।
নাট গান সঙ্গীত শিখাইনু বহুতর।

কবি প্রথমে স্থান পেলেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মন্ত্রী সোলেমানের আসরে।—

তাহান সভাতে গুণিগণ অবিরত।
জ্ঞান উক্তি রস কথা সুনন্ত সতত॥

সোলেমানেরই কথায় আলাওল হাত দেন দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' কাব্য সমাপ্ত করার কাজে। তখনো হয়তো আলাওলের কবিশক্তি পূর্ণস্ফূর্তি লাভ করে নি। অন্তত তিনি বিদ্বান্ মানুষের মতই বিনয়ী। দৌলত কাজীর কীর্তি উল্লেখ করে তাই আলাওল বলছেন—

তান সম আমার না হয় পদ গাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা॥

আর 'সতী ময়নামতী' শেষও করেছেন এই বলে—

মুই মোহা পাতকীর পাপ নাহি ওর।
আশীর্বাদ কর স্বর্গগতি হোউক মোর॥

সোলেমানের অনুরোধেই পরে আলাওলের আর একখানি গ্রন্থও প্রণীত হয় (খ্রীঃ ১৬৬৩); তা হচ্ছে 'তোহ্ফা'—ফারসিতে লিখিত ইসলামি ধর্ম নিবন্ধের তা অনুবাদ। যদি কবির কথারম্ভের উক্তি মামুলী বিনয় না হয়, তা হলে 'তোহ্ফা' কবির শেষ বয়সের রচনা:

মুই আলাওল হীন দৈব বশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম না করিলুঁ কোন কর্ম
বৃথা জন্ম গোঁয়াইনু কালে। ইত্যাদি—

ইতিমধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বনা আলাওলের যথেষ্ট ঘটেছে। কারণ আলাওলের নাম, যশ রাজদরবারেও পৌঁছেছিল, তাতেই বিপদও ঘটে। রোসাঙ্গে তখন রাজা ও রাজভ্রাতার যৌথ-শাসন, রাজভ্রাতাই মুখ্য পাটেশ্বরী। সেই রাজভ্রাতার

প্রধান অমাত্য ছিলেন মাগন ঠাকুর। তিনিও ছিলেন পীরভক্ত। তিনি কবিকে বিশেষ সমাদর করেন। এই মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল বাঙ্‌লায় অনুবাদ করলেন অবধীতে লেখা মালিক মহম্মদ জায়সীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'পদুমাবত্‌'। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'পদ্মাবতী'। মাগন ঠাকুরের অনুরোধেই আলাওল ফারসি আখ্যায়িকা-কাব্য 'সয়ফুলমুলক্‌ বদি উজ্জমাল'ও বাঙ্‌লায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সে কাব্য অর্ধেক অনুবাদ হয়েছে, এমন সময়ে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হল। কাব্য আর তখনকার মতো শেষ হল না। এর পরেই সম্ভবত আলাওলের ভাগ্য-বিপর্যয়ও ঘটে। পরাজিত শাহ্‌ শুজা আরাকানের রাজদরবারে আশ্রয় নিতে আসেন, এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে রোসাঙ্গ-রাজের বিবাদ হয়, সুজা সপরিবারে নিহত হন। কিন্তু শুজার মৃত্যুর পূর্বেই সম্ভবত আলাওল রচনা করেন—'সপ্ত পয়কর' (কবি নিজামীর 'হপ্ত পয়করে'র অনুসরণে)। তখন শ্রীচন্দ্র সুধর্মা রাজা (খ্রীঃ ১৬৫২—১৬৮৪)। কবির কথা থেকে মনে হয় শুজাও জীবিত ছিলেন ;

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার চরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা,...

সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ ছিলেন সুধর্মার সেনাপতি, তিনিই নিজামীর ফারসি কাব্য শুনতে চান বাঙ্‌লায়। সে গ্রন্থে আছে—সাত দিনের সাতটি গল্প। আলাওলের গল্পের কথারম্ভ এরূপ ; রাজপুত্র বাহ্‌রাম বিদেশে ছিলেন, রাজা এক শিল্পীকে দিয়ে তাঁর জন্ত সাত রঙের সাতটি 'টঙ্গি' নির্মাণ করিয়েছিলেন—শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহে টঙ্গিই রাজাদের বিলাস-প্রাসাদ। এদিকে রাজার মৃত্যু হলে মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করে। বাহ্‌রাম ফিরে এসে যুদ্ধ করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করলেন, প্রতিবেশী সাত রাজাকে পরাস্ত করে সাত রাজকন্তাকে বিবাহ করলেন, তাঁদের এক-একজনকে দিলেন বাসের জন্ত এক-একটি টঙ্গি। এক-এক রাজকন্তার কাছে তখন এক-একদিন তিনি একটি করে গল্প শুনতেন। 'সপ্ত পয়কর' এই গল্প-সপ্তক।

কিন্তু রোসাঙ্গে এর পরেই হয়তো শুজার বিদ্রোহ ঘটে। আলাওলের শত্রু-পক্ষ ছিল। শুজার সঙ্গে রাজার বিরোধ-সময়ে তারা আলাওলকেও বিদ্রোহী বলে অপবাদ প্রচার করে। আলাওল তাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুঁ কর্কশ।
গর্ভবাসে প্রায় ছিলুঁ পঞ্চাশ দিবস॥

রাজা অবশ্য পরে নির্দোষ বুঝে কবিকে মুক্তি দেন। কিন্তু তখন আলাওল নিঃসম্বল, দেহ মনেও ভগ্ন—

আয়ু ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ ॥

অনেক দিন পরে কবির সে দৈন্য লাঘব হল শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সৈয়দ মুসার আশ্রয় লাভ করে। তিনিও পীরভক্ত। তাঁর অনুরোধেই নয় বৎসর পরে আলাওল অসমাপ্ত 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল' সমাপ্ত করেন—রাজপুত্র সয়ফুলমুল্‌ক্‌ ও পরীরাজকন্যা বদিউজ্জমালের তা প্রণয়-বৃত্তান্ত। জীবনে অনেক তিনি সয়েছেন, সুফী কাদিরি গুরুর শিষ্য আলাওলের তখন কবি-যশেও আগ্রহ নেই।

রচিনু পুস্তক আমি নানা আলাজালা।
বৃদ্ধকালে ঈশ্বর ভাবেতে হৈলে ভালা ॥

কিন্তু সৈয়দ মুসা জানালেন—এতো সাধারণ লোকের মতো কথা। আর—

অন্য জন নহ তুমি আলাওল গুণী।

অবশ্য আলাওলের কবিত্ব আর পুনঃস্ফূর্তি লাভ করল না। তাঁর মনে তখন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্যের ছায়া নামছে :

যদি মোর কবিরসে সুখ লাগে মনে।
আশীর্বাদ কর মোরে ফকীর কারণে ॥
ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিয়া।
পড়িও ফতেয়া এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া ॥

এ সুর ভারতীয় বৈরাগ্যের সুপরিচিত সুর, সুফী কবিরও মনের কথা।

আলাওলের শেষ রচনা 'সেকান্দার নামা' (খ্রীঃ ১৬২৭)—তাও কবি নিজামীর 'ইসকান্দর নামার' অনুবাদ। এ কাব্য আলাওল লেখেন সৈয়দ মুসার আশ্রয়ে মজলিস নবরাজের সভায়। সে সভাও গুণীর সভা ছিল। গ্রন্থারম্ভে আমরা জানতে পারি—আলাওল তাঁকে বলেছিলেন হিন্দু-জাতি নানা দুঃখে অর্থ উপার্জন করেও মন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতি দেয়, তাদের নাম তাতে ধন্য হয়। কাব্য-রসিক নবরাজ উত্তরে জানান—মসজিদ্‌, পুষ্করিণী নিজ দেশে মাত্র থাকে, কিন্তু গ্রন্থকথা দেশবিদেশের মানুষ শোনে। সেকান্দরের মহাবীরত্বের যে সব কাহিনী আছে কবি আলাওলই তা

বাঙ্‌লায় রচনা করে নবরাজের নামও সেইভাবে ধন্য করুন; কাব্যই নবরাজকেও দিবে অমরতা।

'সতী ময়নামতী', 'পদ্মাবতী', 'সফিউলমুলুক্ বদিউজ্জমাল', 'সপ্তপয়কর', 'তোহ্‌ফা' ও 'সেকান্দর নামা'—এই ছয় খানা ছাড়াও আলাওল পদাবলী ও গানও রচনা করেছেন। তবে আলাওলের প্রধান কীর্তি 'পদ্মাবতী'।

'পদ্মাবতী'—মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত্‌' কাব্যের অনুবাদ। একমাত্র 'সতী ময়নামতী'ই অনুবাদ নয়, না হলে আলাওল কাব্যে মৌলিক গল্প উদ্ভাবন করেন নি, সেকালে কেই বা তা উদ্ভাবন করত? প্রচলিত কথাবস্তু নিয়েই কবিরা কাব্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হতেন। আসলে কাব্যের অনুবাদ হয় না; তাই কাব্যের সার্থক অনুবাদ মাত্রই মূলানুগত নূতন সৃষ্টি। পদ্মাবতীও তা'ই। এ কাব্যে আলাওল কোথাও মূলের যথাযথ অনুগামী হয়েছেন, কোথাও বা স্বচ্ছন্দ নিয়মে জায়সীর অনুসরণ করেছেন। কোথাও তা সংক্ষিপ্ত করেছেন, কোথাও বা তিনি নূতন কথা যোগ করেছেন। নিজেই কবি জানিয়েছেন,—

এই সূত্রে কবি মহাম্মদে করি ভক্তি।
স্থানে স্থান প্রকাশিব নিজ-মন উক্তি ॥

পদ্মাবতীর গল্প সুপরিচিত, তা চিতোরের পদ্মিনীর উপাখ্যান। এ কাহিনীতে অবশ্য পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে লাভ করেন রাজা রত্নসেন। তান্ত্রিক পণ্ডিত রাঘবচেতন আলাউদ্দীনকে প্ররোচিত করে পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য। আলাউদ্দীনের ছলনায় রাজা বন্দী হন, কিন্তু গোরা তাঁকে মুক্ত করেন। অন্যদিকে আর এক রাজা দেওপালও পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য চিতোর আক্রমণ করে। যুদ্ধে সে নিহত হয়, রত্নসেনও আহত হয়ে প্রাণ হারান। তারপর পদ্মাবতী সে চিতায় সহমৃতা হন। আলাউদ্দীন সে চিতা প্রণাম করে দিল্লী ফিরে যান। আলাওলের রচিত পদ্মাবতীর শেষাংশ পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সূফী আলাওলও সূফী-সাধক জায়সীর মতোই তাতে জানাতেন পদ্মাবতী কাব্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক রূপক, পদ্মাবতী (পদ্মিনী) মানুষের বুদ্ধি, রাজা রত্নসেন মন, রাঘব-চেতন শয়তান, আলাউদ্দীন মায়া, ইত্যাদি। পদ্মাবতীর পাঠ নিয়েও বহু বিতর্ক আছে। কারণ, এ পুঁথি সাধারণত লিখিত হত ফারসি-আরবী হরফে, অথচ আলাওলের ভাষা সুমার্জিত বাঙলা, সংস্কৃত তার ভিত্তি। তাই বাংলায় লিপ্যন্তর-কালে অশিক্ষিত প্রকাশকরা নানা ভ্রম-প্রমাদে পতিত হয়েছেন। ঢাকা থেকে 'পদ্মাবতী, ১ম খণ্ড', কিছু কাল পূর্বে

মুঃ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে, তারও 'পাঠ সংশোধন' সুদীর্ঘ।) জায়সীরও কাব্যে যা আলওলের নিজ সংযোজন তা তাঁর মাত্রাজ্ঞানের পরিচায়ক, কখনো বা তাঁর পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার প্রমাণ, কখনো বা তাঁর পরিচিত বাঙালী পরিবেশেরই স্বাভাবিক প্রতিফলন। যেমন, পদ্মাবতীর সখীদের কথা, সিংহলের সখীগণের নিকট পদ্মাবতীর বিদায় গ্রহণ, প্রভৃতি (ডঃ সুকুমার সেন সবিস্তারে তা বিচার করেছেন)। কাব্যে প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গীত শাস্ত্রের মতামত বা নৃত্যের উল্লেখ করবার প্রলোভন আলাওল সম্বরণ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি বুঝতেন কাব্যে তা অপরিহার্য নয়; তাই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন 'না কহিলে দোষ হয়, কৈতে বাসি ডর।' যোগ-সাধনা সম্বন্ধে কবির জ্ঞান সুগভীর, তার প্রমাণও কাব্যে আছে। এমন কি এই প্রবণতার আধিক্যে ক্ষণে ক্ষণে লেখা দুর্বোধ্যও। হিন্দু যোগক্রিয়া ও মুসলমান যোগক্রিয়া দুইই ছিল কবির সুবিদিত। নিম্নে হিন্দু-যোগের কথা আমরা পাই;

উড়িয়ান বন্ধ কটি পরন কৌপীন।
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন॥
তথাতে কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাবত।
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ॥ ইত্যাদি।

আর কবি নিজে ছিলেন সুফী; সুফী প্রেম-সাধনায়ও তাই কবি ভাবনিমগ্ন।

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥
প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর।
পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ্য পঞ্চশর॥ ইত্যাদি

এর পরে বুঝতে কষ্ট হয় না—এ কবি পদাবলীর কবিদেরও স্বজাতি, আন্তরিকতার স্পর্শে আলাওলের সেই সব পদ ও গান সত্য সত্যই সমৃদ্ধ। যথা,

আহা মোর বিদরে পরাণ
জাগিতে স্বপনে দেখি ভুমে নাহি আন। ধ্রু।
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে
পাইয়া পরশমণি হারাইলু' ভ্রমে॥ ইত্যাদি।

অথবা ব্রজবুলিতে

তুয়া পদ হেরইতি, বাতুল যুবতী কামিনী-মোহন কটাক্ষে হীন ভেল।

প্রেম মদে বিভোল, সতত বহয় লোর,
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধিবুদ্ধি হরি গেল ‖
চন্দন চন্দ্রকিরণ মানে আনল সমান
সৌরভ বিশিখ তবে লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনি অতি পরাভব
মন্মথ-বাণ আনল পরে জাগে
কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধুকধুক তুয়া আশ্বাসে।
শ্রীযুত মাগন, রসিক সুজন, আরতি বিহীন
আলাওলে ভাষে ‖

মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে আলাওল অদ্বিতীয় স্রষ্টা না হলেও নব চেতনার প্রভাত-তারকা, যুগান্তের ইঙ্গিত।

মানবীয় প্রণয়-কাহিনী ও অধ্যাত্ম প্রেম-সাধনা দুই প্রেরণাকেই সাহিত্যে আলাওল সম্মিলিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, বাঙালী ঐতিহ্যে নিষিক্ত ব্রজলীলার যেমন তিনি পদ রচনা করছেন, তেমনি সংস্কৃত-জগতের কথাবস্তুর (Matter of Sanskrit World) সঙ্গে ফারসি-আরবীর কথাবস্তু, এমনকি তোহ্‌ফার মত ধর্ম-নীতিকেও (Matter of Perso-Arabic World) স্বচ্ছন্দে এই পৌরাণিক-প্রতিবোধপুষ্ট বাঙ্‌লা ভাষায় আলাওল সুগ্রথিত করে তুলেছেন। বাঙ্‌লা কবিতার পরিমণ্ডলকে তিনি এই সূত্রে প্রসারিত করে দিয়েছেন; অথচ সেই মুসলমানী জগতে বিচরণ করেও তাঁর বাণী কিছুমাত্র আত্মভ্রষ্ট হয় নি। তা ফিরে এসে দাঁড়ায় বাঙ্‌লা ভাষার সংস্কৃতবিধৃত ভিত্তিভূমিতেই। তাঁর কবি-কর্মের দিকে তাকালে তাই চতুর্থত দেখতে পাই,—তাঁর কাব্যে বাঙ্‌লা কবিতা নব্য-ক্লাসিকতায় সমৃদ্ধ, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণে পরিচ্ছন্ন; বুঝতে পারি—বাঙ্‌লা কবিতার শৈশব শেষ হয়েছে, এবার সে আপনার রূপকে চিনে উঠতে পারছে। পঞ্চমত, পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও ধর্ম-সংস্কার মুক্ত আধ্যাত্মিকতায় আলাওল যেমন সভ্য মানুষের (civilized man) কবি, এমন আর মধ্যযুগের কোনো বাঙালী কবিকে মনে হয় না। শেষ কথা—এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা,—আলাওল বাঙ্‌লার জাতীয় সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপয়িতা।—বাঙ্‌লার নিম্নবর্গের মধ্যে বহুপূর্বেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন গঠিত হয়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। একালে দক্ষিণারায় ও বড় খাঁ গাজী প্রভৃতির আখ্যানে তার রূপ সাহিত্যিক পথেও পরিস্ফুট হচ্ছিল। হুসেন শাহ্‌-এর

কাল থেকেই বাঙালী উচ্চবর্গের মধ্যেও যে সেই সাংস্কৃতিক বিরোধ ক্রমশ প্রশমিত হয়ে আসছিল, তাও পূর্বেই দেখেছি ; কিন্তু ধর্ম-সংস্কারাবদ্ধ বাঙ্‌লা সাহিত্য তখনো হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ঐতিহ্যেই প্রতিপালিত হচ্ছিল। মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যে মুসলমান জীবন ও চিন্তা প্রায় অনুপস্থিত। এমনি সময়ে রোসাঙ্গের রাজসভায় ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত সুফী ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার স্বাভাবিক সম্মেলন সহজ হয়ে উঠল। অন্যদিকে সেখানে লৌকিক প্রণয়-কাহিনীর অনুশীলনে ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবতার ধারণাও জন্মলাভ করছিল। এক্ষণে আলাওলের মত পণ্ডিত বিদগ্ধ ও উচ্চবর্গের মুসলমান কবি বাঙলা সাহিত্যকে আপনার বলে গ্রহণ করে—আপনার কীর্তির দ্বারা—বাঙ্‌লার জাতীয় সাহিত্যের মিলন-ক্ষেত্র রচনার সূচনা করলেন—যে ক্ষেত্র 'আবাদ করলে ফলত সোনা'। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান, উচ্চ মধ্য ও নিম্ন সকল শ্রেণীর বাঙালীর জাতীয় চেতনা তখন থেকে পরিপুষ্ট ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারত।

বাঙ্‌লায় মুসলমান কবিদের আবির্ভাব: রোসাঙ্গ রাজসভায় আরও কবি ছিলেন, 'কোরেশ' মাগন নামে কবির 'চন্দ্রাবতী' নামে খণ্ডিত এক পুঁথি আছে। কিন্তু আলাওলের পরে রোসাঙ্গের আলো নিভে এল। তাহলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে উদার অধ্যাত্ম-বোধের দীপ তখনো নির্বাপিত হয়নি। পরাগলপুরের সৈয়দ সুলতান তেমনি একটি সমুজ্জ্বল দীপশিখা—তিনিও সুফী সাধক, আবার তিনিও রাধাকৃষ্ণের পদাবলী-গায়ক। একই সময়ে তিনিও মুসলমান ধর্মের নিয়ম-নীতি নিয়ে কাব্য লিখছেন, সংস্কৃত 'হরিবংশের' অনুকরণে তিনি (খ্রীঃ ১৬৫৪) 'নবীবংশ' লিখছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণও তাঁর সেই নবীদের অন্তর্গত,—আর তাঁর অন্য গ্রন্থ 'জ্ঞান-প্রদীপ' বা 'জ্ঞান-চৌতিশা' তান্ত্রিক যোগ-রহস্যের কাব্য। কবি মহম্মদ খানও সপ্তদশ শতকের অভিজাত গোষ্ঠীর আর-এক কবি। তাঁর 'মুক্তাল হোসেন' নবীবংশের কথা হলেও আবার চট্টগ্রামের কথা, কবির নিজ বংশের কথাও তাতে আছে। পাঠযোগ্য কাব্য তা ; লিখতে বসে কবিরা বাঙ্‌লা কবিতায় এখন আর হোঁচট খান না, তা স্পষ্ট। তা ছাড়া, হিন্দু পুরাণ-কাব্যাদির প্রভাবে মুসলমান ধর্মের কথা-কাহিনীও যে ঢালাই করা আরম্ভ হয়েছে, 'মুক্তাল হোসেন' তারও প্রমাণ। শেখ চাঁদের 'রসুল বিজয়'ও তাই উল্লেখ-যোগ্য। অষ্টাদশ শতকে এ ধারাতেই 'নবীবংশ', 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি আরও

বহু গ্রন্থ রচিত হবে। শ্রীহট্টে, চট্টগ্রামে, উত্তরবঙ্গে, ও শেষে পশ্চিমবঙ্গে তখন তা সুলভ হয়।

কিন্তু শাহ মহম্মদ সগীরের বা কবি সাবিরিদ খান-এর কাল সুনিশ্চিত হলে হয়তো বাঙ্‌লার মুসলমান কবিদের মধ্যে তাঁরাই কেউ প্রাচীনতম বলে গণ্য হবেন, কারণ তাদের ভাষার স্থানে স্থানে প্রাচীনতার লক্ষণ দেখা যায়। কবিদের আত্ম-পরিচয় থেকে কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সাবিরিদ খান অভিজাত গোষ্ঠীর সন্তান, বিশেষতঃ মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর ধারার কবি। কিছুটা সংস্কৃত জ্ঞানও তাঁর ছিল, সেই আলঙ্কারিক-ঐতিহ্য তাঁর লেখায়ও সুরক্ষিত। বিদ্যাসুন্দরের মুসলমান কবি—এবং ভারতচন্দ্রের পূর্বেকার বিদ্যা-সুন্দরের কবি হিসাবে সাবিরিদ খান তাই বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন। শাহ মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'ও সেরূপ সুন্দর প্রণয়-কাব্য। সূফী ও অনুরূপ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হিন্দু ও মুসলমান কবিরা যখন প্রণয়-গাথাকে অধ্যাত্ম রূপকে পরিণত করে গ্রন্থ লিখছেন (কুতবনের 'মৃগাবতী', জায়সীর 'পদ্মাবত' প্রভৃতি 'অবধী' কাব্যের অনুকরণে), সাধারণ জনসমাজ তখন আরব্য উপন্যাস ও ইউসুফ-জোলেখা, লায়লা-মজনু প্রভৃতি আরবী-ফারসি প্রণয়-গাথা বা চন্দ্রমুখী নীলা, ভেলুয়া প্রভৃতি দেশীয় প্রণয়-গাথা নিয়ে যে আনন্দ লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই তাই দেখতে পাই এরূপ মানবীয় প্রণয়-গাথা-রচয়িতারও অভাব নেই।—অসার্থক হলেও এধারায় হিন্দুর তুলনায় মুসলমান লেখকই হয়তো তখন বেশি পাব।

দুই শতাব্দীর দান

অর্থাৎ কাল পরিবর্তিত হচ্ছিল; যত ধীরেই হোক্ সমাজের জীবন-যাত্রা ও চেতনা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল রাজত্ব যখন ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে তখনি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনেরও সূচনা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত বাঙালী সমাজের ভিত্তি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পল্লী-সভ্যতা। কিন্তু পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ফিরিঙ্গি বণিকদের আগমনে বাঙ্‌লা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছিল—আমদানি রপ্তানি বাড়ছিল, ভারতীয় পণ্যজাতের জন্য বৈদেশিক 'বাজার' তৈরী হচ্ছিল; দেশেও গঞ্জ-হাট জেঁকে উঠছিল,

বিদেশী বাণিজ্যের ফলে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছিল ;—আর মুদ্রাগত অর্থনীতির ('মানি ইকোনমি') সম্মুখে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সামন্ত-তান্ত্রিক স্বাণুত্ব বরাবর টিকে থাকতে পারে না, এ হচ্ছে সহজ-বোধ্য কথা। কিন্তু, বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত তখন বিদেশী আগন্তুকদের বিস্ময় উৎপাদন করে, অথচ সামন্ত কাঠামোর মধ্যে দেশীয় বণিকশ্রেণী তত শক্তিশালী হচ্ছে না, ক্রমবর্ধিত বহির্বাণিজ্য বরং চলে গেল ফিরিঙ্গি বণিকদের হাতে। যে বণিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙালী জাতীয়তার মেরুদণ্ড হতে পারত, সামন্ত পীড়নে তারাই দুর্বল রইল। অন্যদিকে সেই শাসকদের শোষণে সাধারণ মানুষও দরিদ্র, উৎপীড়িত। যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিঃসন্দেহে তখন কতকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা সামন্ততন্ত্রেরই উপজীবী —যথা, হিন্দু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ; অর্থাৎ পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত, ঘটক, পাঠক, কবিরাজ, রাজপুরুষ, আমলা, কর্মচারী এবং বৃত্তিজীবী (নবশাখ) নিম্ন মধ্যবিত্ত (দ্রষ্টব্য—তপনকুমার রায় চৌধুরীর Bengal under Akbar and Jahangir, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। তারাই তখনো ছিল বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন: লেখক ও রসিক। মুসলমানরা সম্ভবত প্রধানত দুই বর্গে বিভক্ত হতেন—হয় আমীর, জায়গীরদার প্রভৃতি, নয় একেবারে শহরের কারুজীবী ও গ্রামের কৃষক। মধ্যযুগের মুসলমান সমাজে এই মধ্যবিত্তের অভাবেই কি বাঙলা সাহিত্যেও মুসলমানদের স্থান শূন্য থাকছিল? হিন্দু-মুসলমান নিম্নবর্গীয় অর্থাৎ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও বিত্তহীনরা অন্তদের 'পাঁচালী'র বা কীর্তনের আসরের প্রান্তে স্থান পেত, তাতে আনন্দলাভ করত ; কিন্তু এই নিম্নস্তরের অনেক উপভোগ্য জিনিস লোক-সঙ্গীত, লোক-গাথা, প্রভৃতি লিখিত হয়ে 'সাহিত্য' হয়ে ওঠেনি ; কিছুটা মাত্র নানা ভাবে মঙ্গল-কাব্যে, প্রণয়-কাব্যে, গীতে ছড়ার প্রবেশ করেছে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পরে বাঙলা সাহিত্য আলাওল প্রভৃতি কবিদের কীর্তিতে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হবার সুযোগ লাভ করছিল, কিন্তু সেই মহৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্য-স্রষ্টারা সচেতন হয়নি। কারণ, সমাজে সমাগত আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন কোনো শ্রেণী তখন উদ্ভূত হয়নি, সমাজে 'জাতীয় চেতনা'ও তাই জাগে নি। জীবন-যাত্রায় কিংবা মানসিক দৃষ্টিতে কোনো ক্রমেই এর সঙ্গে ইউরোপীয়

রিনাইসেন্সের তুলনা হয় না। কাজেই, 'বৈষ্ণব রিনাইসেন্স' কথাটি অমূলক ও ভিত্তিহীন। বাঙ্‌লা সাহিত্য সপ্তদশ শতকের শেষেও প্রধানত সামন্ত-সমাজের উপজীবী অল্প মধ্যবিত্তদের হাতেই পুষ্ট হতে লাগল—ধর্মের প্রেরণা ও ধর্মের খোলস আল্‌গা হলেও তা খসে গেল না, প্রণয়-গাথার মধ্য দিয়েও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুস্থ চেতনা তেমন ভাবে উন্মেষিত হল না, বৃহত্তর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখেও বিরাট পৃথিবীর কোনো বৃহৎ সমস্যা সম্বন্ধে পল্লী-পালিত বাঙালী সাহিত্যিক বা মনস্বীদের ঔৎসুক্য জাগল না। বৈষ্ণব আন্দোলন তার রাগানুগা ভক্তি, লীলারস-তত্ত্ব ও প্রচার-প্রবণতার জন্ম ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বৈষ্ণব ছাড়াও যে বাঙালী পণ্ডিত সমাজ ছিলেন তাঁরা বাঙ্‌লা সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্রের পণ্ডিতদের নাম বাঙ্‌লা সাহিত্যে নেই। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন নব্যন্যায়ের চর্চায়, স্মৃতি ব্যাকরণ দর্শনের অনুশীলনে সন্তুষ্ট, বাঙ্‌লা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চেতন। দুই একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতকে বাদ দিলে এই কালের বাঙ্‌লা-লেখকদের মধ্যে দার্শনিক নেই, মনস্বী নেই, বুদ্ধিবাদী নেই। বাঙ্‌লা গদ্যও তাই তখন জন্মাতে পারল না—বৈষ্ণব কড়চা ও নিবন্ধের ভাঙাভাঙা কথা, কোচবিহার রাজাদের পত্র, এবং দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদ' থেকে তার নিদর্শন পাই এবং বুঝি—বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্যের জন্মের এখনো বহু দেরি। বুদ্ধিজীবীরই গদ্যকে পরিপোষণ করার কথা, তাঁরা তখন সংস্কৃতের ভক্ত। অপর দিকে সাধনার জগতে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী বাঙালী তন্ত্রাচার্যদেরও গৌরবের যুগ;—বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁদের চিহ্নও প্রায় নেই; যা আছে তা সহজিয়া যোগতন্ত্রের।

এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে করলে অবশ্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া আর সাজে না, চৈতন্য-পর্বের এই 'গৌরব যুগ' নিয়েও গর্ব করা সম্ভব হয় না। কিন্তু স্বীকার করতে হবে তার মূল লক্ষ্য যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তা সিদ্ধ হয়েছিল; বিজেতার (আরবী-ফারসি) সংস্কৃতির নিকট বিজিত (সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা) সংস্কৃতি পাঁচশত বৎসরেও হার মানে নি। অবশ্য প্রধানত তার একটা কারণ—মূলত আরবী-ফারসি-বাহিত বিজেতৃ-

সংস্কৃতিও ছিল সামন্ত-বর্গের সংস্কৃতি ; এবং সংস্কৃত-বাঙ্‌লা বাহিত দেশীয় সংস্কৃতিও ছিল সামন্ত-যুগের সংস্কৃতি, দুই-ই মধ্যযুগীয় চিন্তা ও চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে তুলনায় মোটের উপর সংস্কৃতের ভাণ্ডার নানাদিকে যত সমৃদ্ধ ছিল, ফারসি সংস্কৃতি সর্বদিকে তত সমৃদ্ধ ছিল না। তাই তার সাধ্য হল না—ভারতীয় বাঙালী সংস্কৃতিকে উৎখাত করে। প্রবলতর ভারতীয় সংস্কৃতি তাই আত্মরক্ষা করতে পারল, এবং পরে আরবী-ফারসি বিষয়বস্তুকেও আত্মসাৎ করবার মত যোগ্যতা অর্জন করল। তা ছাড়া, সাহিত্য হিসাবে চৈতন্যপর্বের বাঙ্‌লা সাহিত্যকে অন্যান্য বহু ভাষার সম-সাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলেও আবার আশ্বস্ত হতে পারি—এই মধ্যযুগীয় বায়ুমণ্ডলেও বাঙালী সাহিত্য-প্রতিভা নিবদ্ধ থাকে নি, এবং এমন কিছু কিছু সৃষ্টিও তার আছে যা বিশ্ব-সাহিত্যে অগ্রাহ্য নয় ; এমন ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল—যা 'আবাদ করলে ফলত সোনা'।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগ ও নবাবী আমল

(খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০)

'নবাবী আমল' বলতে মোটামুটি অষ্টাদশ শতককেই আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি। রাজা-রাজ্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, সে গণনায় নবাবী আমল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরই স্থায়ী হয়েছিল, খ্রীঃ ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় খ্রীঃ ১৭০৭ অব্দে ; তার পূর্বে বাঙ্‌লার নবাবদের স্বতন্ত্র শাসনের কল্পনাও কেউ করতে পারে নি। আর, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর পরে মীরজাফর নামেই হয়েছিল নবাব। নবাবী শাসনের পরিবর্তে খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে 'ইংরাজ রাজত্বের' আরম্ভ হয়। কিন্তু তা শুধু পূর্বেকার মতো রাজা বা রাজবংশের পরিবর্তন নয়, বিদেশীয় এক বণিক-শক্তির রাজ্যলাভ। "এশিয়ার ইতিহাসের প্রথম সামাজিক বিপ্লবের" সূত্রপাত হল সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনে—এতকাল যা ঘটে নি এবার তা ঘটবে ; ভারতের যুগ-যুগ-স্থায়ী, বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লী-সমাজ (Village

Community) ও পল্লী-সভ্যতা এই বণিক-সভ্যতার আক্রমণে ভাঙ্‌তে আরম্ভ করবে। এই হিসাবে ভারতীয় সমাজের পর্ববিভাগে একটা সাধারণ ছেদ খ্রীঃ ১৭৫৭ ; সাহিত্যেও প্রায় সে-সময়ে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে (খ্রীঃ ১৭৬০-৬২ অব্দে) একটা পর্বশেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু তার পরে আর একটা যুগ-সন্ধিকাল আসে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল সমাজ-জীবনে নূতন কালের প্রারম্ভ নিশ্চিত হয় না। এই সন্ধিকালের সাহিত্যেও তাই নবাবী আমলের জের টানা চলে অনেকদিন, এমন কি ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেও তা শেষ হয় নি। তথাপি খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠায় এবং মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় উনিশ শতকের নূতন সাহিত্য-প্রয়াসের উদ্বোধন হয় —যদিও সেই নূতন সাহিত্য জন্ম নেয় আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এসব কারণেই গোটা অষ্টাদশ শতককে মোটামুটি 'নবাবী আমল' বলে ধরা সুবিধাজনক। তারপর 'আধুনিক যুগ', তার বিভিন্ন পর্ব।

রাজনৈতিক বিপর্যয়

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয়-লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের রাজকোষ শূন্য। তাঁর প্রধান ভরসা তখন মুর্শিদ কুলী খাঁর কর্মদক্ষতা ও বাঙ্‌লার রাজস্ব। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্‌লায় দেওয়ান হয়ে আসেন খ্রীঃ ১৭১০ অব্দে, তখন শাহ্‌জাদা আজীম-উদ্দীন বাঙ্‌লার সুবাদার (খ্রীঃ ১৬৯৭—খ্রীঃ ১৭১২)। মুর্শিদ কুলী খাঁ কাগজে-পত্রে সুবাদার নিযুক্ত হন খ্রীঃ ১৭১৩ অব্দে। মাঝে দু বৎসর (খ্রীঃ ১৭০৮-১৭০৯ পব্দে) তাঁকে অন্যত্র বদলি করাও হয়েছিল। কিন্তু সে দু' বৎসরের পরে যেদিন মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্‌লায় ফিরে আসেন সেদিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (খ্রীঃ ১৭১৭) তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লার রাজকার্য নির্বাহ করেছেন। দিল্লীর ভগ্নপ্রায় মোগল তখ্‌ত যেই অধিকার করুক, বাঙ্‌লা দেশের শাসন-ব্যবস্থা মুর্শিদ কুলী খাঁর বিচক্ষণ কঠিন হস্তেই থাকে ; দিল্লীর ভাগ্যবিপর্যয় তখন বাঙ্‌লাকে তাই স্পর্শ করে নি। খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দে যখন মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হয়, তখন দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা প্রভৃতির মত বাঙ্‌লাও প্রায় স্বতন্ত্র রাজ্য হয়ে উঠেছে, মুর্শিদ কুলী খাঁ নামে না হলেও কার্যতঃ 'বাঙ্‌লার নবাব'।

মুর্শিদ কুলী খাঁর পরে সুবাদার হয় তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জামাতা সুজাউদ্দৌলা (খ্রীঃ ১৭১৭-খ্রীঃ ১৭৩৯); তারপরে সুজাউদ্দৌলার চরিত্রহীন পুত্র সরফরাজ খাঁ (খ্রীঃ ১৭৩৯-৪০)। অচিরেই আলীবর্দী খাঁ তাঁকে নিহত করে বাঙ্‌লার

নবাব হয়ে বসলেন (খ্রীঃ ১৭৪০-১৭৫৬)। আলীবর্দীর বুদ্ধি ও কর্মোত্তম সত্ত্বেও পশ্চিম বাঙ্লা 'বর্গীর উপদ্রবে' তখন ছারখার হয়, আলীবর্দী শেষ পর্যন্ত ওড়িষ্যা প্রদেশ মারাঠাদের ছেড়ে দিয়ে তাদের তুষ্ট করেন। অন্যদিকে ফিরিঙ্গি বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা নিস্তেজ ; ফরাসীদের বাধা দান সত্ত্বেও ইংরেজরা তখন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। কারণ, ইউরোপে তার বণিক-শ্রেণী মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে প্রথম আধুনিক যুগের কর্ণধার হয় ; রাষ্ট্রে প্রথম ক্ষমতা লাভ করে, জাতীয় রাষ্ট্র (নেশন ষ্টেট) গঠন করে ; গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের শাসন (Rule of Law) প্রতিষ্ঠিত করে (খ্রীঃ ১৬৮৮)। চতুর্দিকের এই ঘনায়িত বিপদের মধ্যে অর্বাচীন যুবক সিরাজউদ্দৌলার (খ্রীঃ ১৭৫৬-খ্রীঃ ১৭৫৭) রাজ্যরক্ষার মতো শক্তি বা সহায় কিছুই ছিল না। আলীবর্দী খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মীরজাফরও তাই সিরাজের স্থলে নবাব হতে চাইল, এবং হল 'ক্লাইবের গর্দভ' (খ্রীঃ ১৭৫৭-১৭৬০)। মীরকাশেমও বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইংরেজ-বণিকদের লিখে দিয়েই মীরজাফরের স্থলে নবাব হয় ; তারপর নবাবী-শাসনের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে সবংশেই সে ধ্বংস হয় (১৭৬০-১৭৬৪)। এর পরে ১৭৬৫তে সম্রাট শাহ আলমের হাত থেকে দেওয়ানী লাভ করল 'কোম্পানি'। 'কোম্পানির আমল' যে আরম্ভ হয়েছে, নবাবী আমল যে নেই, সেই আট বৎসরে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একদিকে তারপর ক্লাইব-হেস্টিংসের রাজকোষ লুণ্ঠন, দেশ-শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মন্বন্তর, ছোটখাটো বিদ্রোহ ও অরাজকতা, অন্যদিকে ইংরেজের রাজ্য-বিস্তার, শোষণের স্বার্থে শাসন-সংগঠন, শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা, কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (খ্রীঃ ১৭৯৩), জমিদারীতন্ত্র ও নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব—এইরূপে হাজার দুই-আড়াই বৎসরে মন্দগতি সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি-ক্ষয় আরম্ভ হয়, এদেশেও মধ্যযুগের অবসান হতে থাকে। রাজপ্রসাদজীবী ভাগ্যান্বেষীরা ফারসির মতো ইংরেজি শিখতেও উদ্যোগী হচ্ছিল ; খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের দিকে এ বোধ রামমোহনের মতো বুদ্ধিমান বাঙালীদের মনেও না জন্মে আর উপায় ছিল না—ইংরেজ রাজত্বে এক নূতন সমাজের ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করতে হবে।

সামাজিক পরিবেশ

জমিদারের উৎপত্তি : অষ্টাদশ শতকের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের

সঙ্গে সামাজিক উত্থান-পতনও কিছু কিছু ঘটছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অবসন্ন মোগল সাম্রাজ্যের শূন্য কোষাগারে মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙলার রাজস্ব নিয়মিত যুগিয়েছেন—নির্মম কঠিনভাবে পুরাতন জায়গীরদার জমিদারদের উৎপীড়ন করে। তারা অনেকেই ছিল অপদার্থ, বংশানুক্রমে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন। বাকী খাজনার দায়ে মুর্শিদ কুলী খাঁ তাদের জায়গীর বন্ধ করে জমি 'খালাস' বা খাস করে নিলেন; জায়গীরদারদের ওড়িষ্যার অনাবাদী জমি 'ইজারা' দিলেন আবাদ করবার জন্য; কিংবা দিলেন তাদের নানকার জমি, বনকর জলকরের স্বত্ব। তারা অধিকাংশ ছিল মুসলমান আমীর খানদান, সেই মুসলমান খানদানীদের তাই তখন পতন শুরু হল। পুরাতন ও অপদার্থ হিন্দু অভিজাতদের উপর যে উৎপীড়ন হত তা আরও ক্রুর;—তাদের উপর 'বৈকুণ্ঠবাস' বা পুরীষকুণ্ডে স্নান, ঠাণ্ডা-গারদ, এবং ধর্মান্তর গ্রহণেরও আদেশ হত। মুর্শিদ কুলী খাঁর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল 'মাল-জামিনি'—অর্থাৎ ইজারাদারদের থেকে জামিন নিয়ে চড়া রাজস্বের শর্তে জায়গীর ইজারা দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থাই কোম্পানিও দেওয়ানী পেয়ে (খ্রীঃ ১৭৬৫) বহাল রাখে। মুর্শিদ কুলী খাঁ এরূপ ইজারা বেশি দিয়েছিলেন তাঁর অধীনের খাজনা ও হিসাবে-দক্ষ হিন্দু-কর্মচারীদের—এঁরাই অনেকে তাই পরে কর্নোয়ালিসের কৃপায় বাঙলার জমিদার হন। অবশ্য খ্রীঃ ১৭১০-এর পরে বাঙালী হিন্দু কর্মচারীরা আরও বড় সুযোগ লাভ করেছিল। দিল্লীর সম্রাট দুর্বল, পশ্চিম থেকে তাই রাজকর্মচারী না এনে মুর্শিদ কুলী খাঁ বিশ্বস্ত ও চতুর বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই দেওয়ানী ও কানুনগোর কাজে নিযুক্ত করলেন;—তখন তারাও ফার্সিনবীশ,—তারাও অনেকে আবার জমি ইজারা নিয়ে ক্রমে 'জমিদার' হয়ে বসল। তারপর অবশ্য কোম্পানির আমলে এ নিয়মেই ক্লাইব-হেস্টিংসের মুনসী-দেওয়ানরাও জমিদার হবে। কিন্তু কথা এই যে, মুর্শিদ কুলী খাঁর শর্ত মতো খাজনা আদায় করতে এই নতুন ইজারাদাররা বাঙলার চাষীদের যে কি ভাবে পীড়ন করত, তা আজ বলা অসম্ভব। সে লুণ্ঠনে মণিরত্নজহরতে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ ভরে ওঠে,—তা'ই ক্লাইব-হেস্টিংস পরে বিলাতে চালান দেয়। যাই হোক, এই চতুর দেওয়ান-কানুনগোরাই হলেন আধুনিক বাঙলার সম্রান্ত জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা—যথা, সেনবর্ধের শ্রীকৃষ্ণ হালদার, ময়মনসিংহ-মুক্তাগাছার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী, নাটোরের রঘু-

নন্দন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য, ইংরেজিতে লেখা 'বাঙ্‌লার ইতিহাস' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮-৪১৬)।

ফারসি-নবীশ এসব নূতন 'রায়-ই-রায়ান'দের উৎপত্তিতে এবং পুরাতন রাজা-জমিদারদের বিলোপে সাহিত্য-সংস্কৃতির পুরাতন আসর যত সহজে ভেঙে যায়, নূতন আসর তত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে না। যখন তা গড়ে ওঠে তখন 'নবাবী আমলের' মেজাজই তাতে দেখা দেয় ; আদর বাড়ে আড়ম্বরের, বচন-চাতুর্যের, পোষাকি-পনার। কৃষ্ণচন্দ্রের সভার সঙ্গে রোসাঙ্গের রাজসভার তুলনা করলেই এ কথা বোঝা যায়। যে আধ্যাত্মিক আগ্রহ ও সুস্থ মানব-চেতনা আরবী-ফারসি থেকে দৌলতকাজী-আলাওলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তার পরিবর্তে দেখা দিল প্রাণহীন, আস্থাহীন অবক্ষয়ের লক্ষণ।

পলাশীর প্রেক্ষাপট : রাজনৈতিক ও সামাজিক যে অধঃপতন অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ হয়, তার বীজ ছিল আসলে সমাজের গভীরতর তলদেশে। আকবর-জাহাঙ্গীরের ভূমি-ব্যবস্থায় সামন্তবর্গের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় রাজ-সরকার প্রবল শক্তি ও প্রতাপ অর্জন করেছিল। তারপরে সামন্তযুগের অবসানই ছিল অনিবার্য,—ফিরিঙ্গি বণিক সেই পরবর্তী যুগের ঘোষণাপত্র নিয়েই ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজ তা পাঠ করতে অক্ষম, সে বিপ্লব সাধন করবার মত শক্তি সমাজে জন্মে নি। সামন্ত শক্তির বাধায় বণিক শক্তি দুর্বলই থেকে গিয়েছে। জগৎশেঠ উমিচাঁদ প্রভৃতি অবাঙালী বণিকেরা দেশের বণিকশক্তির মুখপাত্র হয়ে বিদেশীয় বণিকশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি ;—সিরাজউদ্দৌলাকে বিতাড়িত করে তারা দেশে বণিক যুগ প্রতিষ্ঠিত করবার কথা কল্পনা করেছিল, এরূপ মনে হয় না। সামন্ততন্ত্রের মধ্যে পচ্‌তে পচ্‌তে ভারতীয় সামন্ত-সমাজ এক হিসাবে অসহায় ভাবেই বণিক-রাজের নিকট আত্ম-সমর্পণ করল। নইলে মাত্র একটি যুদ্ধে—যাতে কোম্পানীর পক্ষে ১৬ জন সিপাই ও ১২ জন গোরা সৈনিক মাত্র নিহত হয়, আহত হয় সর্বশুদ্ধ ৭২ জন, এবং নবাব পক্ষে নিহত হয় প্রায় ৫০০ সিপাই, আহত হয় আরও ৫০০, এই সামান্য যুদ্ধে,—এত বড় একটা জাতি বা দেশ—সুবা বাঙ্‌লা ও বিহার—কখনো বিদেশী শাসন স্বীকার করে নিত না,—যুদ্ধ চলত এক জীবনকাল ধরে, প্রাণ দিত দেশের হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সে প্রশ্নই এক্ষেত্রে ওঠে নি। কারণ 'দেশ' বলতে বা 'জাতি' (নেশন) বলতে আমরা এখন যা বুঝি,

সামন্ত-যুগে তার ধারণাও জন্মে না। বাঙ্‌লার মানুষ জানত—বাঙ্‌লা দেশ নবাবের 'রাজ্য',—দেশের উপর জনসাধারণের দাবী নেই। ইজারাদারদের অত্যাচারে তারা জর্জরিত হচ্ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়েছে। কাজেই বাঙ্‌লাদেশ পরাধীন হল, এই বেদনা কেউ তেমন তীব্রভাবে অনুভবও করতে পারে নি। তারা বুঝেছে—সিরাজউদ্দৌলার রাজ্য গেল, 'কোম্পানি' সে রাজ্য লাভ করল।

এমনকি, বিদেশীয় বলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিশেষ বিক্ষোভ জনসাধারণের ছিল তা নয়। খ্রীষ্টান ও বিধর্মী বলে অবশ্য আপত্তি ছিল, বিদেশী বলে নয়। কারণ, বাঙালী জনসাধারণ তো বরাবরই দেখেছে—নবাবরা কেউ তাদের স্বদেশীয় ছিল না, তারা বাঙালী ছিল না। মোগল শাসনকালে দিল্লী থেকেই প্রধান প্রধান শাসকেরা প্রেরিত হত;—অনেকেই তারা ভারতীয়ও নয়; পারসিক, আরবীয়, আফগানী, তুর্ক ভাগ্যান্বেষী। এই অষ্টাদশ শতকে বাঙ্‌লার মসনদ যাঁরা অধিকার করেছিলেন, তাঁরাও সে হিসাবে কেউ বাঙালী নন বাঙ্‌লা-ভাষী নন। মুর্শিদ কুলী খাঁ নিজে জন্মেছিলেন ভারতের ব্রাহ্মণ-কুলে; কিন্তু লালিত-পালিত হন পারসিক প্রভুর আশ্রয়ে শিয়া মুসলমান-রূপে পারস্যে। ফারসি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতেই তিনি মানুষ—হিন্দু ধর্ম থাক, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর কোনো দরদ ছিল না। তাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা আফসার তুর্ক বংশীয়। আলিবর্দী খাঁও আরব-তুর্ক বংশীয়। দরিদ্র ভাগ্যান্বেষী। মীরজাফর—সেও ভারতবর্ষে এসেছিল ভাগ্যান্বেষী রূপে। এই নবাবেরা কেউ হোসেন শাহ্‌ নুসরৎ শাহের মত বাঙালী শাসক হন নি, মোগল শাসন ব্যবস্থায় তা আর সম্ভব হত না। অন্তত বাঙ্‌লা ভাষা বা বাঙ্‌লা সাহিত্যের সঙ্গে কারও পরিচয় ছিল না।

ফারসি প্রভাবের বিস্তার ঃ মোগল শাসনে দেওয়ান, বক্‌সী প্রভৃতি বড় বড় কর্মচারীরা দিল্লী থেকে প্রেরিত হত। কেউ তারা দীর্ঘকাল বাঙ্‌লায় বসবাস করত না। যারা জায়গীর, মনসব পেয়ে এখানে বসবাস করত তারাও দিল্লীর কেতা ছাড়তে চাইত না; ফারসি সংস্কৃতি ও ফারসি সাহিত্য ছেড়ে যদি প্রয়োজনে ক্বচিৎ কিছু তারা চর্চা করত তা হচ্ছে হৈন্দবী বা উর্দু। অর্থাৎ এই অভিজাতবর্গ ছিল ফারসি সাহিত্যে মশগুল। শুধু মুসলমান রাজপুরুষ নয়, মোগল রাজ্যের কর্মচারী বা ঠিকাদার রূপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দু'শত বৎসর ধরে হিন্দু ক্ষেত্রী ও লালা প্রভৃতি ভারতীয়েরা

বরাবর আসছিল বাঙলায়। মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার বড়বাজারে তারা কম বাস করত না। কিন্তু তারাও এই ফারসি-কেতা ও হৈন্দবী ভাষা নিয়েই তখন চলত। বাঙলা দেশেও যেসব ব্রাহ্মণ বৈদ্য, মধ্যবিত্ত কায়স্থ প্রভৃতি, পাঠান আমলের মতো, এই মোগল-শাসনে রাজকার্যে স্থান লাভ করে তারাও ফারসি, আরবী এবং 'যাবনী-মিশাল' হৈন্দবী বা উর্দুতে (ভারতচন্দ্র প্রভৃতির মতো) দোরস্ত হত। (দ্রষ্টব্য, ইংরেজিতে লেখা 'বাঙলার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৩।) তবে এরা দেশের নিকটতর, তাই এরা বাঙলা ঐতিহ্যের একেবারে বাইরে যেতে পারে নি। মোগল আমলের সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর এরূপ সুদীর্ঘকালের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালী উচ্চবর্গ বাইরের জীবনযাত্রায় একটু একটু করে দরবারী আদব-কায়দা অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতকে দেখি—বাঙালীর পোষাক-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্তায়, ভাবনায়-ধারণায় একটা দরবারী আড়ম্বর ও ফারসি পালিশ জমেছে, —ফলে ফারসি-আরবী বিষয়বস্তু (Matter of Perso-Arabic World) বাঙালীর আপন হয়ে উঠছে। ভারতীয় ফারসি-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে সেই সূত্রে শাসকবর্গের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক বিভেদও কমে এসেছে।

অবশ্য, এ ঐক্য সামাজিক হিসাবে হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ঐক্য ;—প্রাণহীন, আড়ম্বর-সর্বস্ব, বিলাসী এবং কতকাংশে নীতিবোধ-বিবর্জিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ক্ষয় প্রকট হল—তা রোধ করতে চেষ্টা করবে, দেশে এমন সামাজিক শক্তি কোথাও নেই ;—'নবাবী' আমল এই ক্ষয়েরই শেষপাদ। লক্ষ্য করবার মতো,—সেদিনের ভারতস্থ ইংরেজও এই দুর্নীতি ও বিলাস-আড়ম্বরে সমভাবে যোগ দিয়েছিল, তাই স্বদেশে তাদেরও নাম হয়েছিল 'নাবুব'।

'নাবুবী'-আমল : নবাবের পরে কোম্পানি যখন ক্ষমতা লাভ করলে তখন ইংরেজি 'বণিক-সভ্যতা' এদেশে ইংরেজরা প্রবর্তন করে নি, এই সামাজিক অবক্ষয়ও তাই রুদ্ধ হয়নি। বরং সেদিনের ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে ও শাসক-গোষ্ঠীরূপেও ('কোম্পানি' হিসাবে) প্রচলিত দুর্নীতি ও বিলাস-ব্যসন বাড়িয়ে চলেছে। কোম্পানির নামে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা, দেশীয় বণিক ও কারিগরদের লুঠ করা ও ধ্বংস করা—এতো নবাবী আমলেই ছিল তাদের পেশা। পলাশীর পরে তাতে ইংরেজ বণিকদের কোনো বাধাই রইল না। বরং মীরজাফর-মীরকাশেমদের নবাব বানিয়ে উৎকোচ ও

উপঢৌকন লাভের আর একটা সুবর্ণ সুযোগ এল। বারাণসীর চৈতসিং, অযোধ্যার বেগমরাও তাই নিস্তার পেল না (খ্রীঃ ১৭৭৮-১৭৮২)। ক্লাইব, হেস্টিংস্, প্রভৃতি প্রধানরা বিলাতে ফিরে যান অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে। শুধু তাই নয়, এই লুণ্ঠনে, আড়ম্বরে ও নীতিহীন বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত কোম্পানির সাহেবদের বিলাতের লোকে ইংরেজ বলেই মান্ত না—বিদ্রূপ করে বলত 'নাবুব'। মুর্শিদ কুলী খাঁর ইজারাদাররা বাঙ্‌লার সাধারণ প্রজারায়তকে শোষণ করতে কিছুই বাকী রাখেনি, তা দেখেছি। তারপরে বর্গীরা পশ্চিম বাঙ্‌লার উচ্চ নীচ সকলকে লুঠ করে ত্রাসগ্রস্ত করেছিল। কোম্পানিও শাসন হাতে নিতে না নিতেই শোষণের ও লুণ্ঠনের মাত্রা যে হারে বাড়াল তা শুনলে মুর্শিদ কুলী খাঁও চমকিত হতেন। দেওয়ানী যে বৎসর কোম্পানি নিজের হাতে নিলে সেই খ্রীঃ ১৭৬৫-৬৬ অব্দে ভূমি-রাজস্ব ছিল ১,৪৭০ হাজার পাউণ্ড,—তার পরে ইজারা নিলাম বাড়তেই থাকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বৎসরেও তা কিছুমাত্র বাকী পড়েনি, এই ছিল হেস্টিংসের গর্ব। তার পর বৎসর খ্রীঃ ১৭৭১-৭২এ সে রাজস্ব হয়েছিল ২,৩৪১ হাজার পাউণ্ড; চার বৎসর পর খ্রীঃ ১৭৭৫-৭৬এ তা উঠল ২,৮১৮ হাজার পাউণ্ডে; আর, খ্রীঃ ১৭৯৩তে কর্নোয়ালিস্ রাজস্ব একটু কম হারে ধরে তা স্থির করে ফেললেন ৩,৪০০ হাজার পাউণ্ডে। আশ্চর্য নয় যে, খ্রীঃ ১৭৭০-এ যে মন্বন্তর হল তাতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মরল, লোকের পরিত্যক্ত বসতি জঙ্গলে পরিণত হল।

ভূমি-রাজস্ব ও ব্যক্তিগত লুঠ বা রাজকোষ-লুণ্ঠন তো ছিলই, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও কোম্পানি দেশের মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যায়। তাই গবর্নর ভেরলেস্ট-এর মুখে শুনি খ্রীঃ ১৭৬৬-৬৮ দুই বৎসরে বিলাত থেকে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬,২৪,৩৭৫ পাউণ্ডের, আর বিলাতে রপ্তানীর দাম ৬৩,১১,২৫০ পাউণ্ড; এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাজকোষের মণিমুক্তার দামও আছে। কোম্পানির সাহেবদের ব্যবসায়ী-দৌরাত্ম্যে দেশের ব্যবসায়ী ও পাইকাররা আরও আগে থাকতেই ধ্বংস হতে বসেছিল। এখন বণিক শাসনে তাদের জীবনলাভের সম্ভাবনাও আর রইল না। ক্রমে গোটা ভারতবর্ষই ইংরেজের 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা'র অধীন হল। এ দেশের আর্থিক শক্তি সংগঠনের সম্ভাবনা তাই পলাশীর পরে আরও সুদূর হয়ে গেল, যথার্থ সামাজিক বিপ্লব আরও তাই ব্যাহত হল ইংরেজ-শাসনে। অন্য দিকে

ভারত লুণ্ঠনের ঐশ্বর্যেই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ভাবী-সৌভাগ্যের গোড়া-পত্তন হয় ;—ইংরেজ বণিকের ব্যবসা বাড়ে, বাণিজ্য বাড়ে, কল-কারখানার উপযোগী পুঁজি জমে ওঠে ইংরেজের হাতে,—ভারতের অর্থে বিলাতী পুঁজিবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায় খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই। অর্থাৎ পলাশীর পাপ-চক্রে বাঙালী সমাজ আরও বাঁধা পড়ে ;—দেশে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হল না বলে বিদেশী বণিক্ রাজা হল, আর বিদেশী বণিক্ রাজা হল বলেই পুরনো পল্লী-সমাজ ও তার আর্থিক ব্যবস্থা সে ভাঙ্ল, কিন্তু সমাজ-বিপ্লব কিছুতেই সার্থক হতে দিল না।

কোম্পানির আমলের 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়' তাই কি ফল লাভ হল? পুরনো অভিজাতরা নিঃশেষ হল, তাদের সহযোগী পূর্বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অনেকাংশে নিরাশ্রয় হল, দেশীয় ব্যবসায়ী বণিকরা আরও দুর্বল হল, এবং কারিগর, চাষা ও প্রজা-সাধারণ উপদ্রবে, উৎপীড়নে, মন্বন্তরে আরও দুর্দশাপন্ন হল। আর রক্ষা পেল কারা? রক্ষা পেল পূর্বযুগের কিছু কিছু চতুর ইজারাদার, কোম্পানির সহযোগী কিছু কিছু ব্যবসায়ী বেনিয়ান, সাহেবদের অনুগ্রহ-জীবী দেওয়ান, মুন্সি, দালাল, মুৎসুদ্দি ;—এবং এদেরই আশ্রিত সহকারী উচ্চবর্ণের কিছু কিছু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। কর্নোয়ালিসের ভূমি-ব্যবস্থায় এদের একটা স্থায়ী এবং স্থাণু জীবিকা-ক্ষেত্র মিলল, এরা মধ্যস্বত্বভোগী ও বেতনজীবী হয়ে কতকাংশে একটা সামাজিক শক্তিও হয়ে উঠতে পারল—উনবিংশ শতকে তা দেখা যাবে।

কিন্তু মোটের উপর খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে খ্রীঃ ১৮০০ পর্যন্তও আমরা ইংরেজ শাসন ও এদেশের ইংরেজ চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাতে কোম্পানির আমলের এই প্রথম ভাগ নবাবী আমলেরই জের। সেই একই সমাজ-চরিত্র —বা সামাজিক চরিত্রহীনতা—এ সময়েরও প্রধান লক্ষণ। অর্থাৎ নবাবরা গেল, 'নাবুব'দের আমল চলল। সমস্ত অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য এই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিলিপি : মধ্যযুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগের পথ অবরুদ্ধ ; দেবতায় আস্থা নেই, কিন্তু মানুষেই বা আস্থা কোথায়? বিষয়-বুদ্ধির অভাব নেই, কিন্তু বাস্তব-বোধ কোথায়? পৌরুষ কোথায়? উদ্যোগ কোথায়? মনুষ্যত্ব কোথায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুরাতনের অনুবৃত্তি

(খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০)

সকল যুগেই যা যুগ-লক্ষণ, তার পাশেই থাকে পূর্বযুগের প্রচলিত অনেক লক্ষণ এবং হয়তো যা আগামী যুগে পরিস্ফুট হবে তারও বীজ। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়ে তাই ভাবী লক্ষণগুলি যেমন চোখেই পড়ে না, তেমনি অতীতের পল্লবিত বিস্তারকেই মনে হয় প্রধান। অষ্টাদশ শতক যখন আরম্ভ হচ্ছে তখনো তাই বৈষ্ণব-সাহিত্য, মঙ্গল-কাব্য, পৌরাণিক অনুবাদ প্রভৃতি প্রচলিত সাহিত্য-রূপ প্রকাশ্যতঃ প্রবলই ছিল, কিন্তু ছিল না তাতে প্রাণস্ফূর্তি। অভ্যাস মতো অভ্যস্ত নিয়মে কবিরা যা লিখছিলেন বাহ্যতঃ তা হয়তো ত্রুটিহীন, কিন্তু অন্তরে প্রায়ই দৈন্যগ্রস্ত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারা

অষ্টাদশ শতকে মনে হয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাও বাহ্যতঃ সমভাবে প্রবহমাণ—পদাবলী লেখা হচ্ছে, জীবনী-কাব্য রচিত হচ্ছে, কৃষ্ণ-মঙ্গলের নূতন কাব্যও প্রণীত হচ্ছে। বরং কোনো কোনো দিকে নূতনত্বও দেখা যায়—বৈষ্ণব-কাব্য ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ এ সময়ে বেশ বৃদ্ধি পায়, এবং শ্রীহট্টে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে, বিষ্ণুপুরের রাজসভা বৈষ্ণব-সাহিত্যের তখনো প্রধান পীঠস্থল হয়ে আছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে প্রয়োজন বোধে অষ্টাদশ শতকের এরূপ প্রধান প্রধান কাব্যের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি—যাতে ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয় এজন্য। পুনরুল্লেখের ভয় থাকলেও দু'এক ক্ষেত্রে এখনো সে সব গ্রন্থ ও লেখকদের কথা আলোচনা না করলে আরও ত্রুটি ঘটবে।

জীবনী-কাব্য ঃ বৈষ্ণব-জীবনীকারদের মধ্যে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে প্রেমদাসের নাম ও নরহরি চক্রবর্তীর নাম।

প্রেমদাস নামেই পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশের পরিচয়, তাঁর কাব্যে যথারীতি নিজের কুলপরিচয়ও আছে। প্রেমদাস দুখানি বৈষ্ণব-জীবনীর রচয়িতা। তার মধ্যে 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী' (খ্রীঃ ১৭১২-১৩) মূল কাব্য

নয়, কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে'র তা অনুবাদ, এবং সৌভাগ্যক্রমে সুপাঠ্য অনুবাদ। তার পরবর্তী গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা' (১৭১৬-১৭), চার উল্লাসে সমাপ্ত। কবির গুরুর পিতৃপুরুষ বংশীবদনকে (চট্ট) শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব-কথা উপদেশ দিচ্ছেন, সে উপলক্ষে বংশীবদনের পুত্র-পৌত্রাদি, চৈতন্যদেব, জাহ্নবী দেবী প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু জানা যায়—চণ্ডীদাসের ভণিতায় সাধনাঘটিত পদও কিছু আছে। 'রসরাজ'-সাধনার ধারার তত্ত্ব আছে এ গ্রন্থে,—মূল উদ্দেশ্য জীবনী-রচনা নয়।

নরহরি চক্রবর্তী বহু গ্রন্থের প্রণেতা। এ যুগের জীবনী-কাব্যের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। "তাঁর 'ভক্তি-রত্নাকর' বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিশ্ব-কোষ-তুল্য।" 'নরোত্তম-বিলাস' সে গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ। কিন্তু নরহরির তৃতীয় জীবনী-গ্রন্থ 'শ্রীনিবাস-চরিত্র' পাওয়া যায় নি। তা ছাড়াও নরহরি চক্রবর্তী ('ঘনশ্যাম' নামে) অনেক পদ রচনা করেছেন, 'গীত-চন্দ্রোদয়' নামে পদ-সংকলন গ্রন্থেরও তিনি সংকলক, 'গৌর-চরিত্র চিন্তামণি' নামক গৌরাঙ্গ-পদাবলীরও সংগ্রাহক। ছন্দ বিষয়েও তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। নরহরিরও নিজের কথায় তাঁর পরিচয় রয়েছে—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ ছিলেন তাঁর পিতা, আর তাঁদের বাড়ি ছিল গঙ্গার পূর্বতীরে সৈয়দাবাদের নিকটে (মুর্শিদাবাদ)। এই 'ভক্তি-রত্নাকর' অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বৈষ্ণব-জীবনী ও বৈষ্ণব-কথার আকর।

আরও জীবনী-গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে উদ্ধবদাসের 'ব্রজমঙ্গলে' আগ্রহ জাগতে পারে, তাতে কবি লোচনদাসের কথা আছে বলে। লোচনদাস 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র চৈতন্যলীলা, কৃষ্ণলীলা ও রাগাত্মিকা পদাবলীর কবি ও সাধক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্য-জীবনীও লিখিত হয়েছে ; তার মধ্যে শ্রীহট্টের কবিরা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর জ্ঞাতিদের নিয়ে নিবন্ধ-কাব্য লিখতে উৎসাহী ছিলেন। তা ছাড়া কৃষ্ণ-মঙ্গল জাতীয় কাব্য-নিবন্ধ প্রভৃতিও সেখানে রচিত হয়েছে। নবনীদাসের 'জগন্মোহন ভাগবত' উল্লেখযোগ্য। মনে হয় লেখক সে অঞ্চলের সুফীভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঙালী বৈষ্ণব-সাধনায় ও সংস্কৃতিতে শ্রীহট্টের স্থানটি বোঝা যায়—শ্রীহট্টের সুফী-ঐতিহ্য স্মরণে রাখলে। উনবিংশ শতকেও শ্রীহট্টে ভক্ত-জীবনী ও বৈষ্ণব নিবন্ধাদি লেখা হয়েছে।

'কবিচন্দ্রে'র 'কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের' কয়েকটি পালা বহুস্থলে পাওয়া যায়। গ্রন্থ বড় ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রচিত হয়েছিল দুর্জয় সিংহের রাজ্য-কালে (খ্রীঃ ১৭০২এর পূর্বে ?)। 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দ মঙ্গলের' —'প্রসাদ চরিত্র' লিখিত হয় গোপাল সিংহ দেবের রাজ্যকালে—'ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।' ভাগবতের দশমস্কন্ধ তাতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, অন্য লীলা সংক্ষিপ্ত। তবে নানা নূতন কাহিনীও যোগ হয়েছে,— সেগুলি বাঙালী বৈষ্ণবদের কল্পনার বাহাদুরি—যেমন কলঙ্ক-ভঞ্জন, কৃষ্ণকালী ইত্যাদি। শঙ্কর চক্রবর্তী আরও অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন—তাঁর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঁচালী'ই 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে সুপ্রচলিত, (পরে দ্রষ্টব্য); তাঁর লিখিত 'সংক্ষিপ্ত ভারত পাঁচালী' আছে, 'ধর্ম-মঙ্গল'ও আছে এ অঞ্চলে। 'কবিচন্দ্র' বিখ্যাত কবি, নিজের পরিচয়ও রেখে গিয়েছেন। শঙ্কর ছিলেন পানুয়া নিবাসী মুনিরাম চক্রবর্তীর পুত্র—'লেগ্যোর দক্ষিণে গ্রাম পানুয়ায় বসতি।'

পৌরাণিক ও বিবিধ কাব্য—কৃষ্ণলীলার পুঁথির অভাব নেই—মল্লভূমি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সবত্রই কিছু-না কিছু পাওয়া যায়। শুধু ব্রজলীলা নিয়েই নয়, বৈষ্ণবদের সমাদৃত নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকা নিয়েও অনেক কাব্য রচিত হয়েছে; বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ প্রভৃতি থেকে তা আহরিত; যেমন প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, তুলসী-চরিত্র, প্রভৃতি। এসব নিয়ে কথকতা, পাঁচালী যেমন হত, তেমনি পুঁথিও তখন হয়েছে।

গতানুগতিক ভাবে ভাগবত ও পুরাণ থেকে কৃষ্ণলীলার কাহিনী ও নৌকাখণ্ড প্রভৃতি কাহিনী উনবিংশ শতকেও যে রচিত হয়ে চলে, তাও জানা কথা।

অনুবাদ ও নিবন্ধ—গীতগোবিন্দের অনুবাদ খান চার পাঁচ আছে এসময়কার, আগেও অনুবাদ ছিল। বৈষ্ণব গোস্বামীরা যেসব সংস্কৃত কাব্য, নাট্য, দর্শন লিখেছিলেন তা-ই ছিল বৈষ্ণবদের প্রধান অবলম্বন। সে সবের অনুবাদও তাই প্রয়োজন ছিল; তা একটা পুণ্যকর্মও হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমদাস অনুদিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'র মতো তা উপাদেয় হোক্ বা না হোক, সে সব অনুবাদের সমাদর ছিল। যেমন, রূপ গোস্বামীর 'ললিত-মাধব-নাটকে'র অনুবাদ করেন স্বরূপচরণ গোস্বামী 'প্রেমকদম্ব' নামে; যদুনন্দন

দাস 'বিদগ্ধ মাধবের' অনুবাদ করেন 'রসকদম্ব' নামে, রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের অনুবাদ করেন গোপাল দাস। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র একাধিক অনুবাদ চলে, তা স্বাভাবিক। গোস্বামীদের কবিতার, স্তবের, সংস্কৃত উদ্ধৃতির—সবকিছুরই অনুবাদ হতে লাগল। কিন্তু ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে বৈষ্ণবজীবনীর একমাত্র অনুবাদ নাভাজীর 'ভক্তমাল' গ্রন্থ, তা দেখেছি।

এসব অনুবাদ গ্রন্থের অপেক্ষাও সাহিত্যের পক্ষে অবান্তর বৈষ্ণবদের লেখা বৈষ্ণব নিবন্ধ ও তার অনুবাদ,—একমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসেই তার দাম থাকতে পারে। বাঙ্‌লা গদ্যের অস্ফুট আভাসও তাতে কিছুটা পাওয়া যায়।

মঙ্গল-কাব্যের ধারা

মঙ্গল-কাব্যের লৌকিক আধারের উপর পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর ভার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে পৌছে দেখি পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহই এ ধারার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনো কখনো একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর থেকে এখন মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা দেবী ভাগবতের চণ্ডীর মাহাত্ম্য-রচনা কম প্রচলিত নয়। এদিকে অষ্টাদশ শতকে এবং উনিশ শতকেও মঙ্গল-কাব্যের সেই সরল বাস্তবতা কমে গিয়েছে। এরূপ অধিকাংশ কাব্যের সাহিত্যিক,—কিংবা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক,—মূল্য বিশেষ নেই, অযথা তাই আমাদের তালিকা দীর্ঘ করে কি হবে? একালের মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ধর্মমঙ্গল। ধর্মমঙ্গলের স্বতন্ত্র আলোচনা এখানে প্রয়োজন; কারণ ধর্মমঙ্গলের প্রধান যুগ অষ্টাদশ শতক। শিবায়নও প্রকৃতপক্ষে এসময়েই স্বাতন্ত্র্যলাভ করে।

মনসা-মঙ্গল ঃ মনসা-মঙ্গলের কাব্যে যা রচিত হচ্ছে তাতে এই কালের ছন্দ ও ভাষার সহজ পরিচ্ছন্নতা পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশি বিশেষ কিছু নেই—হট্টের কবি ষষ্ঠীবরের (দত্ত) লেখায় ছাড়া (রামায়ণ-রচয়িতা ষষ্ঠীবর অন্য লোক)। সে গ্রন্থে হর-পার্বতীর প্রাগৌদ্বাহিক লীলা-কাহিনীতে একটু নূতনত্ব আছে, গৌরীর 'কাব্যদেবী'র পূজা ও শিবের 'কেওয়ালী' (কাপালিক) নাটগীত দু'টি নূতন ব্যাপার। অধিকাংশ কবিই (২০ জনেরও বেশী) পূর্ববঙ্গের,—একজন ছিলেন সুষঙ্গের রাজা। চট্টগ্রামের রামজীবন

বিদ্যাভূষণ (খ্রীঃ ১৭০৩-৪) মনসা-মঙ্গল ছাড়া 'আদিত্য চরিত', 'সূর্যমঙ্গল পাঁচালী' প্রভৃতি লিখেছিলেন। পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলসমূহ পালাগানের নিয়মে গায়েনের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে গড়ে উঠেছে ; উত্তরবঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের মতো নির্দিষ্ট লেখকের লিখিত কাব্য হয়ে ওঠে নি।

উত্তরবঙ্গের কাব্যে দুটি খণ্ড স্থির হয়ে এসেছে ; যথা, দেবখণ্ড, তাতে আছে দেবদেবীদের প্রণয়, ঈর্ষা, বিবাদ প্রভৃতি ; আর বণিকখণ্ড, এটিই চাঁদ বেণে ও বেহুলার কথা। উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষাল দিনাজপুরের কোচ-আমোরার লোক, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র করতোয়াতীরের লাহিড়িপাড়া গ্রামের অধিবাসী (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ২৮৬-৯৯)

পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে দ্বিজ বাণেশ্বর (রায়ের) নাম আছে। উনবিংশ শতকেও সেনভূম-মল্লভূমের মধ্যবর্তী আখড়াসোলের গ্রামের কবি দ্বিজ রসিক বিরাট মনসা-মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেছেন, দেখতে পাই (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ২৯২)।

চণ্ডীমঙ্গল : মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব কেউ কাটিয়ে উঠতে আর পারল না ; পূর্বানুবৃত্তি করে অনেকে তবু রচনা করেছেন চণ্ডীমঙ্গল। উত্তরবঙ্গের মোদককুলের শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস লিখেছেন 'দুর্গামঙ্গল', চট্টগ্রামের মুক্তারাম সেন লিখেছেন 'সারদামঙ্গল', ভবানীশঙ্কর দাস 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা'। রামচন্দ্রযতির চণ্ডীমঙ্গলই (খ্রীঃ ১৭৬৬-১৭৬৭) কয়েকটি কারণে আলোচ্য। প্রথমতঃ, রামচন্দ্র-যতি 'রামায়ণে'রও লেখক, এ কাব্যেই আরও তিনি জানিয়েছেন যে তা ছাড়াও 'সংস্কৃতে পঁচিশ পুস্তক করি আর'। দ্বিতীয়তঃ, এই মঙ্গলকাব্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী কবি (হয়তো আপন অক্ষমতার বশেই) কড়া সমালোচনা করেছেন—"পুরানো বাঙ্‌লা সাহিত্যে এইই প্রথম সাহিত্য সমালোচনা" । কাব্যমধ্যে ভারতচন্দ্রের উল্লেখও আছে।

বিক্রমপুর জপসা গ্রামের জয়নারায়ণ সেন (রায়) 'চণ্ডিকামঙ্গল' ছাড়াও 'হরিলীলা' লিখেছিলেন (খ্রীঃ ১৭৭২-৭৩, 'হরিলীলা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩এ প্রকাশিত হয়)। ভারতচন্দ্রের যুগের কবিকৃতির যে উন্নতি ঘটেছে, 'হরিলীলা'য়ও তা দেখা যায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই পরিবারের সাহিত্য ও বিদ্যানুশীলন (দ্রষ্টব্য—দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', পৃঃ ১৪৭৭)। জয়নারায়ণের অগ্রজ রামগতি ও অনুজ রাজনারায়ণও গ্রন্থ রচনা করেছেন—অগ্রজ ছিলেন ধর্মানুগত তিনি যোগশাস্ত্রের

গ্রন্থ লিখেছেন; অনুজ ছিলেন রসবিলাসী, তিনি গ্রন্থ লিখেছেন সংস্কৃতে। কিন্তু তার চেয়ে স্মরণীয় কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী;—তিনিও 'হরিলীলা'র কিছু কিছু রচনা করেছিলেন, আর তাঁর বিদ্যার খ্যাতিও ছিল সর্বত্র (দ্রষ্টব্য—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ১৮৭২)। চণ্ডিকামঙ্গলে কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী ছাড়াও মাধব-সুলোচনার কাহিনী জয়নারায়ণ যোগ করেন তাঁর ভাগিনেয়ী গঙ্গা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী দয়াময়ীর অনুরোধে। মোটামুটি এ সময়কার অনেক মঙ্গলকাব্যের অপেক্ষা জয়নারায়ণের এ গ্রন্থ আদরণীয়।

চণ্ডী সপ্তশতীর অনুসরণে লিখিত চণ্ডী ও ধনপতি খুল্লনার কাহিনী নিয়ে লেখা ব্রতকথা-শাখার লেখাগুলির খোঁজ নেওয়া বিড়ম্বনা। মূল্য যাই হোক্, লেখা ও লেখকের অভাব নেই।

ধর্মমঙ্গল ও ধর্মের গীত

অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যেই সজীবতা দেখা যায়; নূতন করিয়া এখানে কবি-কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। অবশ্য এ দিনের সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতকের শেষদিকে, আমরা তা দেখেছি। 'নবাবী আমলের' ধর্মমঙ্গলের ও ধর্মের গানের প্রধান কবিদের কথাই তাই এখানে আলোচনা করা হল,—যেমন, ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, মাণিক গাঙ্গুলী, রামকান্ত রায়, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই প্রায় সেই দামোদর তীর ও বর্ধমান-হুগলীর অন্তর্গত ধর্মঠাকুরের প্রিয় বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী।

ধর্মমঙ্গল বা ধর্মের গানের কথা বাঁধাধরা; তাতে বৈচিত্র্য বড় নেই। সাধারণভাবে কবিদের এক-আধটুকু বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যায়,—তাও সময়ে সময়ে। কিন্তু এটা দেখছি একালের ধর্মমঙ্গলের কবিরা মোটামুটি পদ্য-রচনা করতে অসুবিধা বোধ করেন না। তাও হয়তো অষ্টাদশ শতকের সাধারণ গুণ, ও বিদ্যাটা লেখকদের অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সে শতাব্দীর ক্ষয়-লক্ষণ ধর্মমঙ্গলের কাব্যধারায় কম, কারণ ধর্মমঙ্গল পল্লীর জনতার জিনিস।

ধর্মমঙ্গলের কথাবস্তু একঘেয়ে, কিন্তু তার কবিদের আত্ম-কাহিনী বিচিত্র। অবশ্য তাতেও কতকগুলি মামুলী জিনিস আছে—যেমন, কবিমাত্রই স্বপ্নে আদেশ পান, পথে বেরিয়ে ব্রাহ্মণ-বেশী ধর্মঠাকুরকে দেখতে পান (পূর্ব-যুগে সিপাহী বা সন্ন্যাসী বেশেও তাঁকে দেখতে পেতেন), পথে দিশাহারা

হন, শঙ্খচিল উড়তে দেখেন, গৃহে ফিরে জ্বরে পড়েন, জ্বরের ঘোরে আবার আদেশ শুনতে পান, ইত্যাদি। সেদিনের জীবনের আচার-নিয়মের মতোই এগুলোও ছিল এ ধরণের কাব্যের ও কবি-জীবনের 'কন্‌ভেন্‌শান্‌'—প্রথা, নিয়ম। সেদিনের গ্রাম্য জীবন-যাত্রার ধরণটাও (প্যাটার্ন) ছিল একটু এক-ঘেয়ে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক কবিরই পরিবার-পরিজন ও নিজ নিজ বাস্তব জীবন-পরিবেশ স্বতন্ত্র, কাজেই সেসব উল্লেখ করতে গিয়ে প্রত্যেককেই নূতন কথা কিছু বলতে হয়। তাই ধর্মমঙ্গলের আখ্যানাংশ থেকেও কবি-কাহিনীর অংশ চিত্তাকর্ষক হয়। যা ছিল একসময়ে কবিদের পক্ষে প্রথাগত কুল-পরিচয়, এ কাব্যধারায় তা অনেকাংশে পরিণত হয়েছে আত্মজীবনী রচনায়।

ঘনরাম চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গলের সুপরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী 'কবিরত্ন'। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনকে বাদ দিলে ঘনরামের খ্যাতিই এ শতাব্দীতে অধিক। অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের কবির মত ঘনরামের আত্মকাহিনী পাওয়া যায় না, কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনের সংগ্রহ থেকে সে পরিচয় সহজ-লভ্য হয়েছে। ঘনরাম বর্ধমানের সন্নিকটে কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন তাঁর আশ্রয়স্থল। খ্রীঃ ১৭১১তে তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' রচনা শেষ হয়,—তিনি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও রচনা করেছিলেন।

ঘনরামের বিষয়ে সংগৃহীত জীবনী-কথায় ঘনরামের অপেক্ষা বেশি আছে তাঁর গুরু ভট্টাচার্যের কথা, নীলাচলযাত্রা, রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার, গুরুর নির্দেশ মতো ঘনরামের রামায়ণ লেখার চেষ্টা, আর শেষে ধর্মমঙ্গল লেখার আদেশ।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের'র বহুপূর্বে রচিত, কিন্তু ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রা বা কানড়ার যুদ্ধ প্রভৃতি অংশ (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৪৩৬, ৪৪৪ আদি) তুলনা করলে ঘনরামকে অযোগ্য পূর্বগামী বলা চলে না। পত্ত স্বচ্ছন্দগামী, অথচ অনুপ্রাসে অলঙ্কারে চমকপ্রদ। লখ্যা কিম্বা হরিহর বাইতির স্ত্রীর মতো স্ত্রীচরিত্র রচনায় সত্য-নিষ্ঠা ছাড়াও ঘনরাম আর একটি নূতন অনুভূতির প্রমাণ দিয়েছেন; তাঁর দৃষ্টি উদার; ভারতচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্র তুলনা করলেই তা বুঝা যায়।

সাময়িক লোভে হরিহর বাইতির নিম্নোক্ত উক্তি লক্ষণীয়:

হরিহর বলে শুন বাইতির ঝী।
বসে কর বিলাস তোমার লাগে কী॥

ধন হতে ধরম ধরণী ধরে লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাব তোকে।…
অধর্মের বাধ্য বসু ধর্মের অকার্য।
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য॥

এরূপ ধন-স্তুতি মহাভারতেও আছে, তথাপি এ 'নবাবী আমলে'রই আভাস।

কিন্তু কি অর্থে ঘনরাম নিম্নোক্ত নিবেদন করছেন, তা বোঝা এখন দুষ্কর :

রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥

এ পংক্তি যদি আধুনিক প্রক্ষিপ্ত না হয়, এবং এখানে "দেশ" যদি সত্যই বর্ধমান অঞ্চল ও "রাজা" কীর্তিচন্দ্রকে না বুঝিয়ে থাকে, তা হলে এইখানে পাই বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই প্রথম (খ্রীঃ ১৭১১) দেশাত্মবোধের আবির্ভাব। অথচ দেশাত্মবোধ কিছুটা থাকলে পলাশীর প্রহসনটা এমন ট্র্যাজিডিতে পরিণত হবার কথা নয়।

নরসিংহ বসু—নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলের পুঁথিতে জাফর খাঁর (মুর্শিদ-কুলী খাঁ) নাম রয়েছে। এ কবিও বর্ধমানের কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক, তাই অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর পুঁথি রচিত হয়ে থাকবে। বর্ধমানের শাঁখারী গ্রামে তাঁদের বাস ছিল। পিতৃহীন বালক পিতামহীর নিকট পালিত হয়। কায়স্থ কবি জানিয়েছেন—সেই পিতামহীর চেষ্টায়

বাঙ্গলা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী।

সেদিনের শিক্ষিত মানুষের ভাষা-শিক্ষাটা তা হলে নিতান্ত সামান্য হত না। তারপর নরসিংহ বসু বীরভূম রাজনগরের আসদুল্লা খানের পক্ষে বকীল হন মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে। কিন্তু নিজের কাব্য প্রণয়নের সূচনায় তিনি দেশের অবস্থা যত বলতে পারতেন তত বলেন নি।—মুর্শিদ কুলী খাঁর আমল; আসফুল্লার খাজনা বাকী পড়ায় নরসিংহ ছুটে আসেন রাজনগর; খাজনা পাঠিয়ে নিজেও আবার মুর্শিদাবাদ রওনা হন,—এই সোদ্বেগ যাত্রাটি সুন্দর বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি কুসুটির ধর্মঠাকুরের স্থলে পেলেন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ। নরসিংহকে ধর্মমঙ্গল লিখতে বলে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হলেন। নিজ গ্রাম শাঁখারীতে পৌঁছে কবির জ্বর হল। তারপর মুর্শিদাবাদ গিয়ে

তিনি খাজনা মিটিয়ে দিলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে তখন লিখতে বসলেন ধর্মের গান,—কারণ 'ধর্মের কৃপায় হইল দরবার জয়।' (দ্রষ্টব্য—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৪৫৬-৫৮১)

মানিকরাম গাঙ্গুলী—মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে কাল উল্লেখিত হয়েছিল সংকেতে। অনেক পূর্বেকার কবি বলে তাঁকে তাই ধরা হত। এখন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে প্রশ্ন সুমীমাংসা করে দিয়েছেন। তাই জানি—এর রচনা শেষ হয়েছিল খ্রীঃ ১৭৮১তে। কাব্য মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃ ১৬৯৪) ও 'রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন' কাহিনী সপ্তদশ শতকের জিনিস। তা ছাড়া কাব্যে ঘনরামের প্রভাব অনুমান করা যায়, রূপরামের নামও পাওয়া যায়। ভাষায়ও অষ্টাদশ শতকের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে; একটু হাস্যরসও মানিকরামের ছিল। কবি আত্ম-কাহিনী লিখে গিয়েছেন।

মানিকরাম হুগলী জেলার আরামবাগ মহাকুমার বেলডিহার (বেলটে) গদাধর গাঙ্গুলীর পুত্র। নানা টোলে পড়ে মানিকরাম গিয়েছিলেন ভুড়াড়িতে ন্যায় পড়তে, কিন্তু মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। সেখানে স্বপ্ন দেখলেন—গৃহে ফিরতে আদেশ হল। ঘরের পথে নদী পেরিয়ে তিনি দিশাহারা হলেন, তখন ছুটতে লাগলেন। দেশড়ার মাঠে তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে দেখা দিলেন ধর্মঠাকুর—

অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসা-বাড়ি হাতে।

ব্রাহ্মণের কিন্তু 'দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব-শরীর'; তিনি নিজের নাম বললেন 'রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঙ্গপুরে ধাম'। সত্য ধর্ম উপদেশের জন্য মানিকরামকে তিনি নিজ গৃহে আহ্বান জানালেন। একটু গিয়েই কিন্তু কবি ফিরে দেখেন কেউ কোথাও নেই। তারপর আর-এক ধর্মের পূজারী ব্রাহ্মণও পথে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন 'রাজ্যধর বিদ্যাপতির' কথা, এবং বললেন ধর্মের পাদুকার সেবা করতে। অমনি মানিকরাম দেখলেন সম্মুখে দিব্য সরোবর, তাতে পদ্ম ফুটে আছে। কবি সে ফুল তুললেন। 'ধর্মায় নমঃ' বলে পুজো করলেন। এরপর বাড়ি ফিরে দুদিন বাড়িতে থেকে চললেন রঙ্গপুর। পথে তারাজুলীর তীরে আবার দেখলেন এক ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর দস্যু মূর্তি, মানিকরামকে সে খুন করতে চায়। অনেক অনুনয়ে রঙ্গপুর যাবার কথা বলাতে কবি রেহাই পেলেন। রক্ষা পেয়ে যেই আবার

দৌড়ুলেন, দেখ্‌লেন—ব্রাহ্মণও নেই। রম্ভপুরে গিয়ে দেখেন—কোথায় রাজ্যধর বিদ্যাপতি? সে নামের কেউ নেই সেই গ্রামে। কবি ভয় পেয়ে স্বগ্রামে ফিরে এলেন। যথারীতি জ্বর এল আর জ্বরের মধ্যেই স্বপ্নে এলেন ধর্মঠাকুর,—বললেন, ধর্মের গান লেখো।

বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।

আদেশ হল 'বার দিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি'। মানিক গাঙ্গুলী কবিতা লিখবেন, আর তাঁর চতুর্থ সহোদর গায়েন হবেন। কিন্তু ধর্মের পুঁথি ব্রাহ্মণে লিখলেও গায়েন ও পূজারী হয় সাধারণতঃ নীচ জাত। তাই মানিকরামের ভাইএর জন্য অনুনয়—

জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।

ঠাকুরও সান্ত্বনা দিলেন—ভক্তাধীন ভগবানের মতো—'আমি তোর জাতি, তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি।' এর পরে লেখা আরম্ভ। মোটামুটি ভালোই লিখছেন তা মানিকরাম।

রামকান্ত রায়—রামকান্ত রায়ের আত্মকাহিনীতে নূতনত্ব আছে। তিনিও দামোদর-অঞ্চলের লোক; বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত সেহারা গ্রামের তাঁরা অধিবাসী। সেখানে বাঞ্ছারাম সরকারের বাড়ির কাছেই বাব্‌লাতলায় ছিল ধর্মঠাকুরের স্থান; গ্রামে এ দেবতার নাম বুড়াঠাকুর। রামকান্ত তাঁর আদেশেই ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে (খ্রীঃ ১৭৮৩?)। উপলক্ষটা এরূপ (দ্রষ্টব্য—ডঃ সেন: বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৭২৯-৭৩৭): কবি বলছেন 'মাস ছয় বেকার বসিয়া আছি ঘরে'। তাঁরা চাষী গৃহস্থের পরিবার, কায়স্থ; ঘরে বসে খাওয়া চলে না। ক্ষেতির কাজ করা ছাড়া আর গতিও নেই; কিন্তু কবির তা মনে ধরে না। হয়তো ক্ষেতের চাষ-বাসে লাভও তখন কমে আসছিল, এবং সেদিনেও লেখাপড়া শিখলে কেউ ওরকম ক্ষেতের কাজে আগ্রহ বোধ করত না, তা অনুমান করতে পারি। যা হোক্‌, তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় বেকার কবির বেকারত্বের বর্ণনা। বোধ হয় বাঙ্‌লা সাহিত্যে তা এই প্রথম এবং এখনকার তুলনায়ও এ বর্ণনা একেবারে পুরনো হয়ে যায় নি।

দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন
প্রবৃত্তি না দেয় কিসে বিচলিত মন।

ধড় ফড় করে প্রাণ অন্তর বিকল
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল।

এদিনে হ'লে শহরে আসতেন—দরখাস্ত নিয়ে ঘুরতেন। সেদিনে—

দিবানিশি শয়নে স্বপনে দেখি কত
দিন কুড়ি উচাটন সয় এই মত।
কাহারে না বলি কিছু অন্তর গুমরে
সারাদিন বেড়াই সভার ঘরে ঘরে।
বহুদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে
ইচ্ছা নাই বচন কহিতে কার আছে।
নিদ্রা নাই শয়নে শর্বরী জাগরণে
উম্মা হয় যদি কিছু বলে কোন্ জনে।

খ্রীঃ ১৭৮৩-র তুলনায় বেকারের অবস্থা এখন আরও জটিল হয়েছে, মনোভাবও তীব্র হয়েছে ; কিন্তু এ বর্ণনা এখনো সত্য। রামকান্ত রায় বেকারের অনুভূতি যথার্থ বর্ণনা করতে পেরেছেন,—এ সহজ শক্তির কথা নয়।

এর পরে অবশ্য আসল প্রস্তাবনা। একদিন ভাদ্রমাসে কৃষাণের জন্য জলপান দিয়ে আসতে রামকান্তকে পিতা মাঠে পাঠালেন। মনে রাগ হলেও রামকান্ত চললেন, আর ঘরের বা'র হতেই দেখলেন শঙ্খচিল।—আর যায় নেই। বুড়াঠাকুরের বাব্‌লা গাছের দিকে কবি তাকালেন, দেখলেন সেখানেও বসে আছে শঙ্খচিল। কবির অন্তর হৃষ্ট। জলপান দিয়ে ক্ষেতে তাই ধান দেখে বেড়াতে ইচ্ছা হল। বেড়াতে লাগলেন। বেলা বাড়ছে, তৃষ্ণায় ছাতি কাটে, কিন্তু বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা হলেও ফিরতে পারেন না, এমনি দৈব-চক্রান্ত। রামকান্ত রায় প্রায় ছোটখাটো একজন সাইকোলজি-ক্যাল কথা-সাহিত্যিক। কিন্তু বর্ণনাও করতে কবি জানেন—নাম করে করে স্পষ্ট করে তোলেন প্রতিটি বস্তু ; ওইতো সাকুড়া-পুকুর দেখা যায়। মুখে চোখে তিনি জল দেন। গায়ে কাঁটা দেয়। শরীর কেমন ছম ছম করে। মাঠের মধ্যে ঘোর অন্ধকার দেখেন। পা অবশ, গায়ে ঘাম ঝরে, একবারে সম্বিৎ হারান! চোখ যেই মেলেছেন

হেন কালে দেখি এক অদ্ভুত ব্রাহ্মণ।

বুঝা গেল যে তিনি কে। কিন্তু একটু নূতনত্ব আছে

অর্ধচন্দ্র পরিধান কানেতে জবা ফুল
মাথায় লম্বিত জটা সর্প সমতুল।

বিষ্ণুর মতো নয়, শিবের মতো দেখতে ব্রাহ্মণ। কবি বিস্ময়ে বিমূঢ়। ভয় না অভয়, নিদ্রা না জাগরণ কিছুই সাইকোলজিস্ট-কবি ঠিক পান না। অবশ্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরই কবিকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। জানালেন সকাল থেকে তিনি রামকান্তকে খুঁজছেন, একা তাঁকে একবারও পান্ না;—তিনি গাঁয়ের বুড়া রায়। কবি অবশ্য তখনো স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়ে—'কোথা আছি, কিবা করি, কিছু নাই মনে।' ওদিকে ব্রাহ্মণ

বারমতি লিখিতে বলেন বার বার।

তারপর তিনি অন্তর্হিত হলেন, আবার পথে দেখা দিলেন। কিন্তু বিকল রামকান্ত ঘরে ফিরে অবশ হয়ে পড়লেন, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, স্নানাহারও করতে চান না। ঠাকুরই আবার শিয়রে এসে বসলেন—কি করবেন, গরজ যে তাঁর,—রামকান্তকে তিনি উঠতে বললেন, স্নানাহার করতে বললেন, বোঝালেন গান লিখিয়ে রামকান্তের কীর্তি তিনি দেশ-দেশান্তরে খ্যাত করবেন। পরের দিন থেকে রামকান্ত লিখতে বসলেন, সাত দিনে একশ পাতা লিখলেন। তারপরে আর কলম চলে না, পুঁথি তাই তখন অসমাপ্ত রইল। পূজার পরে বিজয়া দশমীর রাত্রিতে আবার বুড়া রায় তাই দেখা দিলেন;—বুড়া রায়ের জয় বলে আবার পুঁথি আরম্ভ করতে আদেশ দিলেন। ভরসা পেয়ে কবিও আবার লিখতে বসলেন, এবং

বারমতি সাঙ্গ হল্য বাসট্টি দিবসে।

রূপরাম বা অন্যান্য কবির তুলনায় রামকান্তের আত্মকাহিনী ঘটনাংশে বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু তা চিত্তাকর্ষক বাস্তবতায় ও কবির মানসিক অবস্থার বর্ণনায়। আসল কাব্য ধর্মমঙ্গলে সে গুণ তত স্পষ্ট নয়।

এসব কবি ছাড়াও রামচন্দ্র (বাঁড়ুজ্জে) খ্রীঃ ১৭৩২-৩৩এ ধর্মমঙ্গল লেখেন, তাঁরও আত্মকাহিনী অংশ পাওয়া যায় নি। ভণিতা প্রভৃতি থেকে জানা যায় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের দামোদর তীরের চামোট গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। ধর্মপুরাণও তিনি লিখেছিলেন। সে সময়েরই কবি মন্ত্রভূমির আলিগুঠিয়া গ্রামের চাষী ব্রাহ্মণ প্রভুরাম মুখুজ্জে ও শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র'ও ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন।

ধর্মের গীত ও ধর্মপুরাণ—লাউসেনের আখ্যান ছাড়াও ধর্মের গীত, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে নানা আখ্যান গড়ে ওঠে, তা আমরা জানি (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। এসবকে সাধারণ ভাবে 'ধর্মপুরাণ' বলা হয়। এসব কাহিনীতেই সৃষ্টি পত্তন (শিবায়নের) শিবের চাষ, সদা ডোমের ও রামাই পণ্ডিতের কাহিনী, 'ঘরভাঙা', ও হরিশচন্দ্র লুইধর আখ্যায়িকার সঙ্গে মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী ও গঙ্গার উপাখ্যানও স্থান পেয়েছে। বাঙলা দেশের মাটিতে যে-সব কাহিনী-আখ্যায়িকার জন্ম ধর্মের নামে সে সবকে সহজে গাঁথা যায়, মূল যোগসূত্রটা যুগিয়েছেন ধর্মনিরঞ্জন ও আদ্যা দেবী। আদ্যা দেবীর আখ্যাই কেতকা, এবং কখনো তিনি শিবের পত্নী চণ্ডী, কখনো বা কেতকা শিবের কন্যা এবং চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী (ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাসে পৃঃ ১৩৮-এ সম্বন্ধ-নির্ণয় দ্রষ্টব্য)। তাই ধর্মের গীতের মধ্যে ধর্মপুরাণও পড়ে, মীননাথ গোরক্ষনাথের কথাও মিলে, আর ধর্ম-নিরঞ্জনের নানা ছড়া ও গীতও পাওয়া যায়।

ধর্মপুরাণ বা অনিল পুরাণের প্রধান লেখক অষ্টাদশ শতকের দুজন; সহদেব চক্রবর্তী ও "রামাই পণ্ডিত" (ও নামে হয়তো আসলে লেখক রামাই পণ্ডিতের দোহাইতে পুঁথি চালাবার চেষ্টা করেছেন)।

সহদেব চক্রবর্তী—সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণ'—যতটা স্থির হয়েছে—মনে হয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, বা তৃতীয় পাদে রচিত। 'ধর্মমঙ্গলে'র কবিদের মতো। তিনি আত্মকাহিনী লেখেন নি, তবে পরিচয় দিয়েছেন—সেদিনে কুল-পরিচয় না দিলে কারো চলত না। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ, নিবাস হুগলি জেলার বালিগড়ের রাধানগর। তিনি শুধু ধর্মঠাকুরের আদেশ পান নি, গ্রন্থ লেখার জন্য কালু রায়ও তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন—বোঝা যাচ্ছে একেবারে আহেলি দেবতারাও ধর্মের এলাকায় আসতে শুরু করেছিলেন। পদ্য রচনায় একটা দক্ষতা সহদেব চক্রবর্তীর ছিল—কাহিনী প্রভৃতি অবশ্য ধরাবাঁধা।

"রামাই পণ্ডিত"—'রামাই পণ্ডিতে'র নামীয় 'দ্বিজ' লক্ষ্মণের (?) 'অনিল পুরাণ'ই একালে 'শূন্য পুরাণ' নামে বাঙলায় সুপরিচিত। এর অন্তর্ভুক্ত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' প্রভৃতি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (কবি হয়তো জাজপুরেরই লোক)। কিন্তু এ পুঁথিতে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর

কথাও আছে। ধর্মের গীতের সঙ্গে সে সবের সম্পর্ক থাকলেও মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী স্বতন্ত্র উল্লেখের যোগ্য।

শিবায়ন ঃ ধর্মের গীতের অন্তর্ভুক্ত হলেও শিবায়ন স্বতন্ত্রভাবেও রচিত হয়। তার মধ্যে রামেশ্বরের শিবায়নই শ্রেষ্ঠ, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে (১৭১০-১১) রচিত হলেও তা রুচিতে, নীতিতে, এবং কাব্যগুণে সপ্তদশ শতকেরই উপযোগী,—সে যুগের সাহিত্য মধ্যে তা তাই পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য রামেশ্বরের কাব্যে যুগের উপযোগী অলঙ্কারপ্রিয়তা ও অনুপ্রাসের ঝোঁকও বেশ আছে। কিন্তু তবু তা স্বচ্ছ। বিষয়বস্তুতেও মাঝে-মাঝে আদিরস আছে—যেমন থাকবার, কিন্তু তা কৃত্রিমতায় রসানো নয়। রামেশ্বরের দাবী সত্যই

চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

এ কাব্যে বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংসারের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়—হরপার্বতীকে অবলম্বন করে তা রচিত। তা থেকে বুঝতে পারি রাজসভায় 'নবাবী আমল' যত কৃত্রিমতা জমাচ্ছে, সমাজের অন্য স্তরে তা ততটা স্পর্শ করেনি—অন্ততঃ খ্রীঃ ১৭১০-১১তে দক্ষিণ রাঢ়ের জীবন-যাত্রায় তা নেই।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য—এসব মঙ্গলকাব্য ছাড়া নূতন দেবদেবীদের নিয়েও অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্য জাতীয় পুঁথি প্রণীত হয়;—তা নানা পৌরাণিক বা স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য। সে সবের কিছু কিছু তখনো ব্রতকথার স্তর ছাড়িয়ে ওঠেনি। পুঁথির মধ্যে পাই সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, লক্ষীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল প্রভৃতি। আবার, কিছু কিছু দেবদেবী-মাহাত্ম্য পাচালী জাতীয় নূতন ধরণের কাব্যে রূপ নিয়েছে। যোড়শ সপ্তদশ শতকেও এসব কোনো কোনো দেবদেবী এ সব রচনায় গৃহীত হয়েছিলেন। দেবদেবীর পাঁচালীর মধ্যে অষ্টাদশ শতকে মিলে সুবচনীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি। অন্য প্রয়োজনে না হলে এসব পড়া এখন বৃথা।

মঙ্গলকাব্য জাতীয় এরূপ রচনার মধ্যে উলা গ্রামের দুর্গাদাস মুখুজ্জের 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' উল্লেখযোগ্য,—রাজনারায়ণ বসু পর্যন্ত ছেলেবেলায় এ কাব্যের পালাগান শুনেছেন। এটি 'অষ্টমঙ্গলা' পাচালী কাব্য। গঙ্গাস্নানাগত বাঙালদের নিয়ে কবির রসিকতার নতুনত্ব না থাকলেও তা লক্ষণীয়—

শ্রীচৈতন্যের যুগ থেকে একেবারে দীনবন্ধু-অমৃতলালবসু পর্যন্ত এই 'ক্যালি-ডোনিয়নরা' গৌড়ীয় রসিকতার উপাদান যুগিয়েছে। তবে বিংশ শতকে তারা যুগিয়েছে কবি, মোহিতলালের মতো বাঙালীত্ব-বাদীদের ক্রোধও। কারণ বাঙালী জাতীয় জীবনে শিক্ষায় সাহসে আজ 'বাঙালরাই' সবল বাঙালী, আর সাহিত্যেও আজ তারা নগণ্য নেই। কিন্তু বোঝবার মতো কথা এই—বাঙালী জাতীয়-চেতনা এভাবেও দুর্বল থেকে গিয়েছে।

পাঁচালী হিসাবে অবশ্য 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র আলোচ্য, কারণ, তা বাঙ্‌লা দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং এসময়কার একটি বিশিষ্ট সামাজিক বিবর্তনের স্বাক্ষর।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে আলোচ্য, যদিও তা 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্ভুক্ত। নবাবী আমলের বিশেষ একটি দিকের প্রতিলিপি মিলে এই কাব্যেই।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'কে নামে ছাড়া মঙ্গলকাব্য বলা অসম্ভব। কারণ যদিও তা পালা করে গাওয়া হয়েছিল, আসলে তা পালাগান নয়, পূজা-পার্বণে তা গাওয়া হত না ; রাজসভায় রসিকদের উপভোগের জন্যই তা রচিত, তার সঙ্গে পূজা-অর্চনার কোনো মূল সম্পর্ক ছিল না।

পৌরাণিক অনুবাদ-শাখা

পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের মতো রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতির রচনাও পুরাতনের অনুবৃত্তি ; তথাপি তার একটা নিজস্ব মর্যাদা আছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরামই অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ-মহাভারতের সর্বগ্রাহ্য কবি। কিন্তু বিশেষ করে কৃত্তিবাসের রামায়ণে নূতন সংযোজিত হতে লাগল নানা বাঙালী উপাখ্যান, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা কৃত্তিবাসের নামেই চলে। কাশীরামের নামে এরূপ সংযোজন বেশি হয় নি, ভাষার পরিবর্তনই হয়েছে। তা ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান-রচয়িতারা অসংখ্য। কাজেই, বিশেষ উল্লেখযোগ্য রামায়ণ-কার বা মহাভারত-কার, কিংবা সংযোজন-রচয়িতার কথা জানাই যথেষ্ট।

রামায়ণ

রায়বার : কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত জিনিসের মধ্যে একটি 'অঙ্গদ রায়বার', অন্যটি 'তরণীসেন বধ'। রায়বার অষ্টাদশ শতকের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি,—মোটেই অনুবাদ নয়, তা উদ্ভাবনা। কথাটির মূল অর্থ রাজবার, রাজস্তুতি,—

এই শতাব্দীতে রায়বার বুঝাত রাজসভার ইতর উত্তর-প্রত্যুত্তর, রাজাদের শূন্য ঘটা সম্বন্ধে অবজ্ঞা। ছন্দ সাধারণত লাচাড়ি। রাজা ও রাজসভার মর্যাদা ও শালীনতা বোধ আর নেই, তা বোঝা যায়। রায়বারের অধিকাংশ রচয়িতা মল্লভূমির। প্রথম একজন রচয়িতা ফকিররাম 'কবিরাজ' বা 'কবিভূষণ', ইনি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও লিখেছিলেন খ্রীঃ ১৭০১-০২তে। শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' মল্লভূমির কবি, ইনি সেই 'কৃষ্ণমঙ্গলের' ও ভারত পাঁচালীর কবি, তাঁরই 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে চলে। কবিচন্দ্রের নামেও 'অঙ্গদ রায়বার' আছে (বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৫২৪)। আরও ছয়-সাত জন লেখকের রায়বারও পাওয়া যায়। স্থূল হলেও এ গালাগালি পরবর্তী কালের কবিদের খেউড়-তর্জার একটা জ্ঞাতি, আসরে তেমনি তা মুখরোচক হয়ে উঠেছিল।

তরণীসেনের যুদ্ধ : বাঙালীর ভক্তিধর্মের মাত্রাজ্ঞানহীন বাড়াবাড়িতে সৃষ্টি হয় তরণীসেনের উপাখ্যান। বিভীষণের পুত্র তরণীসেন রামভক্ত যুবক, দুর্জয় বীর, তিনি যুদ্ধে এলেন রামের হাতে মরে স্বর্গে যাবেন বলে। অনেক চেষ্টায় তাঁর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তখন রণক্ষেত্রে তাঁর কাটামুণ্ড 'রাম' নাম জপ করতে লাগল। কাটামুণ্ডের এই শক্তি বাঙালী জন-সাধারণের সহজ-গ্রাহ্য একটি ঐতিহ্য হয়ে ওঠে (দক্ষিণরায়েরও শুধু মুণ্ডই দেখা যায়,—কালু খাঁ গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে দেহচ্যুত হলেও তা প্রাণহীন হয় নি)। তরণীসেন-বধের কথা পড়ে না কাঁদে এমন বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ নেই। এই রায়বার ও ভক্তির মাত্রাহীনতা, ভাঁড়ামি ও এই ভাবালুতা,—দুইটিই বাঙালী বৈশিষ্ট্য। রামায়ণের এই কাহিনী দু'টি তাই বাঙালীর উদ্ভাবনা হিসাবে মনে রাখবার মতো। অবশ্য এমনি আর-একটি মাত্রাজ্ঞানহীন কাহিনী হচ্ছে মহাভারতের 'দাতাকর্ণে'র কাহিনী। তাও বাঙালীর উদ্ভাবনা—হরিশচন্দ্র-রোহিতাশ্ব কাহিনীর তা বাঙালী সংস্করণ। এ বিষয়েও রচনার তখন অভাব ছিল।

তরণীসেনের উপাখ্যানের প্রধান এক রচয়িতা হলেন দ্বিজ দয়ারাম (দ্রঃ— বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৫৪৯)।

মল্লভূমির শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' ও দ্বিজ সীতাসুত (গ্রন্থের 'বাল্মীকি-পুরাণ') উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণদাস পণ্ডিত (সংক্ষিপ্ত শ্রীরাম পাঁচালী), চণ্ডীমঙ্গলের কবি রামানন্দ যতি এবং কোচবিহারের জন-ছয়-সাত রামায়ণ-কবিদের ছেড়ে দিতে পারি, দু'জন অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতা কিন্তু স্মরণীয়।

রামানন্দ ঘোষ: রামানন্দ ঘোষের 'রামায়ণ' কাব্য (খ্রীঃ ১৭৮০ ?) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচয় এখনো অনিশ্চিত। কাব্য মতে তিনি কালিকাতন্ত্রে আস্থাশীল 'বুদ্ধাবতার'—

সর্ব শক্তিমত্ত আর ইচ্ছা কালিকার
কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ-অবতার।

অষ্টাদশ শতকে এই কথা অদ্ভুত শোনায়। কারণ, বুদ্ধদেব অবতার-মধ্যে গণ্য হলেও জয়দেবের পরে তাঁর মাহাত্ম্য আর বাঙ্‌লা কাব্যে শুনি না। বাঙ্‌লার পুরনো তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের হয়তো এই স্মৃতি শেষ। 'বুদ্ধাবতারে'র আবির্ভাবের কারণ—

ম্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে
দাসীরূপা হইল লক্ষ্মী নীচ জাতি-ঘরে।

তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা (আদিপর্ব)

যখন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব
একছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব।

কোথা হতে হঠাৎ দেখা দিল এ সঙ্কল্প? মহারাষ্ট্র ও বর্গীদের নিয়ে দুরাশা পোষণ সম্ভব নয়, কৃষ্ণচন্দ্র-জগৎশেঠদের নিয়ে তা আরও অসম্ভব। এ কাব্য খ্রীঃ ১৭৬৫র পরেকার বলেই অনুমিত হয়। তাহলে এ উক্তি একটা দুঃসাহসী মহৎ সংকল্প। রামানন্দ যৌবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, হয়তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটা পূর্বাভাস বা প্রতিধ্বনি তাঁর এ কাব্য। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক নয়, ধর্মের মোহভঙ্গও এই সন্ন্যাসী কবির হয়েছিল। তাঁর পূর্বে সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য এমন করে কেউ দিতে সাহসী হন নি।

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর
না হৈল (বস্তু) চর্ম চক্ষের গোচর।
ধনীতে বাড়য়ে ধন জলে বাড়ে জল
নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল।...
দারা ছাড়ি পাপ ভরা ভরিনু অপার
অস্থিচর্মসার কইল অভিশাপ তার।
দারা সুত সুতা/আর বন্ধু কেহ নাই
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে খাই।

নিশ্চয়ই এ এক প্রবল ব্যক্তিত্ববান্ অস্থির কালের অস্থিরচিত্ত মানুষের খেদোক্তি। মধ্যযুগের সাহিত্যে এরূপ স্বীকারোক্তি অভাবনীয় ছিল। তদপেক্ষাও নূতন রামানন্দ ঘোষের এই শেষদিককার স্বীকৃতি :

দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল
বৃথা কষ্ট সেবি কাল কাটা নহে ভাল।
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ
নিজ কষ্ট দায় আর লোক-মধ্যে লাজ।

এ যেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কথা।

সেদিনের সমাজে ধর্মে আস্থা কমে এসেছে তা দেখতে পাব, কিন্তু এমন স্পষ্ট, সুদৃঢ় ঘোষণা আর দ্বিতীয়টি কোথায়? এই জন্যই "তাহার কাব্যটি পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে একক"। তথাপি ট্রাজিডিতেই তাঁর কাব্যের সমাপ্তি হল, যেহেতু এই বাস্তবোধ সত্ত্বেও কবি তাঁর মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে পারেন নি। বুদ্ধির মুক্তি তাঁর ঘটেছে, কিন্তু মুক্তির বুদ্ধি তাঁর জাগ্রত হয় নি। কবিত্বের জন্য ততটা নয়, কিন্তু এক নূতন চেতনার প্রতিভূ হিসাবে রামানন্দ ঘোষ বাঙলা সাহিত্যে সত্যই একক, ভবিষ্যতের আভাস।

জগৎরাম : জগৎরাম রায় (বাঁড়ুজ্জে) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগে 'অদ্ভুত রামায়ণ' সম্পূর্ণ করেন; 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'ও তাঁদের দুজনার রচনা। রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দুর্গাপূজা—দুর্গাপঞ্চরাত্রির বিষয়; পঞ্চমী হতে দশমী পর্যন্ত পাঁচ পালা, শেষ দুই পালাই পুত্রের রচনা। পঞ্চকোটের অভ্যন্তরে রাণীগঞ্জের নিকটে ভুলুই গ্রামে তাঁদের নিবাস ছিল। এ কাব্য নয় কাণ্ডে বিভক্ত—লঙ্কাকাণ্ডের পরে পাই পুষ্করকাণ্ড, রামবাস এবং উত্তরাকাণ্ড, রচনা কাল খ্রীঃ ১৭৭১।

জগৎরামের শেষ ও নিজস্ব রচনা হল 'আত্মবোধ' নামে আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য (খ্রীঃ ১৭৭৭-৭৮)। তাও রাম-মাহাত্ম্যেরই কাব্য, যদিও রামায়ণের অনুবাদ নয়। বারো 'উল্লাসে' রচিত এই গ্রন্থে মনের সুমতি কুমতি দুই পত্নীর কলহাদির ভেতর দিয়ে রাম-প্রাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ও সাধন তত্ত্বোপলব্ধির কথা বিবৃত হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞান, নিন্দা, ধর্মানুরাগ সব মিলিয়ে 'আত্মবোধ' এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। কবি বৈষ্ণব রাগানুগা পদ্ধতির সাধক, তবে জগৎরাম কৃষ্ণের স্থলে রামের ভক্ত। কিন্তু দেশকালপাত্র, পঞ্চকোট, নিজ গ্রাম, পরিবার,

পরিজন, নিজগৃহ, সব কিছুতেই তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেখি। জগৎরাম ঠিক যেন রামানন্দ ঘোষের বিপরীত দিক থেকে সেই একই মন নিয়ে জীবন দেখছেন। দৃষ্টিক্ষেত্রটি রামায়ৎ বৈষ্ণবের হলেও দৃষ্টি জীবন-রসিক মানুষের। 'আত্মবোধ' রামানন্দ ঘোষের মত সমাজ-বিপ্লবী স্বষ্টি উদ্যোগী পুরুষের কাব্য নয়। যেমন, পঞ্চকোট সম্বন্ধে জগৎরাম বলছেন :

মোর প্রতি এই স্থান মহাতীর্থ স্থান
এই স্থানে জন্ম লভি দেখিনু ভুবন।···
এই দেহ পাইলাম কত পুণ্য ফলে
এ জিহ্বায় কভু কভু রাম শব্দ বলে।···
এই সর্ব অবয়ব কলেবর খানি
এ দেহ-রূপ মধ্যে রাম-বস্তু চিনি।
দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়
এ দেহ জানে সেই আনন্দে ভাসয়।

এ অবশ্য একালের বস্তুবাদীর কথা নয়, ভাববাদীদের 'দেহতত্ত্বের' কথা।

এ ধারণাও চৈতন্য-যুগ থেকেই বৈষ্ণবদের স্বীকৃত। কিন্তু অন্য কবিদের লেখায় এইরূপ জীবন-চেতনা দেখা যায় না। জগৎরামের শেষ তত্ত্বও রাগাত্মিকাভক্তি-সম্মত, কিন্তু তথাপি বিশিষ্ট :

মলে মুক্ত হবে তার প্রত্যয় কি হয়
জীয়ন্তেতে মুক্ত বিনা মনে না লাগয়।···
যার জ্বালা মুক্ত হলে মুক্ত বলি তায়
প্রকৃতি আশ্রয় বিনা এ জ্বালা না যায়।
প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বর্তমান
রসরাজ স্ত্রী পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান।

এও মুক্তির বুদ্ধি, কিন্তু বস্তুগত মুক্তির নয়, ভাবগত মুক্তির। মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যে এ মুক্তি পরিকল্পিত : লীলাময়ের লীলা আস্বাদনের মধ্য দিয়েই জীবনে এ মুক্তি আয়ত্ত হয়। জগৎরামের মনে রামানন্দের মত তাই 'ম্লেচ্ছ-ভোগ্য বসুন্ধরা'র জন্য কোন জ্বালা নেই।—জীবন-রসের আস্বাদনে তিনি পরিতৃপ্ত। কবিকর্মেও জগৎরাম অনিপুণ নন,—ভারতচন্দ্রেরই যুগের কবি তিনি,—পাণ্ডিত্যও তাঁর যথেষ্ট (দ্রষ্টব্য : বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৫৮৮-৫৯৪)।

মহাভারত

অষ্টাদশ শতকের মহাভারত-কারদের সংখ্যাও কম নয়। ছোট বড় বহু আখ্যানের বহু রচয়িতা আছেন। কিন্তু এমন কোনো বৈশিষ্ট্য কারও লক্ষিত হয়নি যাতে তাঁদের নাম এখনো স্মরণ রাখা প্রয়োজন হবে।

শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্রে'র মতো মল্লভূমির কবিরা আছেন; কোচবিহারের মহাভারতকারাও লেখা থামান নি; শ্রীহট্টেও ভাগবতের মতো মহাভারতের আখ্যান নিয়ে কাব্য-রচয়িতা অনেক—যেমন, গোপীনাথ দত্ত, সুবুদ্ধি রায়। পূর্ববঙ্গে ষষ্ঠীবর-গঙ্গাদাস (সেন) পিতাপুত্রের লেখা মহাভারতের একাধিক পর্ব পাওয়া যায়;—তাঁরা মনসামঙ্গলের পুঁথিও লিখেছেন, লবকুশের যুদ্ধও লিখেছেন। তাঁদের পরিচয় ও জাতি অবশ্য সুনিশ্চিত নয়। উৎকল ব্রাহ্মণ সারল কবির 'ভারত পাঁচালী' দক্ষিণ রাঢ় ও উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। 'নলদময়ন্তী'র আখ্যান নৈষধের প্রভাবে লিখেছেন কেউ কেউ, আর 'শকুন্তলা'র উপাখ্যানও স্বতন্ত্রভাবে লিখেছেন অন্ততঃ একজন—রাজেন্দ্র দাস।

পৌরাণিক বিষয়ের অনুবাদ—ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুবাদের মতোই পৌরাণিক অন্য গ্রন্থ ও আখ্যানসমূহের অনুবাদও পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। তবে অনুবাদে বৈষ্ণবদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না। এসব পৌরাণিক ধারার অনুবাদের প্রধান কেন্দ্র বরাবরই কোচবিহারের রাজসভা। কোচ রাজাদের নামেও অনুবাদ দেখা যায়। প্রহ্লাদ-চরিত্র, উষাহরণ, তুলসী চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র পালা প্রভৃতি কোনো কাহিনীরই অনুবাদ তখন বাদ যায় নি। উনবিংশ শতকেও এই সব রামায়ণ, মহাভারত পুরোমাত্রায় লেখা চলেছে (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৮৮৭-৯০৪)।

নবম পরিচ্ছেদ

নাথ-যোগীদের কাহিনী

নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের কথা বাঙলা সাহিত্যের জন্মকথার সঙ্গে জড়িত, তা চর্যাপদের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি। মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ), জালন্ধরি পাদ (হাড়ি পা), গোরক্ষনাথ, (গোরখনাথ, গোর্খনাথ), কানু পা (কাহ্নপাদ)—এঁরা কে, কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কই বা কি ছিল, সে বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান পণ্ডিতেরা এখনো একমত নন। একদিকে এঁদের সম্প্রদায়ের ধারা বহন করছে কান-কাটা যোগীরা ও নানা অবধূত সম্প্রদায় তাদের বেশভূষায়, সাধনায়, অন্যদিকে এঁদের স্মৃতি ও কাহিনী জাগিয়ে রাখছে বাঙলাদেশে উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের যোগীজাতি। তর্ক ও সমস্যা অনেক আছে, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—সেই যোগী ও সিদ্ধাদের নানা কাহিনী বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ থেকেই চলে আসছে—প্রাক্‌-মুসলমান যুগ থেকে একেবারে ব্রিটিশ যুগেও তা প্রচলিত ছিল, 'ধর্মপুরাণে'ও তাই তা পাওয়া যায়। এমন কি, এসব কাহিনী বাঙলা ছেড়ে উত্তরভারতের জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তারলাভ করেছিল, কিন্তু সে দেশেও তার বাঙালী-জন্ম অস্বীকার হয় নি, কাহিনী থেকে তা ধরা যায়। বাঙলায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও এ কাহিনী সমাদৃত হয়েছে, তথাপি সে কাহিনীর মধ্যে মুসলমান প্রাধান্যের ছাপ নেই। অবশ্য মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমান পীরদের কাহিনীতে মোছন্দর বা মোছর পীরে পরিণত হয়েছেন (পরে দ্রষ্টব্য)। যা'ই হোক, বাঙলার হলেও গোপীচন্দ্রের গান সর্বভারতীয় মর্যাদালাভ করেছে।

সাধারণভাবে এসব নাথ-যোগীদের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে, একটি হল নিছক সিদ্ধাদের কাহিনী, মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরখনাথের কাহিনী। এ কাহিনীর মূল কথাটি হল শিষ্য গোরখনাথের দ্বারা কামিনী-মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথের উদ্ধার। এ কাহিনীর সাধারণ নাম তাই 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন'। যোগীদের পরম গুহ্য সাধনা হল—'বিন্দু-ধারণ', ঊর্ধ্বরেতা হয়ে ষট্‌চক্র-ভেদ করা, ইত্যাদি। অতএব, স্ত্রীসংসর্গ বিষয়ে যোগীদের সর্বাধিক বিরোধিতা

অর্থাৎ বর্ণচোরা লোক। দ্বিতীয় কাহিনীটির মূল হল রাজা গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দ চন্দ্রের) সন্ন্যাস; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজমাতা ময়নামতী ও তাঁর গুরু জলন্ধরি পাদের (হাড়ি পা'র) যোগবিভূতির কথা। জন-সমাজের নিকট এটির আকর্ষণ রাজপুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা ব'লে। এই দু' কাহিনী অবলম্বন করেই সিদ্ধা ও যোগীদের অলৌকিক শক্তির গল্প পল্লবিত হয়ে উঠেছে, গায়কের মন অসম্ভবের রাজ্যে বিচরণের সুযোগ লাভ করেছে, সাধারণ মানুষের স্থূল বিস্ময়বোধ ও কল্পনা এসব কাহিনীতে একটা সহজ পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

লক্ষ্য করা যায়—এসব সিদ্ধ যোগীদের যোগশক্তি, পীর ফকিরের কেরামতি বা ঐন্দ্রজালিক-সুলভ কীর্তিকলাপের কাহিনীগুলোও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটা ধরাবাঁধা মামুলী রূপ লাভ করেছে—এখনকার যোগী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, গুরুদেব নামেও আমরা তারই পুনরুদ্ভাবনা দেখতে পাই। সাধকদের অপৌরুষের জন্ম থেকে স্ত্রীকে মাতৃ-সম্ভাষণ পর্যন্ত অনেক জিনিসই সেই যোগসিদ্ধাদের লৌকিক ও স্থূল ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এ ঐতিহ্য যে ভাবেই উদ্ভূত হোক, চলে আসছে ছড়ায় গানে, এর সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যোগীদের কথার ও গল্পের একটা সম্পর্ক আছে। মুসলমান ফকির-দরবেশদের কেরামতির গল্পেও তা পুষ্ট হয়েছে। বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যের, বিশেষ করে ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে এসব অলৌকিক কাহিনীর সম্পর্ক স্পষ্টতই স্বীকৃত। কিন্তু সিদ্ধ যোগীদের কাহিনী লিখিতাকারে বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে অনেক বিলম্বে।

'গোরক্ষ-বিজয়ের' পুঁথি পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকে এসে—বাঙ্‌লায় সহদেব চক্রবর্তীর ও 'রামাই পণ্ডিতে'র ধর্মপুরাণে বা 'অনিল পুরাণে'। স্বতন্ত্রাকারে উত্তর বঙ্গের ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের গোরক্ষ-বিজয় সম্বন্ধীয় পুঁথি শেষ দিকে পাওয়া যায়—ফয়জুল্লা (আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত 'গোরক্ষ-বিজয়ের' কবি), শ্যামাদাস সেন (নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'মীনকেতনের' কবি), ভীমসেন রায় বা ভীম দাস (বিশ্বভারতীর পুঁথির কবি)—এ ক'জনা সে কাহিনীর কবি হিসাবে গণনীয়। এঁদের কাব্যে ভাষায় এবং ভণিতায় এত মিল যে সত্য-সত্যই এঁদের ক'জন কবি ক'জন গায়েন তা নিয়ে তর্ক আছে (দ্র.—ডঃ সেন, বাঃ সাঃ ইতিহাস ও ডঃ শহীদুল্লাহ্—সাঃ পঃ পত্রিকা, ৬০।৩), এবং থাকবে।

গোরক্ষ-বিজয়ঃ—গোরক্ষ-বিজয়ের কাব্য অপেক্ষা কাহিনীটিই উল্লেখ-

যোগ্য। মঙ্গলকাব্যের মতো সেই সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়েই এ কাহিনীরও আরম্ভ! আদিদেব ও আদ্যাদেবীর পরেই এ কাহিনীতে জন্মান চার সিদ্ধা, জন্মমাত্রেই তাঁরা লেগে যান যোগাভ্যাসে। মীননাথের অনুগত হলেন গোরক্ষ; আর জলন্ধরির (হাড়ি পা'র) অনুগত হলেন কানু পা'। তারপর সিদ্ধাদের কেরামতি। শিবের মুখ থেকে গৌরী মহাজ্ঞান শুনছিলেন, কিন্তু গৌরী পড়লেন ঘুমিয়ে (যেমন পড়েছিলেন অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রা—মহাভারতে); আর মৎস্যরূপে (বা মাছের পেটে থেকে) ফাঁকি দিয়ে 'মহাজ্ঞান' শুনে নিলেন মীননাথ। সে ফাঁকির কথা বুঝে শিব তাঁকে অভিশাপ দিলেন—মীননাথ এই মহাজ্ঞান এক সময়ে বিস্মৃত হবেন। কি করে তা হবে? সিদ্ধারা যোগী, তাঁরা স্ত্রীসংসর্গ করবেন না। তাঁদের পরীক্ষা করতে গৌরী নামলেন আসরে; মোহিনীরূপে গৌরী অন্ন পরিবেশন করতে গেলেন। আর যেমন চিরদিনই এই মহর্ষি তপস্বীদের নিয়ম তেমনিই হল সিদ্ধাদের অবস্থা। স্ত্রীদর্শনমাত্র তিন সিদ্ধাই ধরা পড়লেন মোহজালে। কেবল অটল রইলেন গোরক্ষনাথ (ইউরোপীয় নাইটদের মধ্যে পার্সিভালের মতো নয় কিন্তু);—তাঁর মনে গৌরীকে দেখে এল শিশুভাব। যেমন যার ভাবনা তেমনি হল তার পরিণাম। গুরু মীননাথ—কামভাবের জন্য তাই কদলী নগরে গিয়ে রমণী-সমাজে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে লাগলেন বিলাসে। হাড়ি পা' (জলন্ধরি পাদ) পটিকায় (পট্টিকের?) গিয়ে রাণী ময়নামতীর পুরীতে লাগলেন হাড়ির কাজে—মোহবশে তাই তিনি কামনা করেছিলেন। সেখানে ময়নামতীর ছেলে রাজা গোপীচাঁদ হাড়ি পা'কে মাটির তলায় আবদ্ধ করলেন। এদিকে গৌরীও রেহাই পেলেন না। গোরক্ষের নিকটে হেরে, তাঁকে ফাঁদে ফেলতে না পেরে তিনি নিজেই পড়লেন তাঁর পেটে মাছিরূপে বাঁধা। পরে গোরক্ষ তাঁকে রাক্ষসী করে রাখলেন। তখন শিব বেরুলেন তাঁর উদ্ধারে। গোরক্ষনাথ শিবঠাকুরকে বেশ দু'কথা শোনালেন—নিজের স্ত্রীকে সাম্‌লাতে পার না, বেশ দেবতা তো হে তুমি! ভাঙ ধুতরা নিয়েই আছ! যাই হোক: দেবীকে মুক্তি দিলেন গোরক্ষ। এদিকে শিবের বরে এক তপস্বিনী রাজকন্যা গোরক্ষের পত্নী হলেন। হলে হবে কি, গোরক্ষ ছ'মাসের শিশু হয়ে শিশুভাবে পত্নীর স্তন্যপান করতে চাইলেন! অবশ্য পরে গোরক্ষের বরে রাজকন্যা তাঁর কৌপীন-ধোয়া জলপান করেই পুত্রলাভ করলেন। তারপরে নিজেও গোরক্ষ বেরুলেন গুরুর উদ্ধারে—কানু পা'ও চললেন তাঁর গুরু হাড়ি পা'র উদ্ধারে। কদলীর দেশে গোরক্ষ

মঙ্গলা-কমলা দু'রাণীর সমস্ত বাধা ঠেলে নটী বেশে গিয়ে রাজদ্বারে দাঁড়ালেন—দ্বার থেকে মৃদঙ্গে বোল তুললেন গোরক্ষ :—কাহিনীতে এইখানেই এ গান জমে—বোল শুনে মীননাথ চকিত হলেন। তারপর শিষ্য আরম্ভ করল নটীবেশে নৃত্যগীত। মাদলের বোলে তিনি মনে করিয়ে দিলেন গুরুকে পূর্বস্মৃতি, নাচগানে তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন 'মহাজ্ঞান'। রাণীরাও পুত্র কোলে নিয়ে ঘিরে ধরে মীননাথকে,—মোহের বন্ধ কেটেও কাটে না যেন। কিন্তু শিষ্য গুরুকে উদ্ধার করলেন, মীননাথ চেতনা লাভ করলেন ;—কাহিনীর নাম তাই 'মীনচেতন'।

গোপীচন্দ্রের গান :—গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্র) কাহিনী সমস্ত উত্তর ভারতেই প্রচলিত। স্বভাবতঃ সর্বত্রই তাতে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে ; যেমন, গোপীচন্দ্র হয়েছেন কোথাও রাজা ভর্তৃহরির ভাগিনেয়, কোথাও বা উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য বা ধারা নগরের রাজা ভোজের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু মোটের উপর সমস্ত কাহিনী একটা বিষয়ে প্রায় একমত। গোপীচন্দ্র বাঙলার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং প্রায় কাহিনীতেই গোপীচন্দ্র বাঙলার রাজা। (এসব নানা কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ 'রাজা গোপীচন্দ্রের কাহিনী'—প্রোসিডিংস অ্যাণ্ড ট্রান্জাক্শান্স অব্ দি সিক্সথ্ ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল্ কন্ফারেন্স্, ১৯৩০, এবং ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস)। ঐতিহাসিকেরা চিন্তা করছেন—কোথায় ছিল এই গোপীচন্দ্রের রাজ্য—পট্টিকেরায় (লালমাই,—ময়নামতী পাহাড়ের মধ্যে ত্রিপুরা জেলায়), না, রঙ্গপুরে, কোথায় ? তিনি কি পালগোষ্ঠীর কোন রাজা (গ্রিয়ার্সন) না, রাজেন্দ্র-চোলের অনুশাসনের উল্লিখিত গোবিন্দচন্দ্র (দীনেশ সেন), ইত্যাদি। বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে সেই প্রশ্ন তত গুরুতর নয়, কিন্তু যে সব বাঙলা ছড়া ও গান এ সম্পর্কে আমরা পেয়েছি তার পরস্পরে কাহিনী-অংশ তুলনা করে বোঝা বেশি প্রয়োজন (দ্রষ্টব্য—লেখকের পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ)। অবশ্য একদিক থেকে সবগুলি কাহিনীই প্রায় একরূপ, এবং আমাদের পক্ষে এখানে কাহিনীর সারাংশ জানাই যথেষ্ট ; প্রয়োজন বরং স্থির করা—কোন্ কাহিনী কখনকার রচনা (দ্রঃ, শহীদুল্লাহ্—সাঃ পঃ পত্রিকা, ৬০।৩) এবং তার সাহিত্যিক গুণাগুণ কি।

গোপীচন্দ্র কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মালিক মহম্মদ জায়সীর

'পত্নযাবত্তে'। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম বাঙ্‌লা গ্রন্থ বোধহয় নেপালে রচিত সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা নাটক 'গোপীচন্দ্র নাটক'। পুঁথি অবশ্য উনবিংশ শতকের নেওয়ারী লিপিকারের লেখা,—অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা থেকে তার অনুলিপি করে এনেছিলেন। মূলে পাটনের রাজা সিদ্ধেশ্বর সিংহ দেবের রাজ্যকাল (খ্রীঃ ১৬২০-১৬৫৭) উল্লিখিত হয়েছে। বাঙ্‌লা দেশের বাইরের এ নাটকটি ছাড়া গোপীচন্দ্রের গান বাঙ্‌লায় আর যা পাওয়া যায় তা সবই অষ্টাদশ শতকের বা তার পরেকার। সে সবের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় পণ্ডিতবর গ্রিয়ার্সনের উদ্যোগে রঙ্গপুরের একটি সংগ্রহ 'ময়নামতীর গান' (এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা খ্রীঃ ১৮৭৮এ প্রকাশিত), তারপরে প্রকাশিত হয় (শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের সম্পাদনায়) চুঁচুড়া থেকে সংগৃহীত দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। পরে পাওয়া গেল মুঃ গোলাম রসুল খোন্দকার প্রকাশিত সুকুর মামুদের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'; শ্রীযুক্ত নলিণীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান',—এটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার কাহিনী। বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুকুর মামুদ ও ভবানী দাসের পুঁথিও পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছেন (১৯২৪) 'গোপীচন্দ্রের গানে'।

রঙ্গপুরের গানের অনুযায়ী গোপীচন্দ্র কাহিনী সংক্ষেপে হচ্ছে এরূপ: মাণিকচন্দ্র ছিলেন বাঙ্‌লার রাজা। ময়নামতী তাঁর পাঁচ রাণীর এক রাণী; আবাল্য তিনি গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা, থাকতেন স্বামীর থেকে স্বতন্ত্র। রাজার মন্ত্রীদের অত্যাচারে প্রজারা ধর্মঘট করে শিবের শরণ নিল (প্রজা-বিদ্রোহ বা শ্রেণী-সংগ্রাম জিনিসটার এখানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ পাওয়া যায়); তাতে রাজার মৃত্যু হল। ময়নামতী চললেন যমপুরীতে, সেখানে যমদূতদের শাস্তি দিয়ে তিনি (বেহুলার মতোই) স্বামীর প্রাণ উদ্ধার করবেন। কিন্তু শিব তাঁকে নিরস্ত করলেন। ভরসা দিলেন—মাণিকচন্দ্র আর ফিরে আসবে না, কিন্তু ময়নামতী পুত্রলাভ করবেন, আর গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়ি পা'র শিষ্যরূপে সে ছেলে লাভ করবে মহাজ্ঞান। ময়না 'সতী' হতে গেলেন, কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শ করল না। যথাসময়ে পুত্র গোপীচন্দ্র জন্মাল। ক্রমে তার বিয়ে হল অদুনা ও পদুনা এই দু' বোনের সঙ্গে। দুই রাণী ও আরও এক শত রমণী নিয়ে গোপীচন্দ্র রাজ্য করেন মনের সুখে।—এ পর্যন্ত এ পুঁথির

ভূমিকা : আর তা ভবানী দাসে নেই, দুর্লভ মল্লিকেও বিশেষ তা পাওয়া যায় না। এর পরে আরম্ভ হয় আসল কাহিনী। ময়নামতী পুত্রকে বলেন—রাজ্য, রাণী, বিলাস সব ত্যাগ করে গুরু হাড়ি পা'র নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করো। পুত্র অত সহজে তাতে স্বীকৃত হলেন না; বরং সংশয় প্রকাশ করলেন যে, ময়নামতীর সঙ্গে হাড়ি পা'র অবৈধ সম্বন্ধ আছে। এই সন্দেহের জন্যই অবশ্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও গোপীচন্দ্রকে এক বেশ্যার দাস হতে হবে। এদিকে রাণী অদুনা গোপীচন্দ্রকে প্ররোচিত করেছিলেন। আপাততঃ ময়নাকে তাই পরীক্ষা দিতে হল।—যোগীদের যেসব আশ্চর্য শক্তির কথা বলা হয়, সে সব এখানেও দেখি —গরম তৈলে ময়না সিদ্ধ হলেন, মরলেন না; নদীর উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, ডুবলেন না; ইত্যাদি (কোনো কোনো গানে এ পরীক্ষা দিতে হয় হাড়ি পা'কে, ময়নামতীকে নয়)। তখন গোপীচন্দ্র বুঝলেন, যোগই সত্য, ঠিক করলেন হাড়ি পা'র শিষ্যত্ব নেবেন। তা শুনে রাজাকে বাধা দেবার জন্য রাণী অদুনা ব্রাহ্মণদের ঘুষ দিলেন, নাপিতকে হাত করলেন। রাজা যোগীদের ছিন্নকন্থা পরলেন, কানে পরলেন কাঠের কুণ্ডল, হাতে তুলে নিলেন শিঙা। তারপর রাজা গেলেন রাণীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। রাণীদের অনুনয়-বিনয়-বেদনা-ক্রন্দন নিয়ে এখানে আবার কাব্য-কাহিনী জমে। কিছুতেই কিছু যখন হয় না, রাণীরাও চান শেষে যোগিনী হতে। কিন্তু হাড়ি পা'র কামিনী জাতির প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ তীব্র। হাড়ি পা' রাজার জন্য 'যোগচক্র' প্রস্তুত করলেন। গোপীচন্দ্রকে যোগের তত্ত্ব উপদেশ দিলেন—এখানে কবি আবার সেই শ্বাস-প্রশ্বাস, যোগের পদ্ম, ষট্‌চক্র প্রভৃতি বাঁধাধরা গূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করেন। শেষ পর্যন্ত মোহমুক্ত রাজা তাঁর স্ত্রীদের মা বলে সম্বোধন করেন। হতাশ হয়ে রাণীরা আত্মহত্যা করেন। গুরু তখন তাঁদের পুনরুজ্জীবিত করেন আর রাজাকে যোগী করে নিয়ে বের হন। দেশ-দেশান্তরে, কত কি রাজ্য—একবার' নটীর দাস হয়েও রইলেন তাতে রাজা,—তারপর গুরু তাঁকে দিলেন মহাজ্ঞান।—কোন কোন কাহিনীতে প্রবুদ্ধ রাজাকেও আবার রাজ্য করতে অনুমতি দেন গুরু।

এই সংক্ষিপ্তসার কথা থেকে অবশ্য যা এ কাহিনীর স্থূল বা কদর্য অংশ তা বাদ পড়ল, কিন্তু কাহিনীতে তার অভাব নেই। কারণ, মীননাথ জাতীয় নাথ-গুরুদের স্ত্রীবিরাগটা উদ্দাম কামুকতারই উল্টো পিঠ। তাই এই বিকৃত-বৈরাগ্যের কাহিনী ও অবধূত-কাপালিকদের তান্ত্রিক গুহ্-প্রক্রিয়াকে আজার

করে সাধারণের সহজ কামনা ও সহজ সংযম দুইই স্থূল আকারে প্রকাশিত হয়েছে—যেমন সহজিয়া রাগাত্মিকা পদাবলী ও যোগ-সাধনায় পেয়েছে তা সূক্ষ্ম প্রকাশ। কিন্তু উত্তর-ভারতব্যাপী জনতার কাছে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ সেজন্ত হয় নি। আকর্ষণ জন্মে একদিকে প্রধানতঃ যোগীদের সম্বন্ধে—পীর-ফকিরদের সম্বন্ধেও—জনতার শিশুসুলভ ভয়ভক্তি-বিস্ময়ের জন্ত। আর অন্তদিকে এই যোগী-কাহিনীর সঙ্গে এমন একটি চিরদিনের রোমান্টিক-আবেগময় কাহিনীর সংযোগ ঘটাতে;—অর্থাৎ রাজা গোপীচন্দ্র (গৌতম বুদ্ধ কিম্বা শ্রীচৈতন্তের মতোই) রাজ্য, রাজ-পাট, প্রেয়সী রাণী ও যৌবনের ভোগবিলাস সব ছেড়ে বরণ করছেন ত্যাগৈশ্বর্যময় সত্যের পথ, যোগ-সাধনার পথ। রাজপুত্র ত্যাগের পথ গ্রহণ করছেন, এইটা স্বপ্নের মতো সুন্দর কাহিনী জন-সাধারণের কাছে, আর সুকুর মামুদের মতো গ্রাম্য কবিদেরও কল্পনা এই কাব্যাংশটিতেই সচরাচর একটু মুক্তি পেয়েছে; যোগ-শক্তির বর্ণনায় ও যোগ-প্রক্রিয়ার বর্ণনায় জানাতে পেরেছে তারা প্রচলিত যোগ-বিদ্যার সম্বন্ধে তাদের সংস্কারগত বিশ্বাস আর যোগ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাদের ঐতিহ্যগত সাধারণ জ্ঞান।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও কালিকা-মঙ্গল

প্রণয়-কাহিনীর একটা পরিণতি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে। কিন্তু বাঙ্‌লায় কালিকা-মঙ্গলের মধ্যেই এই পালাটিকে হিন্দু কবিরা জুড়ে দিয়েছেন;—সাবিরিদ খাঁ (সপ্তদশ শতাব্দী বা তার পূর্বকার) ছাড়া 'বিদ্যাসুন্দরে'র উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবিও নেই বলে বলা চলে। বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালী সহজেই এই কালিকা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর অন্ত ধারাও অবশ্য ছিল (পর পরিচ্ছেদে তা দ্রষ্টব্য)। প্রণয়-লীলায় বাঙালী কবিরা প্রায় সকলেই নিষ্ঠাবান্‌,—'বৃথা মাংস খান না'। অভ্যাসটা অবশ্য একেবারে নূতন নয়, এই দেবীভক্ত কবিদেরও তা একান্ত বিশেষত্ব নয়,—পূর্ব যুগেও রাধাকৃষ্ণের নামে কবিরা প্রণয়-গাথা নিবেদন করে নিচ্ছিলেন। ভয়ঙ্করী, কালী করালবদনী

শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ প্রণয়-লীলার নায়িকা হবার মতো দেবী নন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুগ-মাহাত্ম্যে কালিকা তাই হয়ে উঠলেন প্রণয়ি-জন-তারিণী, আর প্রণয়-কাহিনীও জারিয়ে নেওয়া হল এই পুরনো রসে। দেবদেবীদেরও ইভোল্যুশন আছে, বরাবরই সে ক্রমবিকাশ চলেছে। কিন্তু কাহিনীটি হল বিদ্যাসুন্দরের, কালিকা দেবীর নয়। কাজেই কালিকা দেবীর ইভোল্যুশনি কুলজী নিয়ে এখানে আর বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন নেই।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল অবশ্য অনেক পিছনে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, "লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচি তার ঠিকানা নেই।"—(শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত সাঃ পঃ প্রকাশিত বলরাম 'কবিশেখর' বিরচিত 'কালিকা-মঙ্গলের' মুখবন্ধ)। শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত : "বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের রাজধানী 'অনহিলপত্তনে'—ইংরেজী ১১শ শতকে।"—এ মতে কাশ্মীরী পণ্ডিত বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর ৫০টি শ্লোকই হল এর মূল। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত বররুচির নামীয় ৫৪টি শ্লোকের 'বিদ্যাসুন্দর' ও ৫৪৭ শ্লোক-সমন্বিত আর একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯২২ ইং সনে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এ কাব্যের পরিচয় ইংরেজি প্রবন্ধে ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্‌সে দিয়েছিলেন), বররুচির সেই সব শ্লোকের সঙ্গে 'চৌরপঞ্চাশতে'র শ্লোকের মিল কতটা,—এবং চালুক্য-নৃপতি বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবন মল্লের (খ্রীঃ ১০৭৮-১১২৬) সভাকবি 'বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিত'-রচয়িতা কাশ্মীরী কবি বিহ্লনই চৌরকবি কিনা,—এসব বিষয় নিয়ে যে তর্ক আছে তা এ প্রসঙ্গে গুরুতর নয় (দ্রঃ—পরিষদ-প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ২য় সংস্করণের ভূমিকা)। মেনে নিতে পারি—ভারতচন্দ্রের পূর্ব থেকেই সংস্কৃতের ৫৪ বা ৫৪৭ শ্লোকের বিদ্যাসুন্দর বাঙলা দেশে প্রচলিত ছিল, এবং সে 'চৌরপঞ্চাশৎ' ও বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অন্ততঃ বাঙলা দেশে একত্রিত বা সম্পর্কিত হয়ে গিয়েছিল ; তার প্রমাণ 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর ও ঐ সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক ভারতচন্দ্রও উদ্ধৃত করেছেন (যেমন, সুন্দর 'মদনাদের' বিষয়ে শ্লোকটি আবৃত্তি করেছেন বিদ্যার কাছে, এবং চৌরকবির শ্লোক পাঠ করেছেন রাজার কাছে)।

কিন্তু শুধু 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর কাহিনী নয়, বাঙলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মধ্যে দুটি বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়—তার মূলও সংস্কৃতে আছে (দ্রষ্টব্য ডঃ সুকুমার সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৮২৪-৮৩২)। তার একটিতে বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষ্য

করে বিদ্বান্ গুরুর সঙ্গে ছাত্রী সুন্দরী রাজকন্যার প্রণয়-সঞ্চার। বলা বাহুল্য, এরূপ ঘটনা সর্বদেশে সর্বকালে ঘটে, তবে তার জন্য কালিকার দোহাই দিতে হয় না। দ্বিতীয় গল্পটিতে আছে বাধা সত্ত্বেও প্রণয়ী কবির সঙ্গে প্রণয়িনী রাজ-কুমারীর গোপন মিলন। এটির প্রধান দৃষ্টান্ত অবশ্য কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের (দ্বাদশ শতাব্দী ?) 'চৌরপঞ্চাশৎ'; কিন্তু 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' থেকে ক'টা রোমান্স গোপন মিলনের সুযোগ না থাক্‌লে জমে ? নরনারীর প্রণয়-লীলা যখন সনাতন, তখন ওসব চতুর নায়ক-নায়িকারাও আসলে 'সনাতনী', এসব ব্যাপারও 'সেই চিরপুরাতন কথা'। সংস্কৃত ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় এ জাতীয় উপাখ্যান নিশ্চয়ই অনেক ছিল; লোকমুখে বা পূর্বাপর চলিত ছিল সেক্ষেত্রেও কবিরা তারই সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। বাঙ্‌লায়ও এরূপ প্রণয়-প্রধান নানা লোক-কথা যে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় (পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যাসুন্দরের কহিনীর প্রথম বাঙ্‌লা রচয়িতাদের কথা আমরা জানি—'দ্বিজ' শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ; পরে নিমতার কৃষ্ণদাম দাস ও 'কবিবল্লভ' প্রাণরাম চক্রবর্তীও এ কাহিনী বিবৃত করেছেন। মৈমনসিংহের কবি কঙ্ক কে ও তাঁর নামের বিদ্যাসুন্দর কবেকার তা সন্দেহজনক। বিংশ শতকের মার্জিত বুদ্ধি ও ভাষার ছাপ তাতে অবিসংবাদিত। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর জয়-জয়কার অষ্টাদশ শতকেই, আর তা দেখা দেয় আবার দ্বিতীয়ার্ধে,—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যখন সমস্ত শতাব্দীর মানস-বিলাস রূপে 'রসিক'-জনদের মনোহরণ করে, তার পরে। 'বিদ্যাবিলাপ' (নেপালের নাটক) রচয়িতা কাশীনাথ ছাড়াও এ শতাব্দীর কবি হলেন 'কালিকা-মঙ্গল' রচয়িতা বলরাম চক্রবর্তী 'কবিশেখর'। তাঁর কাব্যে 'উৎকল-দ্রাবিড় দেশের' যুবক সুন্দর পড়ুয়া বেশে বিদ্যার আশায় বর্ধমানেই এসে বিদ্যাকে লাভ করে। এ রচনা সরল, 'রসের' প্রাবল্য তখনো দেখা দেয় নি। গোবিন্দ দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত,—তিনি চট্টগ্রামের 'পদ্মপুরাণ'-রচয়িতা গোবিন্দ দাসও হতে পারেন। পাঁচ ভাগে তাঁর কাব্য রচিত, বৃত্রাসুর-বধ থেকে ভানুমতীর কথা প্রভৃতি অনেক কিছু তাতে আছে; শেষভাগে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। এ কাব্য যাঁরই লেখা হোক্, তাঁর কবিত্ব, ছন্দোবৈচিত্র্য, গানের মাধুর্য এ শতাব্দীর উপযোগী। অধিকন্তু একটু ভক্তিভাবও তাতে আছে—

বোধহয় দূর পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে কবি বলে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এতে মীননাথের উদ্ধারের কথাও রয়েছে—গোরক্ষনাথ কালিকার কৃপাতেই তা সম্পন্ন করেন। বিদ্যাসুন্দরের কবিদের মধ্যে এর পরেই আসেন ভারতচন্দ্র, তারপরে আসেন রামপ্রসাদ সেন; এবং ক্রমে লেখা হয় রাধাকান্ত মিশ্র, কবীন্দ্র চক্রবর্তী ও নিধিরাম আচার্য প্রভৃতির 'কালিকা-মঙ্গল'।

ভারতচন্দ্র: ভারতচন্দ্র শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি নন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি। পলাশীর পূর্বেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি মুখপাত্র, পলাশীর পরেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি আদর্শ-স্থাপয়িতা—এবং সাহিত্যিক কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের যুগেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ সমালোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা-ভাজন, অশ্রুবিলাসী বাঙালী জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক তিনি। কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু 'বিদ্যাসুন্দরে'র কবি নন,—'বিদ্যাসুন্দর' তাঁর 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের একটি অংশ মাত্র। তা ছাড়াও তিনি দু'খানি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র রচয়িতা; মৈথিল কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ গ্রন্থের কুশলী অনুবাদক এবং অসমাপ্ত 'চণ্ডী-নাটকে'র কবি; সংস্কৃত 'নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টকে'রও তিনি রচয়িতা; 'অন্নদা-মঙ্গলে' তাঁর সুমধুর ধুয়া গানও রয়েছে। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র বিচ্ছুরিত ঔজ্জ্বল্যে সে সব বিলুপ্ত হয়ে যাবার মতো নয়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় একশত বৎসর পূর্বে (খ্রীঃ ১৮৪৫) ৺কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁর রচনাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন—একালের কবি-জীবনী রচনায় তা বোধহয় একটি প্রথম প্রয়াস (এ 'জীবন-বৃত্তান্ত' সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র' গ্রন্থাবলীর ভূমিকাংশে উদ্ধৃত হয়েছে)।

ভারতচন্দ্র সম্রান্ত বংশের সন্তান। ভরদ্বাজ-গোত্রের মুখুজ্জে বংশে তাঁর জন্ম; ভুরশুট পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুরে তাঁদের নিবাস ছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষ জমিদারী সূত্রে 'রায়' উপাধি লাভ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে (খ্রীঃ ১৭১৩) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বর্ধমানের রাজাদের কোপে তাঁর পিতা তাঁর বিষয়-বিত্ত হারান। ভারতচন্দ্র (আপনার মাতুলালয়ে বাস করে?) প্রথম শিক্ষারম্ভ করেন সংস্কৃতে; ব্যাকরণ ও অভিধান শেষ করে চতুর্দশ বৎসর বয়সেই বিবাহ সমাধা করেন (তাঁর কোনো কোনো ভণিতার 'রাধানাথ' শব্দটি দেখে কেউ কেউ মনে করেন তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রাধা; আর

ভারতচন্দ্র একাধিক রাধা-ভাগ্যও সঞ্চয় করেন নি। আসলে 'রাধানাথ' হয়তো 'কৃষ্ণ'চন্দ্র—পারিষদের নয়, প্রভুরই বিশেষণ)। জমিদারী-ঐতিহ্য মতো তারপর ভারতচন্দ্র ফার্‌সিতে শিক্ষালাভ করতে যান দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্‌সীর কাছে। এইখানেই বোধহয় তিনি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' দু'খানি লিখেছিলেন (খ্রীঃ ১৭৩৭-৩৮);—আসলে তা দুটি ছোট কবিতা মাত্র। পরে যথারীতি তিনি বিষয়কর্ম আরম্ভ করেন। ভারতচন্দ্র বর্ধমানে আসেন বিষয়ের তদারকে। ইতিমধ্যে বর্ধমানের রাজারা রায়দের ইজারা-তালুক খাশ করে নিয়েছিলেন। আমলাদের চক্রান্তে তিনি বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। কোন ক্রমে পলায়নের সুযোগ পেয়ে ভারতচন্দ্র বর্ধমান থেকে সেই রাজ্য ছেড়ে একেবারে কটক হয়ে পুরী চলে যান। এমন অবস্থায় অনেক মানুষের মনেই বৈরাগ্য জন্মে; আশ্চর্য নয়, ভারতচন্দ্রেরও তখন বৈরাগ্য ও ভক্তি জন্মেছিল। বৈষ্ণব বেশে সংসারবিরাগী হয়ে তিনি তখন যাত্রা করেন বৃন্দাবন। পথে খানাকুলে কুটুম্ববাড়ীর লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলল, ভারতচন্দ্রেরও আর বৈরাগী সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব হল না। শ্বশুরবাড়ী হয়ে ভারতচন্দ্র স্বগৃহে ফিরে এলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় হয়তো দেশ তখন তটস্থ। ভারতচন্দ্র বৃত্ত্যন্বেষণে ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কিছুদিন উমেদারি করতে লাগলেন; তাঁরই সুপারিশে তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ নিযুক্ত হলেন। ভারতচন্দ্রের বেতন হল ৪০৲, তিনি বাসাবাটি পেলেন, রাজসভায় স্থানলাভ করলেন। কবির কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র উপাধি দিলেন 'কবিগুণাকর'। কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় তাঁর অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্য করে কবি লেখেন কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ও তাঁর স্থাপিত সেই রাজবংশের প্রশস্তি। সে গ্রন্থেরই নাম 'অন্নদা-মঙ্গল'। কবিকঙ্কণের 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গলে'র অনুরূপ সুবিখ্যাত কাব্য ভারতচন্দ্র লিখবেন এই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রেরও ইচ্ছা, ভারতচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিও সে কাব্যে তৃপ্ত না হলে চলবে কেন? 'অন্নদা-মঙ্গল' তাই মঙ্গল-কাব্যের আকৃতি পেলেও প্রকৃতি পাবে, এ কৃষ্ণচন্দ্রেরও আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র মধ্যে তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও চাইলেন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর স্থান, ভারতচন্দ্রও তা যোগালেন (খ্রীঃ ১৭৫২) সভাকবির মতো মহা উৎসাহে;—আপনার কৃতিত্বেও তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। মূলাজোড়ে কবিকে কৃষ্ণচন্দ্র জমিজমা ইজারা দিলেন, সেখানে তাঁর নিবাস স্থির

হল। এখানেই পত্তলিদার রামদেব নাগের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে তিনি 'নাগাষ্টক' লিখে পত্রযোগে তা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রেরণ করেছিলেন। ১৭৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অন্নদামঙ্গল: অন্নদামঙ্গল (বা অন্নপূর্ণামঙ্গল) ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর নয় বৎসর পূর্বে রচিত হয় (খ্রীঃ ১৭৫২-৫৩)। এ কাব্যে আটটি পালা, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় তা প্রথম গীত হয়েছিল। অন্নদামঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত; সে বিভাগ এরূপে করা চলে: প্রথম খণ্ড—শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল; এবং তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিন খণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষীণ; কাব্যের যোগসূত্র হচ্ছেন আসলে অন্নদা, অন্নদার কৃপায় ভবানন্দের ভাগ্যোদয়, এই হল কাব্য-কথা।

প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর বন্দনা ও কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনের পরে গীতারম্ভ,—সতীর দেহত্যাগ, উমার জন্ম, শিববিবাহ, ক্রমে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণ, শিবের ভিক্ষা-যাত্রা, কাশীপ্রতিষ্ঠা, ব্যাসের শিবনিন্দা প্রভৃতি শিবায়নের ও মঙ্গলকাব্যে বিষয় বর্ণনাতেই চৌদ্দ আনি শেষ। তারপরে তাড়াতাড়ি আসে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, এবং ভবানন্দের জন্ম;—হরিহোড় দেবীর অনুগ্রহে লক্ষপতি হয়েছিল, তাকে ছেড়ে দেবী চললেন নদী পার হয়ে ভবানন্দের গৃহে। অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রার এই প্রথম খণ্ড শেষ। দেব-দেবীর এই আখ্যানসমূহে মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্র চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরাম ও শিবায়নের রামেশ্বরকে অনুসরণ করেছেন। অবশ্য বলেছি—এ মাহাত্ম্যবর্ণনা আকৃতিতেই মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। চতুর মানুষের রঙ্গ-রসিকতার দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র সমস্ত দেব-দেবীকে দেখেছেন—দেবদেবীর প্রতি তাঁর ভয়ভক্তি বিশেষ নেই; কলা-কুশল কবির মতো তিনি কাব্যবিন্যাস করেছেন সিদ্ধহস্তে; বিশেষ করে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ যথা করেছেন ব্যাসদেবকে নিয়ে। অবশ্য আরও একটা ঐতিহ্য ছিল, বাঙলা নাট-গীতে নরদ-ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিরা ইতিপূর্বেই হয়ে উঠেছিলেন সঙ্-এর মতো হাস্যকর বুড়ো। যাই হোক, এ খণ্ডের 'শিবের দক্ষালয় যাত্রা' (মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে'), 'দক্ষযজ্ঞনাশ', 'রতিবিলাপ', 'শিব-বিবাহ', কোন্দল ও শিবনিন্দা ('আই আই ওই বুড়ো কি এই গৌরীর বর লো।'), হরগৌরীরূপ, কৈলাস-বর্ণন, হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা ('শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি' ইত্যাদি), এবং অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ('অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে'—

সেখানে ঈশ্বরী পাটনীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটল) প্রভৃতি অংশ একালের বাঙালী পাঠকেরও পরিচিত ; সে সব বিষয় তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। গল্পের দিক থেকে মনে রাখতে হয়, গাঙ্গিনীর ওপারে আন্দুলিয়া গ্রামের রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারই কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ—রাজা মানসিংহ তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাবেন, কানুনগো ভবানন্দ তখন রাজা খেতাব পাবেন—এই হবে সমগ্র কাব্যের আসল আখ্যান। প্রথম খণ্ড ভবানন্দের জন্মে ও অন্নদার হরিহোড়কে ছেড়ে ভবানন্দকে অনুগ্রহ দানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে মানসিংহের বাঙলায় আগমন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করা তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ধমানে এসেই মানসিংহ কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের কাছে শুনতে চাইলেন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী—মোগল সেনাপতি মানসিংহ কাছুয়া যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অতএব এখণ্ড হল বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল। সমগ্র খণ্ডের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর শুনতে শুনতে রাজা মানসিংহের বা কবির আর হুঁসই নেই—মূল আখ্যান কি। কালিকার মাহাত্ম্য-কীর্তনও নিতান্ত গৌণ, 'আসলে বিদ্যা ও সুন্দরের সুরঙ্গ-ভেদী প্রণয়-কাহিনীই ঐখণ্ডে কবির মুখ্য অবলম্বন'।

ভারতচন্দ্রের কাহিনীটি এরূপ : বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিচারে যে তাঁকে জয় করতে পারবে সে-ই হবে তাঁর পতি। কেউ বিচারে পারে না, বিবাহও হয় না। রাজা তাই গোপনে ভাট পাঠালেন কাঞ্চীতে,—কাঞ্চীর রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর অসাধারণ পণ্ডিত। ভাটের কাছে বিদ্যার খ্যাতি শুনে সুন্দরও এলেন পড়ুয়া-রূপে বর্ধমানে। তারপর ? সুন্দরের বর্ধমান দর্শন—এদিকে সুন্দর দর্শনে নাগরী-গণের খেদ,

আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে।

এদিকে সুন্দরের সঙ্গে ঘটল রাজবাটীর মালিনীর সাক্ষাৎ ;—বাঙলা সাহিত্যে মালিনী (কুট্টনীরই উত্তরাধিকারিণী) অনেক আগেই ছিল, কিন্তু হীরা মালিনী তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। সুন্দর বর্ধমান শহরে হীরা মালিনীর ঘরে

বাসা নিলেন, বিদ্যার খোঁজ খবর করলেন। মাল্য রচনা করে ও শ্লোক রচনা করে হীরার হাতে পাঠালেন সেই 'করভোরু রতিপ্রাজ্ঞা'র উদ্দেশে। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না। বিদ্যার কাছ থেকেও এল তেমনি শ্লোকে রচিত উত্তর। এর পরে মালিনীর ব্যবস্থার পালা আরম্ভ হল। প্রথম উভয়ের দর্শন, সুরঙ্গপথে একেবারে রাজকন্যার গৃহে সুন্দরের উদয়, উভয়ের কৌতুকারম্ভ, বিচার, গন্ধর্ব-বিবাহ, বিহার। ফলে, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর কন্যাকে তিরস্কার, রাজার ক্রোধ, রাজাদেশে কোটালের চোর-ধরা, বিদ্যার আক্ষেপ, বন্দী সুন্দরকে দেখে 'নারীগণের পতি-নিন্দা', 'রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠ', এদিকে মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, কালীর অভয় দান, সুন্দর-কৃপায় বীরসিংহেরও দিব্যজ্ঞান লাভ, এবং বিদ্যা ও সুন্দরের পুনর্মিলনের শেষে 'বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা'—এইরূপে এই দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত। কিন্তু কোথায় বা রাজা মানসিংহ, কোথায় বা এ গল্পে ভবানন্দ ? মূল গ্রন্থের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় খণ্ডটি সে হিসাবে অবান্তর—অথচ এটিই 'অন্নদামঙ্গলে'র উৎকৃষ্ট ভাগ।

বাঙলা দেশে এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যে এ কাহিনী জানে না, বা চুরি করেও এই বিদ্যাসুন্দর পড়ে নি। এমন পাঠকও কেউ নেই, যে স্বীকার করবে না—এ কবির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ, এবং ভারতচন্দ্রের খ্যাতি—বা অখ্যাতি—সম্পূর্ণই তাঁর প্রাপ্য।

তৃতীয় খণ্ড মানসিংহের বর্ধমান থেকে যশোর যাত্রায় আরম্ভ; তাতে মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ আছে ; বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে তা সেরে নিয়ে কবি ভবানন্দকে পাঠালেন মানসিংহের সঙ্গে দিল্লী। বাদশাহকে মানসিংহ বাঙলার বৃত্তান্ত পেশ করলেন—ভবানন্দের মুখে অন্নদার ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ক্রোধই হল। তাঁর দেবতা-নিন্দায় ভবানন্দ আপত্তি করলেন ; ফলে ভবানন্দের কারাদণ্ড হল। তারপরে কারাগারে মজুমদারের অন্নদাস্তব, অন্নদার অভয়দান, দেবীর ভূতপ্রেতদের দিল্লীতে উৎপাত ; অন্নদার মায়া-প্রপঞ্চ —তাতে রাজসভা আর চেনা যায় না—

রক্ত শতদলে পাতশা অভয়া
উজির হইল জয়া নাজির বিজয়া। ইত্যাদি।

এসবে পাত্‌শা বিমূঢ়। তখন তাঁর ভক্তি হল, মজুমদারকে অনেক বিনয় সম্ভাষণ করলেন, এবং 'রাজাই ফরমান' দিলেন। বাঙালী মজুমদারও আর দেরী

না করে ঘরমুখো হলেন। পথে অবশ্য কবির গঙ্গা বর্ণন, অযোধ্যা বর্ণন ইত্যাদির অবসর হল। বাড়ী ফিরে মজুমদার একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এদিকে পতি নিয়ে দুই সতীনের সেখানে ব্যঙ্গোক্তি চলেছে। মজুমদার কৃতী পুরুষ, দু'জনেই সন্তোষবিধান করলেন। তারপর রাজ্য আরম্ভ করলেন, অন্নদা পূজা করলেন। এবং যথাসময়ে মজুমদার স্বর্গযাত্রা করলেন, গ্রন্থও শেষ হল।

'অন্নদা-মঙ্গল'ই ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। তাই মনোহর হলেও কেউ আর 'রসমঞ্জরী'র কথা বলে না। কিন্তু অন্নদা-মঙ্গলের এসব আখ্যানের থেকে অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত ধুয়াগানগুলি এক হিসাবে আরও আদরণীয়। যেমন, দ্বিতীয় খণ্ডের 'পুর-বর্ণনার' ধুয়া গান—

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে…
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমতি চাহে সেই মত চাও হে॥

কিংবা 'বিদ্যাসুন্দর দর্শনে'—

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥

কিংবা 'অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলনায়'—

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে॥ ইত্যাদি

রামপ্রসাদের গানের একটা আভাসও এ পদ বহন করে আনে।

আসলে এসব গানের একটা পুরাতন পথে পা বাড়াতেই পুরনো ভক্তি-ভাবটুকুও ভারতচন্দ্র কবিকর্মসূত্রেই এ সব স্থলে সঞ্চার করতে পেরেছেন; সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন তাতে একটা মার্জিত চারুতা, একটু নূতন ভঙ্গিমা। এই চারুতা ভারতচন্দ্রের অন্যান্য লেখায়ও আছে, কিন্তু নেই ভাবের ক্ষীণ প্রাণোত্তাপও।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে, এক নূতন সাহিত্যাদর্শও তখন থেকেই গৃহীত হতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে তথাপি স্বীকার করতে হয়—কবি ভারতচন্দ্র এখনো আমাদের নিকট বাঙলা

কাব্যের এক শ্রেষ্ঠ কলাকার। মাইকেলেরও তিনি সমাদর লাভ করেছেন—শুধু দুটি সনেটে ('অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' ও 'ঈশ্বরী পাটনী') নয়, মাইকেলের ছন্দোবদ্ধ পদের সুরে ভারতচন্দ্রের ততোধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্রের রুচি, নীতি বা জীবনবোধ কোনটাই অনুমোদন করবার মতো কবি নন ;—কিন্তু তিনিও মনে করতেন, "রাজসভা-কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" ভারতচন্দ্রের যেখানে কৃতিত্ব সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। আলাওল-এর ক্লাসিক বা শিষ্ট রচনা-রীতির পরিণতি ভারতচন্দ্রে। উদ্ধৃতি-দান অনেকাংশে নিষ্প্রয়োজন ;—বিদ্যালয় থেকেই আবাল্য আমরা সে সবের সঙ্গে পরিচিত হতে বাধ্য হই। নিখুঁত ছন্দ ও অপরিমিত শব্দ-সম্পদ ভারতচন্দ্রের ক্লাসিক রীতির প্রধানতম অবলম্বন। বাঙ্লা ছন্দের এমন যাদুকর তাঁর পূর্বে আর জন্মে নি ; তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিশ্চয়ই জন্মেছেন, কিন্তু তাঁরা জন্মেছেন সম্পূর্ণ নূতন কালে, অনেক উত্তরাধিকারের সৌভাগ্য লাভ তাঁদের ঘটেছে। তাই বাঙ্লা ছন্দঃপরিচয়ের পুস্তক-লেখকদের প্রধান আশ্রয় পূর্বে ছিলেন ভারতচন্দ্র, এখন তৎসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের নিদর্শনও যুক্ত হয়। এই সব সূত্রে ভারতচন্দ্রের এদিকটির সঙ্গে বাঙালীমাত্রই পরিচিত। এমনই সুবিখ্যাত কবিগুণাকরের শব্দ-কুশলতা। যেমন তাঁর শব্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার, তেমনি তাঁর অভ্রান্ত শব্দ-চয়ন ;—এরও দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করা যায় না। বাঙ্লার শব্দ-ভাণ্ডারের দ্বার ফার্সি ও হিন্দীর জন্য আলাওল-প্রমুখ কবিরা উন্মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো তাঁরা ফার্সি-হিন্দী শব্দকে এমন দু'হাতে গ্রহণ করতে সাহসী হন নি। অথচ ভারতচন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দকে গ্রহণ করেছেন যাচাই করে, বাছাই করে, ওজন করে,—প্রত্যেকটি ফার্সি ও হিন্দী শব্দের স্থান হয়েছে লালিত্যগুণের জন্য, বিশেষ বাক্য-রচনায় তার উপযোগিতার জন্য। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্র তাঁর নীতিও ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন।

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥

না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥

প্রসাদগুণ ও রসালতা,—তাঁর এই শব্দ-চয়নের মানদণ্ড। তাঁর সে শব্দমালা সমগ্র বাক্যকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, আর তাঁর বাক্যচয় একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে প্রসাদগুণ, সরসতা। ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বিন্যাস তাই অনুপম। তার 'কারুকার্য' ও 'উজ্জ্বলতা' কোনোটিই চোখে না পড়বার মতো নয়, অথচ তা সম্পূর্ণরূপে কাব্যের প্রয়োজন-সম্মত। এজন্যই সেই অপূর্ব গুণের প্রমাণস্থল হয়েছে ভারতচন্দ্রের ভাষা—পাশ্চাত্ত্য কাব্য-জিজ্ঞাসায় যার নাম 'স্টাইল'। এজন্যই প্রমথ চৌধুরীও ভারতচন্দ্রকে এত অসামান্য মনে করেছেন। ভারতচন্দ্রের মতো এত ঝক্‌-ঝকে তক্‌-তকে কথা বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর কেউ জোগাতে পারেন নি—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও না।

স্টাইল বলতে অবশ্য শুধু বাগ্‌বিন্যাস বোঝায় না। অর্থের সঙ্গে বাক্যের —পার্বতীর সঙ্গে পরমেশ্বরের,—অভিন্নভাও তাতে বোঝায়। ভারতচন্দ্র হয়তো এ-কালের এ কথায় আপত্তি করবেন না, কারণ 'কাব্য রস লয়ে'। এবং নিশ্চয়ই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যে অসামান্য সংযোগে তাঁর কাব্য 'রসাল' হয়ে উঠেছে, মৃদু তির্যক হাস্যে কবি তা আমাদের মনে করিয়ে দেবেন :

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥ ইত্যাদি

কিম্বা— বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥

কিম্বা সেই বিদ্যার দরবার—

তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥

বুঝ্‌তে পারা যায় কবি বেশ ভালো ভাবেই জানেন

ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।

পুরাতন অলঙ্কার শাস্ত্র দিয়ে যদি কাব্যের পরিমাপ হয় তা হলে নিশ্চয়ই এ দামী কারুকর্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম কার্যের জন্ত তো কাব্যের মূল্য নয়, ভারতচন্দ্রও বলেন 'কাব্য রস লয়ে'। তবে যে-'রস' নিয়ে সেদিন কাব্যের বিচার হত, সে-'রসের' মূল্য আজ কাব্যের বাজারে কমে গিয়েছে। 'রসাল' কথাই ছিল সে যুগে কাব্যের প্রাণ, আর 'রসিকতা' বলতে তখনো অনেক সময়েই বোঝাত আদিরস নিয়ে এই চাতুর্য। 'কাব্য রস লয়ে', ভারতচন্দ্র এই কথাটা জানতেন; কিন্তু কথাটার অর্থ আজ বদলে গিয়েছে। তিনি শোনেনও নি তখন—এ রস 'জীবন-রস' এবং 'মানব-রস'—সর্বরসসার। মধ্যযুগের মানসে সেই সত্য সহজে অনুভূত হতে পারে না; অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় তার আভাস মেলাও অসম্ভব। সে সভায় রসিক পুরুষরা রস বলতে 'রসাল' কথাই বুঝতেন। এই কারণেই 'নারীগণের পতিনিন্দা' তাঁরা উপভোগ করতেন; সংস্কৃত কবিতার বুদ্ধিগ্রাহ্য রসিকতার (wit) ঐতিহ্যে পুষ্ট বলে সে রসিকতায় তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন; ব্যাসদেবকে নিয়ে স্থূল পরিহাস, দাসু-বাসুর খেদ, এসবও ছিল তখনকার প্রচলিত কথকতা, নাটযাত্রার পরিচিত উপকরণ; দেবদেবীর দাম্পত্যকলহ বা দুই স্ত্রীর সাপত্ন্যকলহ, মেয়েদের এ জাতীয় নারী-বৃত্তি ছিল তাঁদের অভিজ্ঞতার জগতের কৌতুকোপকরণ। কিন্তু এর বেশি আর তাঁদের দৃষ্টি মানুষের জীবনে প্রবেশ করে নি, অভিজ্ঞতায় তা স্থান লাভ করে নি। মুকুন্দরামের মধ্যে মানুষের যতটুকু পরিচয় দেখা গিয়েছিল, ভারতচন্দ্রে তার আর নেই। সেই চরিত্র-চিত্র কয়েকটি সব্যঙ্গ রেখা-চিত্রে পরিণত হয়েছে; এই রেখার ধার আছে, কিন্তু রূপ নেই। একবার মাত্র ভারতচন্দ্র জীবনে হঠাৎ একটি জীবন্ত স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। হয়তো তাঁর নিজের মনে নেই আর তার কথা—পাঠকেরই মনে বেঁচে রয়েছে সেই সরল বাঙালী মাঝি ঈশ্বরী পাটনী আর অবজ্ঞাত বাঙালী জনশ্রেণীর সেই সত্য প্রার্থনা—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। চিরকালের মূঢ় ম্লান মূক বাঙালীর সমস্ত বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এই কথাটিতেই ভাষা পেয়েছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এ কথা পরিষ্কার, মধ্যযুগ তখন বিগতপ্রায়। অথচ ভারতচন্দ্রকে আধুনিক যুগের কবি বলাও অসম্ভব, মধ্যযুগের কবি বলাও দুঃসাধ্য। তাঁর মনের গঠনে আবেগবাহুল্য নেই—সেখানে বুদ্ধির প্রাখর্যই প্রবল, ধর্মবোধে তিনি

ভারাক্রান্ত নন, দেবদেবীরা মানব-মানবীর মতোই তাঁর নিকটে রসিকতার উপাদান; ঐহিকতা (secularity) তাঁর চিন্তার ও কাব্যের স্বাভাবিক গুণ, তিনি কালিকাকে দিয়ে সুন্দরকে ত্রাণ করান, কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারকে বৃন্দাবনী অপার্থিবতায় 'শোধন' করিয়ে নেন না। বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়-ব্যাপারকে রক্তমাংসের যুবক-যুবতীর অত্যন্ত সহজ এবং বাস্তব যৌন-সম্ভোগ রূপেই ভারতচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। এই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, এই ঐহিকতা-বাদ ও প্রণয়-রচনায় বাস্তবতাবাদ—আধুনিক কাল-ধর্ম। অন্যদিকে, এ কালের রুচি ও নীতিতে ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক বর্ণনা আমাদের কাছে দোষাবহ ঠেকবে,—না ঠেকলে মনে করতে হবে আমরা একালের মানুষ নই। অবশ্য, একালের শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও আমরা এ রচনা উপভোগ করতে পারি;—না পারলে বুঝতাম আমাদের উপভোগ-শক্তি সুস্থ নেই, প্রতি-নিয়ত হলীউডী চিত্র-তারকাদের যৌন-বিজ্ঞাপনীতে তা আমরা খুইয়েছি। নিঃসন্দেহ যে, ভারতীয় এবং অনেক প্রাচীন সাহিত্যে দেহ-বর্ণনায় বা সম্ভোগ-বর্ণনায় কবি বা শ্রোতারা কেউ বিশেষ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আরও নিঃসন্দেহ এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় এই আদিরস-চর্চার একটা কৃত্রিম মূল্যও দেখা দিয়েছিল,—সে কৃত্রিমতা ভারতচন্দ্রের কারুকার্যে ও ঔজ্জ্বলতায় ঢাকা পড়ে নি। এবং একালের আমরা মানতে পারি—এই কৃত্রিম যৌন-বিলাসও বরং ভালো;—ব্রজলীলার ভাবালুতায় রসানো কৃত্রিম প্রণয়-গীত আরও অসহ।

তথাপি ভারতচন্দ্রের কবিতা একালের নয়—তা অষ্টাদশ শতকের ছাড়া আর কোনো কালের নয়। কৃত্রিম কালের তা কৃত্রিম সৃষ্টি;—তার মানুষও কৃত্রিম।

এ কৃত্রিমতা ভারতচন্দ্রের একান্ত গুণ নয়। প্রথমত তা নবাবী আমলের গুণ—যখন মধ্যযুগ শেষ হয়েছে, অথচ যুগান্তর সংঘটিত করতে সমাজ-শক্তি অক্ষম। দ্বিতীয়ত, এ হচ্ছে রাজসভার গুণ, যেখানে কৃত্রিমতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ; তন্মধ্যে বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার গুণ। কৃষ্ণচন্দ্র যতই চতুর হোন্, জীবনে কোনো গভীরতা বা দায়িত্ববোধের নামগন্ধ তাঁর ছিল বলে প্রমাণ নেই। ভারতচন্দ্র সেই রাজসভায় খাপ খেয়ে গিয়েছেন আশ্চর্য রকমে, তা স্পষ্ট দেখি। বৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধির ছটায়, বাক্যের ঘটায়, সব্যাজ রসিকতায় (wit), বিকার বিলাসিতায়, তাঁকে সে যুগের মুখপাত্র মনে করতে পারি। বিশেষ করে লক্ষ্য করতে পারি তাঁর মধ্যে একটা অগভীরতা, আসর জমাবার চেষ্টা, চটক লাগাবার

এবং চমক লাগিয়ে মজা দেখবার ছেলেমানুষ-সুলভ প্রবৃত্তিও। এদিক থেকে দেখলে মনে হবে আসলে 'বিদ্যাসুন্দর' বিষপুষ্প নয়, ও হচ্ছে কাগজের ফুল।

বিদ্যা ও সুন্দরের বিহার বর্ণনার জন্ত নয়,—নিশ্চয়ই তা এ কালের রুচিতে ও কাব্যাদর্শে বর্জনীয়,—বরং এই কৃত্রিমতার জন্যই ভারতচন্দ্র বড় বলে গণ্য হবার অযোগ্য। এ কাব্যে প্রাণ নেই, জীবনের স্ফূর্তি নেই, এবং মানুষ নেই, আর মানুষ না থাকলে কোনো লেখা আধুনিক যুগের কাব্য হয়না। রাজসভায় —সেই নবাবী-আমলে শাসক আশ্রয়ে—বড় কবি তখন জন্মাতে পারে না, বাঁচতে পারে না, স্থিরও থাকতে পারে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে দেখি তিনি সে রাজসভাতেই—কবি হিসাবে—জন্মেছেন, বেঁচেছেন এবং বেশ খোশ মেজাজে বসে বসে সরু সুতো কেটেছেন ;—নতুন নাগরীয় আসরের রসিক-পুরুষদের তোষণ করেছেন, মেজে ঘষে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কথার উপরে কথা চাপিয়ে পলাশীর প্রাক্‌ক্ষণে বাঙালী শাসক-গোষ্ঠীর আসর জমিয়েছেন, এবং মৃত্যুর পরে পলাশীর রক্ত সন্ধ্যায়—সেই ধ্বসে পড়া, গলে পড়া, নবাবী আমলের মৌতাতে ঝিমন্ত বাঙালী 'জমিদার' ও তৎপরবর্তী কলকাতার 'বাবু' সমাজে—এবং তাদের অনুগত 'ভদ্র' সমাজেরও মধ্যে—রেখে গিয়েছেন এই মৌতাতের ভাণ্ড আর রঙীন কাগজের ফুল : নিষ্প্রাণ, এবং অনেকাংশে আজকের দিনে, নির্বিষও।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ভারতচন্দ্র অসাধারণ কলাকুশলী কবি আর তাঁর কালের সেই কৃত্রিম সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি তেমনি অসাধারণ মোহ বিস্তার করতে পেরেছিলেন। পূর্বগামী মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিদের যশ তখন সাময়িকভাবে ম্লান হয়ে যায়। 'কালিকামঙ্গলে'র কবিরা তাঁর অনুকরণে লেগে যান, তাঁরা কেউ তাঁর গুণ না পেলেও তাঁর দোষকে দ্বিগুণ করে তুললেন,—তাতে আশ্চর্য হবার নেই। এ প্রভাব কত ব্যাপক ও কত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা তখনকার সাহিত্য-ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারব—হালহেডের ব্যাকরণ (খ্রীঃ ১৭৭৮), ফর্‌স্টারের অভিধান (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডফের ব্যাকরণে (১৮০১) ভারতচন্দ্রের বহুল উদ্ধৃতি মিলে। লেবেডফের উদ্যোগে প্রথম (১৭৯৫) বাংলা নাটকের যে অভিনয় হয় তাতে ভারতচন্দ্রের গানই গীত হয়েছিল , শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে (১৮৩৫) বাঙালীরা প্রথম যে নাটক অভিনয় করেন তা 'বিদ্যাসুন্দর'। গোপাল উড়ে 'বিদ্যাসুন্দর'কে যাত্রাগানে রূপান্তরিত করে তার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেন। 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'

প্রথম মুদ্রিত করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইংরেজি ১৮১৬ সালে, তা-ই প্রথম বাঙ্লা সচিত্র পুস্তক (দ্রঃ—সাঃ পঃ সংস্করণ, ভূমিকা)। শুধু ভারতচন্দ্রের নয়, নবাবী আমলেরও প্রভাব এ সব থেকে অনুমেয়।

রামপ্রসাদ : ভারতচন্দ্রের পরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ অবশ্য কালীকীর্তনের জন্যই সর্বজনসমাদৃত, 'সাধক-কবি' বলেই তাঁর খ্যাতি। কিন্তু ইদানীং একথাও আমাদের স্মরণ-পথে পুনরুদিত হয়েছে যে, রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন, আর সে কাব্য তুচ্ছ নয়। তা ছাড়া তিনি 'কৃষ্ণকীর্তন'ও কিছু কিছু লিখেছিলেন, তবে প্রধানত তিনি শাক্তপদাবলীরই শ্রেষ্ঠ কবি। অবশ্য রামপ্রসাদের নামে যে সব গীতি প্রচলিত তা বিভিন্ন রামপ্রসাদের,—যথা 'দ্বিজ' রামপ্রসাদের, কবিওয়ালা রামপ্রসাদের, বা পূর্ববঙ্গীয় অন্য এক রামপ্রসাদেরও। আসল রামপ্রসাদ হচ্ছেন রামপ্রসাদ সেন 'কবিরঞ্জন'। তাঁর শাক্ত পদাবলীতেই বাঙ্লার মানুষের প্রাণ ভাষা পেয়েছে।

রামপ্রসাদ সম্ভবত ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদ সেন জন্মেছিলেন বৈদ্য বংশে, হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন, ভ্রাতাভগ্নী প্রভৃতি অনেকের নামও কবি করেছেন। তাঁর পরিপোষকের নামও আছে—মহারাজ রাজেন্দ্র রাজকিশোর, তাঁর আদেশে তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে নি, কারণ ভারতচন্দ্রের কাব্যের মতো তা যুগ-চরিত্রকে ততটা প্রকাশিত করতে পারে নি। যাকে আমরা এখন অশ্লীল বলি, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তা থেকে মুক্ত নয়; কারণ তখনো সাহিত্যে তা অশ্লীল বলে গণ্য হত না। কিন্তু যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের প্রাধান্যে এবং কথার চটকে ভারতচন্দ্র যুগ-কবি, রামপ্রসাদ তাতে তাঁর সমকক্ষ নন। না হলে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা আছে, মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়, এমন কি ঘরোয়া ভাবেরও সন্ধান মিলে—কালীর পদের কবি তাঁর স্বভাব একেবারে খোয়াবেন কি করে? আর সেই সঙ্গে কাব্যগুণও তাঁর আছে।

রামপ্রসাদ তবু গানের জন্যই প্রসিদ্ধ (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ১৫২২)। সে গানে বাঙ্লার মাটির গন্ধ আছে, মানুষের প্রাণকেও সেই অষ্টাদশ শতকে সে গীত স্পর্শ করেছিল। কোনো কোনো পদে এমন একটা ঘরোয়া ভাবের

সরল শ্রী ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা আছে যা লোকগীতে ছাড়া সাধারণত পাওয়া যায় না—অন্তত সাধারণ বৈষ্ণব পদাবলীতে তা দুর্লভ। ভয়ঙ্করী কালী, দুর্গার মতোই, বাঙালীর কাছে দয়াময়ী জননী হয়ে উঠেছেন—আর রামপ্রসাদী গীতের মারফত এই সম্পর্কটি রসস্নিগ্ধ হয়ে বাঙ্‌লা দেশের জনচিত্তেও পুনঃপ্রবেশ করেছে। হয়তো তিনিই এই নূতন ঐতিহ্যের স্রষ্টা। সেই কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদের কাব্যে ও গীতে, ভাবে ও ভাষায় একটা অকৃত্রিমতা দেখা যায়, যা প্রায় ব্যতিক্রম। আসলে একেবারে ব্যতিক্রম নয়; কারণ, উপরতলার এই কৃত্রিমতা পল্লী-সমাজের জনচিত্তকে সে যুগেও কবলিত করতে পারে নি—ধর্মমঙ্গল থেকে পল্লীর নানা গীতে গানে আমরা তা অনুভব করতে পারি। রামপ্রসাদের গানে গীতে একটা ব্যর্থতার ও নৈরাশ্যের সুর আছে, কিন্তু কৃত্রিমতা নেই, বিকৃতি নেই। শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যসূত্রে বৈদগ্ধ্য ও রাজসভা দ্বারা আকৃষ্ট হলেও রামপ্রসাদ লোক-সমাজের থেকেই আপনার প্রাণের আশ্রয় ও সঙ্গীতপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

অলঙ্কারের ঝঙ্কারও তাঁর গীতে কম নয়—

শ্যামা বামা কে
তনু দলিতাঞ্জন শারদ সুধাকর মণ্ডল বন্দিনী রে।
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥...
ভীম ভবার্ণব তারণ-হেতু ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন
কুরু কৃপালেশং জননি কালিকে।

বাক্যালঙ্কারও যথেষ্ট :—

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ
এ কহে নীল কমল ও কহে চাঁদ। ইত্যাদি...

কিন্তু রামপ্রসাদের আসল বৈশিষ্ট্য তাঁর আন্তরিক ভক্তি ও সরল বাচনভঙ্গিতে :—

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥
মা সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা তথা। ইত্যাদি...
কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল। ইত্যাদি—
মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥ ইত্যাদি···
রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥···
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥ ইত্যাদি···
এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বয়ে পড়বে ধারা।
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥ ইত্যাদি···

'কলুর বলদ', 'কৃষিকাজ' ও 'মানবজমি' বিষয়ক তুলনাগুলোও স্মরণীয়। তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উপমাও চমৎকার

প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য অভাবেতে স্বভাব যেটি॥ ইত্যাদি···

কালিকামঙ্গলের বা বিদ্যাসুন্দরের আরও রচয়িতা ছিলেন—যেমন রাধাকান্ত মিশ্র,—তিনিই বোধহয় কলকাতার প্রথম কবি,—'কবীন্দ্র' চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের নিধিরাম আচার্য প্রভৃতি। দোষে-গুণে তাঁরা আজ বিস্মৃত-প্রায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সুন্দর চোর কালিকার প্রসাদে দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্যাকে নিয়ে রাজত্ব করেছিলেন কিনা ঠিক নেই। তবে বাঙলা দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়—বাঙলায় থাকলে সে কাজ তাঁর পোষাত না। কোম্পানির আমলে তিনি কলিকাতা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি শহরের নূতন ভাগ্যবন্তদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসতেন, বিদ্যাসুন্দর গান শুনতেন, শুনতেন চন্দ্রকান্তের কাহিনী, বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি বা ফারসি কড়া-পাকের প্রণয়-কথা গোলেবকাওলি। এদিকে দেবদেবীর পূজা হত, পূজা উৎসব উপলক্ষ্য করে তিনি তখন বসতেন কবিগান, যাত্রা, তরজা, খেউড়, ঢপ-কীর্তন, নূতন পাঁচালী প্রভৃতি শুনতে। ১৮০০এর পরেও সে আসর শহরে 'বাবু'রা প্রায়

পঞ্চাশ বৎসর জীইয়ে রেখেছিলেন—একদিকে 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি উপাখ্যান, অন্যদিকে কবির লড়াই, খেউড়, হাফ-আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি তাঁদের 'রস' জোগাত। বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণ-প্রাবল্য সত্ত্বেও বাক্য-রচনায় ভাঁটা পড়ে, গীতে গানেই কলিকাতা রঙ্গালয়ে শহুরে বাবুদের আশা মিটত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই সব শহুরে ও সৌখীন গীত-ধারাও বাঙলায় দেখা যায় (পরে দ্রষ্টব্য); বিদ্যাসুন্দরের মতো তাতেও পৌরাণিক কাহিনী বা দেবদেবীর নাম থাকত। যথার্থ ধর্মসঙ্গীতও ছিল। কিন্তু আসলে তা অনেক সময়েই প্রণয়-সঙ্গীত ; আর অনেক প্রণয়-সঙ্গীতের মধ্যেই পাওয়া যায়—প্রথম দিকের এই নবাবী আমলের প্রণয়-বিলাসীদের কৃত্রিম জীবন ও রস-লোলুপ মনের প্রতিধ্বনি, পরবর্তী কালের বাবু-বিলাসের আয়োজন উপকরণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচালী, 'ইসলামী পুরাণ', গাথা, গীতি ও বিবিধ রচনা

'শ্রীরাম পাঁচালী', 'ভারত পাঁচালী' এবং মঙ্গলকাব্যসমূহ ছাড়াও অন্য দেব-দেবীর পাঁচালী পাওয়া যায়, তা দেখেছি ; যেমন, শীতলার পাঁচালী, সূর্যের পাঁচালী, ইত্যাদি। সুবচনী, সত্যনারায়ণপ্রভৃতি দেবতাদের পাঁচালী মঙ্গলকাব্য নাম পায়নি, তা পাঁচালীই রয়েছে। সুবচনীর ব্রতকথা পূর্ববঙ্গে পাঁচালীর স্তরেও উঠতে পারে নি। এদিকে প্রধান পাঁচালী হল সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

সত্যপীরের পাঁচালী—মুসলমান আগমনের পূর্বে লোক-মনে নাথগুরু ও সিদ্ধাদের আসন যেখানে ছিল, মুসলমান পীর ও ফকিররা তাঁদের কেরামতির খ্যাতিতে সেইখানেই অতি সহজে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তারপর জন-জীবনে দুই ধর্মের এই পীর ও গুরুদের সমান প্রভাব বিস্তৃত হয়, সমভাবে তাঁদের মাহাত্ম্য-গানও ক্রমে রচিত হতে থাকে। এই জন-জীবনের সহজ সংমিশ্রণেই উদিত হন সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই দক্ষিণ রায় ও পীর বড় খাঁ গাজী ও কালু রায়ের দ্বন্দ্ব ও বোঝাপড়া সমাপ্ত হয়েছিল।

তখনো দন্দ্ব না থাক্ তার স্মৃতি ছিল। কিন্তু এখন এই অষ্টাদশ শতকে হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিহ্নও আর সত্যপীরে বা সত্যনারায়ণে দেখা যায় না। এখানেও সুফী প্রভাব সক্রিয় ছিল তা অনুমান করা যায়। সুফীদের ভাষায় আল্লাহ্ হলেন 'হক' = সত্য,—সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পক্ষে এই 'সত্য'-শব্দটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গেই হয়তো এই পীর-মাহাত্ম্যের উদ্ভব। 'সত্যপীরের কাহিনী' পূর্ববঙ্গে কতটা প্রচলিত জানি না। কিন্তু সত্যনারায়ণের কাহিনী পাঁচালী আর তাঁর 'শিনি' পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে এখনো সুপ্রচলিত। সত্য-পীরের পাঁচালীতে দুইটি উপাখ্যান—দুইই ব্রতকথার মতো ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কামনায় উদ্ভূত। একটি কাহিনী এরূপ :—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভগবান তাঁর প্রতি দয়া করে ফকির বেশে দেখা দিলেন, তাঁকে সত্যপীরের শিনি দিতে বললেন। ব্রাহ্মণ পুজো দিল আর ধনশালী হয়ে উঠল। দ্বিতীয় কাহিনীটি সেই সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার ছাঁচে ঢালা, ধনপতি-ফুল্লরার কাহিনীরই অনেকটা অনুরূপ।

এবার রচয়িতাদের কথা : ধর্মমঙ্গলের ঘনরাম চক্রবর্তী, 'শিবায়নে'র রামেশ্বর ভট্টাচার্য, 'রায়বারের' ফকিররাম দাস 'কবিভূষণ', প্রভৃতি হলেন 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র প্রথম দিককার কবি। আরও অনেক নাম রয়েছে। তারপরে—স্বয়ং ভারতচন্দ্র (দু'খানা সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর তিনি রচয়িতা) থেকে আরও অন্তত ৩০।৪০ জন লেখক সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছেন। এ ব্যাপারে আসল কথাটা কবিদের কবিত্ব নয়, আসল কথাটা এ কাহিনীর সামাজিক মূল ও তার সামাজিক মূল্য। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির আপোষ তখন স্থায়ী হয়েছে। মনে হয়, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই সত্যপীরের বেশি ভক্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কবি আরিফ্ ও ফৈজুল্লার সত্যপীরের পাঁচালী থেকে বুঝি এ ধরণের ধর্মীয় ধারণা মুসলমান সমাজেও প্রসারলাভ করেছে। ফৈজুল্লা প্রথমে আল্লা, রসুল প্রভৃতি মুসলমানদের নমস্যদের বন্দনা করে পরে বন্দনা করছেন :

হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন
কৃষ্ণ বলরাম বন্দো শ্রীনন্দ-নন্দন। ইত্যাদি

সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে (ফারসী-হিন্দী প্রভাবিত রোমাণ্টিক গল্পের এবং) জনসাধারণের রূপকথা ও কাহিনী সহজেই এসে মিশে

যেত। সওদাগর, বাণিজ্যযাত্রা এবং বিদেশে বিপদ, কিম্বা রাজপুত্র-রাজকন্যা, শুক-সারি বা অমনি বিদ্যাধরী-মায়াবিনী জাতীয়া বিলাসিনীর পাল্লায় রাজপুত্রের আত্মবিস্মরণ, এমন কি রূপান্তর (ভেড়া হয়ে যাওয়া) ইত্যাদি গল্পগুলি সমাজের সার্বজনীন সম্পত্তি। এরূপ পালাই ছিল আরিফের 'লালমোনের কেচ্ছা'-- ফকির রামের 'সখীসোনা' প্রভৃতি। বিপদ-ত্রাণের জন্য এ সব গল্পে যোগী, সিদ্ধা, ফকির প্রভৃতি পূর্বেও থাকত, তাদের সঙ্গে তাই কোনো পীর বা সত্যনারায়ণকে তখন জুড়ে দিতে কষ্ট হয় নি। এরূপ গীত হল 'মাণিক পীরের গীত।' আর এক ধরণের 'পাঁচালী'তে পীরকে মানব সন্তান করে এক রকম সমকালীন উপকথার আকার দেওয়া হয়,—অবশ্য সে সব কাহিনীর ঘটনা বাস্তব নয়।

সত্যপীর-মাণিকপীর ছাড়াও পূর্ববঙ্গে 'ত্রৈলোক্যপীর' দেখা দেন। পশ্চিমবঙ্গে বড় খাঁ গাজী পীরের কাহিনীও চলে। 'সমসের গাজীর গান'ও আছে। আর নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমান সাধারণের কাহিনীতে মছন্দলী পীর বা মোছরা পীরেও পরিণত হন। এসব পীরের গান ও ছড়ার অবশ্য সাহিত্যিক মূল্য নেই ; তবে বাঙালী সমাজের অবস্থার দিক থেকে দেখলে এগুলো পুরাণের অনুবাদের থেকে বেশি মূল্যবান।

তা ছাড়া, এই পীরের পাঁচালী ধরণের রচনা উনবিংশ শতকেও চলতে থাকে। এই সব সাহিত্যের সঙ্গে একদিকে যোগ রয়েছে—নাথসিদ্ধাদের অনুরূপ লোক-প্রচলিত কাহিনীর, এবং ভারতবর্ষে চোয়ানো ফারসী-আরবী রোমান্টিক রূপকথার। অন্যদিকে অবশ্য গীত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নূতন পাঁচালীও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই উদ্ভূত হতে থাকে।

ইসলামী পুরাণ

সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' (খ্রীঃ ১৬৫৪), মহম্মদ খানের 'মুক্তালহোসেন' (খ্রীঃ ১৬৪৬), শেখচাঁদের 'রসুল বিজয়' সপ্তদশ শতকেই দেখা দিয়েছিল জানি। অষ্টাদশ শতকে এই মুসলমানী পুরাণ রচনা আরও বেড়ে যায়—উনবিংশ শতকেও তা বাড়ে বই কমে না। চট্টগ্রাম থেকে এবার কেন্দ্র এসেছে উত্তর বঙ্গে। হায়াৎ মামুদ লিখেছেন 'আম্বিয়াবাণী' (খ্রীঃ ১৭৫৮) এবং তার 'জঙ্গনামা'; তা ছাড়াও হায়াৎ মামুদ ফারসি থেকে 'হিতোপদেশ' বাঙলায় অনুবাদ করেন এবং ইস্‌লামী শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পুঁথি লেখেন 'হিতজ্ঞানবাণী' (খ্রীঃ ১৭৫৩)।

'জঙ্গনামা'র গুরুত্ব আছে। এ হচ্ছে মোহররমের পূর্বেকার ও কারবালার কাহিনী,—যুদ্ধ-বর্ণনায় ও শোকাবহতায় সত্যই এ কাহিনী কাব্যের উৎকৃষ্ট উপাদান। মুসলমানের নিকট তো তা আদরণীয় হবেই। জঙ্গনামার প্রথম দিককার কবি মহম্মদ খাঁ, সৈয়দ সুলতান, শেখচাঁদ, প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর ও চট্টগ্রামের কবি। নসরুল্লা খাঁ ও মনসুর অষ্টাদশ শতাব্দীর; তাঁরাও চট্টগ্রামের। তার পরে উত্তর বঙ্গের হায়াৎ মামুদ ও পশ্চিম বঙ্গের গরীবউল্লা। গরীবউল্লার 'জঙ্গনামা' অসমাপ্ত কাব্য, সৈয়দ হামজা তা সমাপ্ত করেন খ্রীঃ ১৭৯২তে। এই জঙ্গনামা এদিককার নামকরা পুঁথি, প্রায় হিন্দুদের মহাভারতের মতই গম্ভীর ব্যাপার। বীরভূমের একজন হিন্দু রাধাচরণ গোপও 'জঙ্গনামা' লিখেছেন। হিন্দুদের কৃষ্ণ, বলরাম, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির কাহিনী নাম বদলে এসব ইসলামী পুরাণে অবাধে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতঃই এ সব ইস্‌লামী পুরাণে আরবী ফারসি শব্দ জুটবে বেশি; কিন্তু ক্রমেই তা এত বেশি হয়ে উঠতে থাকে যে তাতে জন্ম নেয় ভাষার এক বিকৃত রূপ—'মুসলমানী বাঙ্‌লা'। এইটি আলাওলের বিপরীত পথ। এবেশে বাঙ্‌লা ভাষার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তাই এই ভাষার অত্যাচারে ইস্‌লামী বিষয়ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে এ দেশে সকলের গ্রাহ্য হয় নি—জাতীয় বিষয় হয়ে উঠতে তা পারল না। অর্থাৎ আলাওলের ক্ষেত্র মুসলমান লেখকরাও আবাদ করতে পারলেন না। অথচ উনবিংশ শতকে 'কেচ্ছা' ও 'মুসলমানী পুরাণ' তাঁরা যথেষ্ট লিখেছেন।—তার সাহিত্য-গুণ প্রায়ই নেই।

গরীবুল্লার দ্বিতীয় কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা'। তাতে হিন্দু কবিদের মতোই তিনিও সকলের জন্ম আল্লার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন:

আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান।
সবাকার তরে আল্লা হও মেহেরবান ॥

ভুরশুটের সৈয়দ হামজা মুসলমান কবিদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি গ্রন্থ লেখেন—'মধুমালতী', 'আমীর হামজা', 'জৈগুনের পুঁথি' (হানিফার জঙ্গনামা), ও 'হাতেম-তাইর কেচ্ছা' (খ্রীঃ ১৮০৪)। এই শেষ গ্রন্থে উপদেশ দান কালে যা বলা হয়েছে তাতে সাধারণ মুসলমান গৃহস্থ-সংসারের একটা জীবনাদর্শের পরিচয় পাই (ডঃ সেন—ইসলামি বাঃ সাঃ, পৃঃ ১১৬)। মুসলমান লেখকদের নিকট রোমান্টিক প্রণয়-গাথার মতোই প্রিয় ছিল যুদ্ধ-কাহিনী। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের

এই মুসলমান লেখকেরাও কেউ ইংরেজের রাজ্য-শাসনে বিক্ষুব্ধ নন—এসব কাব্য দেখে এরূপই মনে হয়। কিন্তু ক্ষমতা-চ্যুত শাসকবর্গের নিশ্চয়ই বিক্ষোভ ছিল।

লোকগাথা

অষ্টাদশ শতকে এসে সাহিত্যে এই প্রণয়-কাহিনীর ধারা আর স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দগতি রইল না, অবশ্য বিস্তার লাভ করল অনেক। মুসলমান কবিরা বিশেষ করে এ ধরণের কাব্য রচনায় উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কোথায় আলাওল-দৌলত কাজী আর কোথায় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের সেই কবিরা? অষ্টাদশ শতকে যে সব কাহিনী এ প্রণয়কাহিনীর ধারাকে পুষ্ট করে, তার মধ্যে ছিল মনোহর মধুমালতীর কথা। আলাওলও এ কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন, হিন্দীতে এ কাহিনী প্রসুচলিত ছিল। অন্য কাহিনীর মধ্যে বেশি পরিচিত বিক্রমাদিত্য-কাহিনীমালার 'বেতাল পচিশী', 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা', প্রভৃতি উপাখ্যান।

কিন্তু এ সব অপেক্ষা লোক-গাথায় যে-সব প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠে, সেগুলি বেশি লক্ষণীয়। কাব্য-সৌন্দর্য তাদেরও অনেক সময় সামান্য। বিশেষ করে, অধিকাংশ লোক-গাথা কখনো লিখিত হয় নি; তাদের ভাষা এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর রচনা বললেও অন্যায় হবে না। এ সব লোকগাথার মধ্যে পাই কোচবিহারে উমানাথের লেখা রাজপুত্র হীরাধর ও তিন বন্ধুর কথা (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা?), পশ্চিমবঙ্গে সরকের 'দামিনী চরিত্র' হয়তো সর্বপ্রাচীন, উত্তরবঙ্গের 'নীলার বারমাসি গান', তারই অনুরূপ (১৭৯০?) খলিলের রচিত চন্দ্রমুখীর পুঁথি—এই শেষ পুঁথি অনেকটা হিন্দী 'মৃগাবতী' কাব্য-কাহিনীর অনুরূপ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক-প্রিয় গাথা মুখে মুখেই চলছিল—গায়েনের মুখে মুখে তার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। সে সব গাথার মধ্যে যুদ্ধের কথাও আছে, ভক্তিমূলক গল্পও আছে, কিন্তু আসল কথাটা প্রায়ই প্রণয়ের গীত, যেমন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পুর্ববঙ্গ গীতিকা'র (চন্দ্রকুমার দে সঙ্কলিত) গাথা-সমূহ। বাঙ্‌লা লোক সাহিত্য অবশ্য স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পুর্ববঙ্গ গীতিকা: মৈমনসিংহ গীতিকার কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সমস্তগুলি|আখ্যায়িকাই বিংশ শতকের উদ্ভাবনা বা সেই শতাব্দীতে জোড়াতালি দিয়ে গঠিত, কিংবা বিংশ শতকের এক বা একাধিক

চন্দ্রকুমার দের রচনা, একথাও ভাবা দুঃসাধ্য। কারণ, তা হলে বলতে হবে চন্দ্রকুমার দে বা সেই রচনাকাররা বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান পল্লীকবি। আমাদের বিশ্বাস এ ভাবনাও ঠিক নয়। গাথাগুলি মুদ্রণের জন্য পরিমার্জিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মূলত 'মহুয়া'র মতো কোনো কোনো আখ্যায়িকার বীজ পুরাতন। লোক-সমাজে এরূপ চলিত আখ্যায়িকার ভাঙা গড়া, জোড়াতালি দেওয়া যেমন চলে এ ক্ষেত্রে, তেমনি জোড়াতালি দেওয়া চলেছে। অর্থাৎ এসব আখ্যায়িকার উৎপত্তি ও বিকাশ লোকসমাজে। দ্বিতীয়ত, মোটের উপর পল্লীকবি ও গায়েনদের রচনা এসব গাথার মধ্যে এখনো টিকে আছে, তা উবে যায় নি, এরূপ অনুমান অন্যায় নয়। ভাষা যতটা পরিমার্জিত হয়েছে, কথাবস্তু ততটা বা সে পরিমাণে বদলায় নি। ভাববস্তুও বেশি শোধিত হয় নি। বেশির ভাগ আখ্যায়িকা অষ্টাদশ শতকেই গড়ে উঠে থাকবে।—এদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান সমাজে প্রচলিত ফারসি রোমান্স ও প্রণয়-কাহিনীর যোগ ঘনিষ্ঠ নয়, একটা সাধারণ সম্পর্ক আছে মাত্র। উনিশ শতকে যে এসব গাওয়া হত তা মনে করা কারণ আছে। যত পরিমার্জিত হোক, ইংরেজ আমলের বিজ্ঞাপন গাথাগুলিতে নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর অপেক্ষা পুরাতন বলে এসব গাথাকে মার্কা দেওয়া যদি অসম্ভব হয়, তা হলেও কাব্য হিসাবে শুধু লোক কাব্য বলে নয়—বাঙ্‌লা ইতিহাসে তাদের ফার্স্ট ক্লাস মার্ক দিতেই হবে। যে শতাব্দীরই হোক, পল্লীর সাধারণ মনে যে পচ ধরে নি, এ সব গাথা তারই প্রমাণ।

লোকগীতির নাগরিক বিবর্তন : অষ্টাদশ শতকে পল্লীর লোক-জীবন অবশ্য লোক-গীতি ও লোক-গাথার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশের পথ আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়। পণ্ডিত-কবি বা বিদগ্ধ লেখকেরা তখন পুরাতন পরিপোষকদের (পেট্রন্) হারিয়ে হয় নীরব হয়েছিলেন, নয় লিখেছেন গতানুগতিক পদ ও মঙ্গলকাব্য ; আর নইলে নতুন পরিপোষকের রুচি অনুযায়ী লিখেছেন বিদ্যাসুন্দর জাতীয় পাঁচালী। সেদিকে আরও ঝোঁক বাড়ল নূতন 'নাগরিক' সমাজের উদ্ভবে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-সভ্যতার মধ্যে শহর-বন্দর পূর্বেই গড়ে উঠ্‌ছিল। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, হুগলি ও কলিকাতার একটা শহুরে সমাজও গড়ে ওঠে—পূর্ববঙ্গে অবশ্য তা দেখা দেয় নি। ঢাকা বাঙ্‌লা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা অবজ্ঞাত। শতাব্দীর শেষ দিকে (খ্রীঃ ১৭৬৫-৭৫) সকলের বৈভব হরণ করে

রাজধানী কলিকাতা জেঁকে উঠল। এ শহরের সমাজে বণিক ব্যবসায়ীর ঐতিহ্যহীন ধন-বিলাসের সঙ্গে এসে মিশল নবাবী আমলের বিকৃত ঝোঁক, মুর্শিদাবাদের ক্ষয়গ্রস্ত আভিজাত্যের শূন্য আড়ম্বর। তাতেই 'নবাবী আমলের' বিকৃত-রুচির নাগরিকতা এখানে প্রস্তুত হল, আর দেখা দিল সেই বিকৃত নাগরিক রুচি ও অগভীর নাগরিক আদর্শানুরূপ সাহিত্য—উপাখ্যান, কাহিনী এবং নানা গীত ও গান। শুধু কলিকাতায় নয়, নিকটবর্তী শহর অঞ্চলেরও এ বিলাস কতকটা ছড়িয়ে পড়ে—ভাগীরথীর দুই কূলের সভ্য-সমাজ তাই এরূপ সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় কলিকাতার অনুসরণ করে। এখানকার 'শারি', 'জারি' (আসলে বিলাপ, এখন বোঝায় 'দেহতত্ত্ব' বিষয়ক গান), 'মালসী', এসব নানা রীতি ও নানা ধরণের চলিত গীতের একটা হিসাব মিলে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখায়। সে লেখা অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক্‌কার (১৮১৩-১৫) ; তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালী সমাজের বেশ নিখুঁত চিত্র আছে এই গ্রন্থ 'শ্রীকরুণা নিধান বিলাসে'। জয়নারায়ণের সে তালিকায় আছে প্রথমত সংকীর্তন ও কীর্তনের নানা ধরণের উল্লেখ। তারপর

পাঁচালি অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর॥
ভবানী ভবের গান মালসী মাথুর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর॥
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর॥…
কালিয়দমন যাত্রা রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপুর॥
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নব গান নূতন ঝুমুর॥

এ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের—বিশেষ করে শহরে মহলের—গীতগানের হিসাব [শাড়ি ('সারি') গানের দৃষ্টান্ত তবু বাস্তব-চেতন এই কবি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় দিয়েছেন]। এধারার আরও বিকাশ হবে উনিশ শতকে—'বাবুদের' আমলে, সে প্রসঙ্গেই এসব গানের কথা বিশেষ আলোচ্য। অষ্টাদশ শতকের এই শেষ-দিককার হিসাবে এ বিষয়ে দু' একটি সাধারণ কথা জানা থাকা উচিত।

'পাঁচালী' প্রথম থেকেই ছিল, তা আমরা বলেছি ;—আখ্যান ছিল তার বিষয়বস্তু, আর চামর দুলিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে তা গাওয়া হত। এখন তার একটা রূপ দেখি সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতিতে। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে পাঁচালী কীর্তনের অনুসরণ করল। তারপর পাঁচালীতে এসে আবার জুটল লোক-রঞ্জনের জন্য রসিকতা, হাল্কা তামাসা। এদিকে 'যাত্রা' উদ্ভূত হল—দেবদেবীর উৎসব উপলক্ষ্য করেই যাত্রা প্রথমে অভিনীত হত, আর তাতে তিন জন ছিল অভিনেতা। প্রথম কৃষ্ণলীলাই ছিল যাত্রার বিষয়বস্তু, বিশেষ করে কালীয়দমন পালা। তারপর দেখা দিল চৈতন্য-যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা। শেষে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রাও এল ; উনিশ শতকে এল ক্রমে পৌরাণিক পালা ও থিয়েটারি যাত্রার যুগ। 'তরজা' আরবী কথা—অনেকটা ছড়ার মতো জিনিস। চৈতন্যদেবের সময়েও তার প্রচলন ছিল—পুরাতন কালের 'প্রহেলিকা' থেকেই তার পরিণতি। পরে তরজা অর্থ দাঁড়াল ছড়ায় গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর। 'কবিগান'ও অবশ্য গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর, কিন্তু দুই দলে। কৃষ্ণলীলা কবি-গানের বিষয়বস্তু, গানের ভাগ-বিভাগও ছিল বেশ নিয়ম-বাঁধা। কবি-গানের এই উত্তর-প্রত্যুত্তর চরমে উঠত যে অংশে, প্রথমে তারই নাম ছিল 'খেড়ু' বা 'খেউড়'। ভারতচন্দ্রের যুগেও তা বেশ একটা আকর্ষণীয় জিনিস ছিল। উনিশ শতকের শেষে তা যা দাঁড়াল, সে অর্থেই আমরা এখন খেউড় শব্দটা প্রয়োগ করি। সে শতাব্দীতেই কবিগানও তরজা 'লড়াই'তে পরিণত হয়—পূর্ববাঙ্লার 'কবি' এখনও অনেকটা লড়াই, চলিত নামও 'কবির লড়াই'।

'সারি' (শারি) গান, জারি গান, লোকগীতি এখনও অচল হয় নি, বিশেষত পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্লার নূতন নাগরিক সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় হল 'আখড়াই'তে। কবি-গানকে পাঁচালী-কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়ে নূতন করে ঢালাই করে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ উদ্ভাবন করলেন 'আখড়াই'য়ের। তিনটি মাত্র গানে তা গঠিত : প্রথম 'মালসী', তারপর প্রণয়গীতি (মিলন বিষয়ক), শেষ 'প্রভাতী' (মিলনাবশেষ বিচ্ছেদের আক্ষেপ)। এই আখড়াই রীতিমত কালো-য়াতি ব্যাপার, নানাবিধ যন্ত্রযোগে তা গীত হত। কাজেই তা আরও ছেঁটেকেটে সরল করে তৈরী হল (উনিশ শতকে) মধুপাকের 'হাফ্-আখড়াই'। কবিগান, আখড়াই, পাঁচালী,—এসবের পুরো মরসুম পড়ে উনিশ শতকের প্রথম দিকে (ডঃ এস্. কে. দে'র ইংরেজিতে লেখা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্লা সাহিত্য

দ্রষ্টব্য) ;—সেজন্যই রাম বসু, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি 'কবি'দের নাম,—শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর, কলুইচন্দ্র সেন, নিধিরাম গুপ্ত, প্রভৃতির আখড়াইতে দান,—কিম্বা দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে কীর্তি—এখানে আলোচ্য নয়, সেই ধারাটা শুধু এখানে লক্ষণীয়।

অধ্যাত্ম গীত

অবশ্য সঙ্গীতের আর-একটা ধারাও সমানেই বয়ে চলেছিল। তাকে বলা চলে অধ্যাত্ম-ধারা। চর্যাপদ থেকে তা বরাবর বয়ে আসছিল, বৈষ্ণবপদাবলীও তারই একটা স্রোত। এ-ধারাকে বলতে পারি—সাধক-গীতিধারা। কিন্তু গতানুগতিক হলেও তাকে গতানুগতিক বললে সবটুকু বলা হয় না। বৈষ্ণব রাগাত্মক পদ আসলে সেই সাধকগোষ্ঠীর একটা প্রকাশ। সম্প্রদায়গত রচনায় এ ধারা সীমাবদ্ধ থাকে না। সুফী সাধকেরা তাতে প্রেমের নূতন আবেগের প্রবাহ সঞ্চার করেন। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই প্রভৃতি নানা সাধকগোষ্ঠী এই ধারায় নিজেদের অধ্যাত্ম অবদান জুগিয়ে যান। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ শাক্ত-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে আবির্ভূত হলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বংশধর রাজা শিবচন্দ্র, কুমার নরচন্দ্র প্রভৃতি, রাজা নন্দকুমার, বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় এবং শেষে কমলাকান্ত (ভট্টাচার্য) শাক্ত সঙ্গীতের ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। বিংশ শতকে এসে রবীন্দ্রনাথের রসপিপাসু চিত্ত এসব অধ্যাত্ম সঙ্গীতের, বিশেষ করে বাউল গানের পুনরাবিষ্কার করে; আর তখন থেকে আমরা এই পরমাশ্চর্য লোক-গীতিধারার অবজ্ঞাত স্রষ্টাদের কয়েকজনার নামও আয়ত্ত করতে পেরেছি—যেমন লালন ফকির, মদন বাউল, গগন হরকরা, ফকির ভোলা শা, বিশা ভূঞিমালী, গঙ্গারাম বাউল, ইত্যাদি। এঁরা অবশ্য সবাই উনবিংশ শতকের মানুষ। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেও সাধনার এই ধারা—সাহিত্য ও সঙ্গীতের এই সংযুক্ত স্রোত—লোক-সমাজের অন্তস্তলে পূর্বের মতোই প্রবাহিত হত। সাহিত্য বা ইতিহাসে তার মূল্যটা 'বাবুদের' আখড়াই বা পাঁচালীর থেকে বড় বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বাস্তব ঘটনার আখ্যায়িকা

যতই আত্মবিস্মৃত হোক 'নবাবী আমলের' শাসক-বর্গের ভাগ্যবানরা, লোকচিত্তে কঠিন সত্যের অস্তিত্ব ছায়াপাত করেছে তখনো। কিন্তু সে ছায়াকে

বোঝাবার বা সাহিত্যিক রূপ দেবার মতো শক্তি সাধারণের ছিল না। অবশ্য লেখকেরা কেউ কেউ তা লক্ষ্য করেছেন।

"মহারাষ্ট্র পুরাণ" : গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এ কারণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব প্রয়াস। নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত বড় একখানা রামায়ণেরও কবি। মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে বর্গীর হাঙ্গামায় উৎপীড়িত (খ্রীঃ ১৭৪২-৪৩) পশ্চিমবঙ্গের কথা, আলিবর্দীর পরাভব, জনসাধারণের বিরোধিতায় ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন। এই জনসাধারণের বিক্ষোভ যদি সত্যই এতটা প্রবল হয়ে থাকে, তা বলে পলাশীর পরে সে জনসাধারণ গেল কোথায়? হয়তো তাদের খুঁজতে হবে মজনু ফকিরের পিছনে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের 'দস্যুদের' পাশে। সেই যাই হোক, গঙ্গারাম দত্ত কাহিনী বলেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে—সমসাময়িক কালের একটা সজীব চিত্র এ কাব্য, 'ঐতিহাসিক কাব্য' হিসাবেও বাঙলায় অভিনব। গঙ্গারামের কবিত্ব সাধারণ, আখ্যান ঢালাই হয়েছে পুরাণের রীতিতে—ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, এসবের সহায়ে এ গল্পের অবতারণা। কিন্তু বিষয়বস্তু নূতন—তা আগামীকালের আভাস। উত্তর-বঙ্গের রতিরাম দাসের 'দেবীসিংহের অত্যাচার' বিষয়ক ছড়ায় ও মজনু ফকিরের অত্যাচারের ছড়ায় এই ঘটনা-মূলক কাব্যধারার আরও পরিচয় পাই। ঊনবিংশ শতকে এরূপ দুই ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল—গদ্যে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রভৃতি আর পদ্যে ত্রিপুরার 'রাজমালা' ঐতিহাসিক কাব্যে; 'বানের ছড়া', 'রাস্তার ছড়া', 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া' (রাইকৃষ্ণ দাসের লেখা) বাস্তব ঘটনার কাব্য। এসব বেড়েই চলে। এর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় হল রঙ্গপুরের কৃষ্ণহরি দাসের—'নয় আনার ছড়া'। দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বে নয়-আনার জমিদার প্রজাদের দাবীর জোরে নিজের জমিদারীর পুনরুদ্ধার করেন। প্রজাশক্তির এই সংহতি ও সমাবেশ—একটা নূতন ঘটনা। রঙ্গপুরের রতি রায় দেবীসিংহের অত্যাচারের ছড়ায়ও এরূপ প্রজা-বিদ্রোহের কথা বলেছেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রও রঙ্গপুর। এসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারি—গ্রাম্যকবি বুঝেছেন প্রজাশক্তি তুচ্ছ শক্তি নয়।

এ ধারারই মধ্যে একটা স্থান বিজয়কুমার সেনের লেখা—ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গঙ্গাপথে কাশীযাত্রার কথা 'তীর্থমঙ্গল' খ্রীঃ ১৭৭০-এ লেখা—গঙ্গার দুপারের গ্রাম ও নগরের তথ্যবহুল বর্ণনা হিসাবে এ গ্রন্থও একটি নূতন জিনিস। অবশ্য জয়নারায়ণ ঘোষাল তখন

বাঙালী সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ হয়ে ওঠেন, সমাজকল্যাণের কর্মেও তিনি এগিয়ে যান। এসব কাব্যের মধ্যে আমরা দেখি তথ্য-চেতনা,—তা আগামী যুগেরই বীজ—যুগসন্ধির মধ্যে নূতনের ক্ষীণ ছায়া।

কালান্তরের আয়োজন

অবশেষে নবাবী আমলের জের টানাও ফুরিয়ে এল। তা ফুরিয়ে আসারই কথা। কারণ, ১৭৫৭'র পরে যে শক্তি রাজ্যলাভ করে তার কর্মচারী-প্রতিনিধিরা যতই 'নাবুবী' করুক, সে শক্তি নবাবী শক্তি নয়, সে সামন্তশক্তি নয়; সে উদ্যোগী বণিক-শক্তি—পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাবলে আধুনিক সভ্যতার কর্ণধারত্ব লাভ করেছে। সেই উদ্যোগ, সাহস, বাস্তববোধ, এমনকি দূরদৃষ্টি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মতো ইংরেজদেরও কম ছিল না। শত অত্যাচার ও পীড়নের সঙ্গে সঙ্গেও তাই কোম্পানি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে শাসন-কর্মে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিল, বিচারে-আচারে নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছিল, এমন কি, এ দেশের নিয়ম-কানুন, ধর্ম ও সংস্কৃতি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে অগ্রসর হয়েছিল। নাথানিয়াল ব্রাসে হালহেডকে দিয়ে হেষ্টিংস ফারসি থেকে হিন্দু আইন এই উদ্দেশ্যে সংকলিত করান। হেষ্টিংস বাঙ্লায় ও ফারসিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, আরবী-উর্দুতেও তাঁর জ্ঞান ছিল। কোম্পানির কর্মচারী চার্লস্ উইলকিন্স বাঙ্লা মুদ্রণের জন্য বাঙ্লা হরফ প্রথম কাটলেন। পর্তুগীজ বণিক ও পাদ্রীদের কাছ থেকে পাশ্চাত্ত্য মুদ্রণ-পদ্ধতির কথা জানলেও ভারতের কোন রাজা বা নবাব মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে বা হরফ নির্মাণে কিছুমাত্র উদ্যোগী হন নি। হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, তাতে বাঙ্লা কথা বাঙ্লা হরফে প্রথম মুদ্রিত হয়। পর্তুগীজরা বাঙ্লা বই ছেপেছিল লিস্বন থেকে, রোমান হরফে পর্তুগীজ পাদ্রী ম্যানোয়েল দা আস্সুম্পসাঁওএর বাঙ্লা-পর্তুগীজ ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, এবং 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক গদ্যে প্রশ্নোত্তর-গ্রন্থ লিস্বন থেকে ১৭৪৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। রেনেলের 'বেঙ্গল এটলাস' প্রকাশিত হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্লা দেশের এই বৈজ্ঞানিক জরীপের তুলনা নেই। এই সময়ে (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে) স্থাপিত হয় কলিকাতা মাদ্রাসা। আর অল্পকালের মধ্যেই স্যার

উইলিয়ম জোন্‌সের উদ্যোগে উইলকিন্‌সের সহকারিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল—প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম মহাগবেষণাগার।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, কি ইউরোপে, কি ভারতে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের সঙ্গেই মধ্যযুগের অবসান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে—জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার সকলের পক্ষে উন্মুক্ত হয়। জ্ঞান ও বিদ্যা আর শাসক-শ্রেণীর একচেটিয়া থাকতে পারে না; কালান্তর তখন অনিবার্য। হালহেডের ব্যাকরণ না হোক, খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পরে বাঙ্‌লা গ্রন্থ মুদ্রণের সূচনা হল। ঠিক সেই বৎসরই স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, উইলিয়ম কেরী তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন, বাঙ্‌লা গদ্যে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লা গদ্য জন্মগ্রহণ করল,—আর জন্মগ্রহণ করল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল।

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি—নবাবী আমল নেই, তার যুগসন্ধির অন্ধকারও বিলীয়মান, কালান্তর সমাগত। অথচ সে কালান্তর অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। কারণ, যে সময় ফরাসী বিপ্লবের রক্ত-প্লাবনে ইউরোপের দেশে দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেসে গেল, জাতীয়তা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও 'মানুষের অধিকার' যুগাদর্শ হয়ে উঠল, এবং নব নব যন্ত্র আবিষ্কারে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের (খ্রীঃ ১৭৬৪-১৮১৫) পথ প্রশস্ত হল,—ঠিক সেই সময়েই (১৭৯৩) বিদেশী রাজশক্তি কর্ণওয়ালিসী ব্যবস্থায় বাঙ্‌লা দেশে জমিদারীতন্ত্রের পত্তন করে এ দেশের ভগ্নপ্রায় সামন্ত-ব্যবস্থাকে পাকা করে গাঁথল, রাষ্ট্রে বাণিজ্যে এদেশীয় মানুষের সকল উদ্যোগ-অধিকার নিষিদ্ধ করে এদেশের সমাজকে আরও পঙ্গু ও অসহায় করে দিলে। পিছনে তাকিয়ে দেখি—মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য সপ্তদশ শতকে যে ক্ষেত্র রচনা করছিল অষ্টাদশ শতকে তা আবাদ হয় নি—সম্মিলিত সাধনায় জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠতে এখনো বাকী। এর পরে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির কালে বিক্ষুব্ধ ভগ্নোদ্যম মুসলমান ও কেরানি-ভাগ্যে পরিতৃপ্ত হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোক আর একযোগে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গঠনের সুযোগ লাভ করবে কি করে? সম্মুখে তাকিয়ে দেখি—যে পল্লী-সমাজের বুকে বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য জন্মলাভ করেছিল, তা ছেড়ে এবার ইংরেজ আমলে তার নূতন আসর রচনা হচ্ছে ইংরেজের তৈয়ারী কলকাতা শহরে। মহাশক্তি-শালী বণিক-সভ্যতার আঘাতে ভারতের পল্লী-অর্থনীতি ও পল্লী-সমাজ ক্রমশঃ

ভেঙে যাবে; নূতন বণিক-সভ্যতার অবাধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক দানে—ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাদে, বাঙালী মানসেও কালান্তর সমাসন্ন হবে, নূতন সভ্যতার আস্বাদনে বাঙালীর প্রাণ চঞ্চল হবে; অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙালী জীবন থাকবে ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিগড়ে আবদ্ধ। উদ্যোগ-অধিকার-বঞ্চিত সেই বাঙালী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পরিচালনায় এরূপ অপরিসর জীবন-ক্ষেত্র থেকে বাঙালী সংস্কৃতি কিরূপে আহরণ করবে স্বদেশীয় প্রাণরস ও গ্রহণ করবে আধুনিক সভ্যতার দিগ্‌দেশ-প্লাবী আশীর্বাদ—নূতন জীবন-যাত্রা, নূতন জীবন-দর্শন, এবং নূতন সাহিত্যাদর্শ?

সেই প্রশ্নেরই উত্তর বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

নির্ঘণ্ট
